মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

ড. আবদুস সাত্তার

দীপ প্রকাশন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

কমরেড বিমান বসু

আত্মজনেষু—

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ:

- বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যান
- সাহিত্যপাঠ নবপত্র

সম্পাদনা

- চেতনার তরবারি : কাজী আবদুল ওদুদ
- কালোয় ঢেকেছে আলো
- নির্বাচিত রচনা : সুফিয়া কামাল
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (১ম খণ্ড)
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (২য় খণ্ড)

প্রাক্-কথন

মীর মশাররফ হোসেনের সমগ্র রচনা প্রকাশের যে উদ্যোগ তার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। উনিশ শতকের বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মীর সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। এক যুগন্ধর প্রতিভা। মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। এই খণ্ডে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনীমূলক পথিকৃৎ উপন্যাস 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০-৯২)। আখ্যানটি মৌখিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত। তিনি যা লিখেছেন, সবই তাঁর শোনা কথা। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তীকালে অনেক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু এই রচনার মাধ্যমে তিনি একটা দৃষ্টান্ত রচনা করে গেছেন। সমসাময়িক ইতিহাসকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জারিত করে এবং ইউরোপীয় 'পিকারেস্ক' উপন্যাসের মতো বাধাবন্ধনহীন, উদাসীন, ভবঘুরে এক ভ্রাম্যমাণ চরিত্রের ছদ্মবেশে আত্মজীবন ও আত্মোপলব্ধি এবং মৌখিক ও লিখিত ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ও আখ্যানের ক্রমিক বিবর্তনে উপন্যাসে সর্বার্থেই রয়েছে মৌলিকতার স্বাক্ষর।

মীরের এই রচনায় আত্মজীবনের গভীর ছায়াপাত ঘটেছে। কালের ছায়া অঙ্গে ছড়ানো। ১৮৫৯-৬০ সালে ঘটে নীল বিদ্রোহ। মশাররফের পিতা ছিলেন ইংরেজ-ভক্ত। অনেক জমিদার কুঠিয়াল ইংরেজদের বিপক্ষে চলে গেলেও তাঁর পিতা মুয়াজ্জম ছিলেন নীলকর কুঠিয়ালদের পক্ষে। ঐতিহাসিক নীলকর কুঠিয়াল টমাস কেনীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কেনী মীরের পিতার কাছে প্রস্তাব দেন যে তিনি যেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পড়াশোনার জন্য বিলেতে পাঠান। সমস্ত খরচ কেনীর। শেষপর্যন্ত স্নেহান্ধ মাতামহী অনুমোদন না করায় বিলেত যাওয়া হয়নি। নীল কুঠিয়াল কেনীর সঙ্গেই যুক্ত হয় কৃষ্ণনগরে থাকার অভিজ্ঞতা। সেইসময় শহরে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে মিলমিশে থাকার ছবি দেখে তিনি খুব উৎফুল্ল হন। বাবার দেওয়া পাজামা-চোগা-চাপকান বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। শান্তিপুরের ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে শুরু করেন। ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে বাবা মুয়াজ্জম হোসেনকে জানান কৃষ্ণনগরের অভিজ্ঞতার কথা। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কথা শুনে বাবাও খুশি হন। উচ্চারণ করেন : 'হিন্দু-মুসলমান এরূপ প্রণয়-ভাবে জীবন কাটাইলে, সে জীবন যত সুখের সে সুখের মত আর কোন সুখ নাই।'

এই গ্রন্থে রয়েছে নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ইংরেজ, হিন্দু এবং মুসলমানের মিলিত সামাজিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শোষক ও শাসক নীলকরদের টাকার লোভে কীভাবে দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক মানুষ পদলেহন করছেন তার বর্ণনা-ও বিদ্যমান। নীলকর কেনীর লোভের সীমানা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার বর্ণনা-সূত্রে এসেছে এক মুসলমান পরিবারের চিত্র। উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে মীর সাহেব, সা গোলাম এবং দৌলতুন্নেসা। স্বার্থদ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মুসলিম পরিবারের মধ্যে যে বিষপ্রয়োগ, গোপন ষড়যন্ত্র ও জঘন্য নীচতা বর্তমান মীর সাহেবের পারিবারিক জীবনের ঘটনায় তা বর্ণিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে 'মুখবন্ধ'-অন্তে লেখকের ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছে 'উদাসীন পথিক' -রূপে। অধ্যায়গুলোকে লেখক 'তরঙ্গ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রন্থে মোট বিয়াল্লিশটি 'তরঙ্গ' রয়েছে। প্রত্যেকটি তরঙ্গ আলাদা শীর্ষনামযুক্ত। গ্রন্থের শুরুতেই রয়েছে কুষ্টিয়ার শালঘর মধুয়া গ্রামের নীলকুঠির মালিক কেনী সাহেবের সাক্ষাৎ। কেনী সাহেব, প্যারীসুন্দরী ও ভৈরববাবুর নাম সমকালীন ইতিহাসেও উল্লেখিত। গ্রন্থে দুটি কাহিনি সমান্তরালভাবে প্রবহমান। প্রথম কাহিনিতে রয়েছে কুঠিয়াল কেনী ও জমিদার প্যারীসুন্দরীর বিরোধ। শালঘর মধুয়ার নীল কুঠিয়াল টমাস কেনীর অত্যাচার। অত্যাচারে জর্জরিত দরিদ্র চাষীদের বর্ণনা এবং নির্যাতিত চাষীদের পক্ষাবলম্বন করে জমিদার প্যারীসুন্দরীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। দ্বিতীয় কাহিনিতে এসেছে মীর পরিবার, বিশেষ করে মশাররফের পিতা মীর মুয়াজ্জম হোসেন এবং মা দৌলতুন্নেসার সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য বিজড়িত জীবনের বর্ণনা। কাহিনি দুটি কখনও পরস্পর সংলগ্ন, কখনও বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয় কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে, জনক-জননীর প্রতি মীর মশাররফ হোসেনের অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁর পিতা বিলাসব্যসনে কালক্ষয় করতেন এবং নর্তকী ও বাঈজিদের নৃত্যগীতে অতিরিক্ত আসক্ত ছিলেন। এ কথা উল্লেখ করার পরও তিনি লিখেছেন 'মীর সাহেব মোসলমান সমাজের সমুজ্জ্বল রত্ন'। তাঁর গর্ভধারিণী 'দৌলতুন্নেসা পবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী'। মীর সাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী। তিনি 'বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন, লিখিতে জানিতেন না।' বাধ্য হয়ে সখ্য রেখেছেন নীলকুঠির মালিক টি. আই. কেনীর সঙ্গে। এই অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক, চরিত্রহীন কুঠিয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার জন্য তাঁর মনে 'অসুখে'র অন্ত নেই। তবু অপমানের, প্রাণের স্ত্রী-পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয়ে তাঁকে সখ্যতা রেখে যেতে হয়। ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী সা গোলাম বিষপ্রয়োগ করেছে মীর সাহেবকে। গর্ত্তির হজরত বংশের সন্তান সা গোলাম। বিদ্রোহীদের নেতা।

বংশের ক্রমক্ষীয়মাণ মানবতা সম্পর্কে গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে 'তাহাদের হৃদয় নাই, সমাজের ভয় নাই, লোকনিন্দার দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা মহাপাপকেও অতি তুচ্ছ মনে করে।' ঘরজামাই সা গোলাম শ্বশুর মীর সাহেবকে বিষয় থেকে বেদখল করার ক্ষেত্রে

দলিল চুরির মতো জঘন্য কাজ করছে অথচ একই সময়ে সে শোনে মীর সাহেব তাকেই দিতে চান সব দায়িত্ব। দ্বিতীয়া স্ত্রী দৌলতুন্নেসাকে বিষপ্রয়োগের চক্রান্তে আছে বেতনভোগী নর্তকী রূপসী এবং বাঁদী সবজা। দৌলতুন্নেসার অপমৃত্যুই প্রমাণ করে অন্তঃপুরবাসিনী নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অবহেলা ও নারীনির্যাতনের প্রমাণ জকির প্রথমা স্ত্রী ময়নার জীবন-কথা। ময়না স্বামীর নির্দেশে নীলকর কেনীকে দেহ দিতে বাধ্য হয়েছে। গর্ভিণী হতে হয়েছে। এবং শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে।

প্রথম কাহিনিতে ১৮৫৯-৬২ সালে কুষ্টিয়া অঞ্চলে নীলকরের অবাধ অত্যাচারজনিত যে বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করে তার চিত্র উদ্‌ঘাটন করাই ছিল মীরের লক্ষ্য। কেনী সম্পর্কে প্যারীসুন্দরী বলেছেন 'ও বেলাতী কুকুর। এ দেশের সকলকেই দংশন করিবে। সে বিষে সকলেই জর্জ্জরীভূত হইবে।' তাঁর মর্মবেদনা: 'দেশের লোকই দেশের শত্রু। দেশের অনিষ্টকারী। কেনী বিলাত হইতে লোকজন সঙ্গে করিয়া এদেশে আসেন নাই। দেশের লোক দিয়েই স্বদেশীয়ের সর্বস্বান্ত করিতেছেন।' দেশের মানুষের এক ক্ষুদ্রাংশ যেমন নীলকরদের অনুগত, তেমনই এর অধিকাংশ নানাভাবে বিভক্ত। এই বিভেদ দূর করার কোনও প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। জীবনোপলব্ধি-জাত ভাষ্য: 'প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু-মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা, দেশের মঙ্গলের জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই।' কেনীর মুখ দিয়েও ভারতবাসীর অনৈক্যের প্রতি শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু লেখক দেখে প্রীত হয়েছেন যে, নীল আন্দোলন বাঙালির এই দুর্নাম আংশিক হলেও দূর করতে সমর্থ হয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে প্রজাবৎসল, প্রজাদের স্বার্থরক্ষক অভিভাবক প্যারীসুন্দরীর মতো বলিষ্ঠ, প্রতিবাদী চরিত্র। অসহায় প্রজাদের দুর্গতি ও দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে নিজের সর্বস্ব দিয়ে বিদ্রোহকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। লেখকের বর্ণনায় : 'হিন্দু-মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষ বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহারও কোনও কথা কানে করিল না। কারও বাধা মানিল না।' দীনবন্ধুর মতো তিনিও নীল আন্দোলনকে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী নীলকরের কার্যাবলীর প্রতিবাদ হিসেবে দেখেছেন। ইংরেজ সরকার হীন স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে নীলচাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সমগ্র অন্যায়-অত্যাচার যে তারই পরিণাম তারা তা অনুভব করে নি।

উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তার গভীর তাৎপর্য আজও বিদ্যমান। শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা, ঐক্যমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করা নয় ; মাতৃভূমিকে যথার্থ-রূপে ভালোবাসার প্রেরণা-ও রয়েছে। অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তারই প্রকাশ: 'আমরা বাঙালি, আমাদের 'হোম'কে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে হয় তাহা জানি না।' অথবা 'জন্মভূমি কাহার না আদরের?

উপমারহিত কাহার না ভালো বাসস্থান? জন্মভূমির জন্য কে না লালায়িত?' এই প্রশ্ন মানবমনে চিরন্তন। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন 'শোনা কথাই পথিকের মনের কথা।' তাই এই গ্রন্থকে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র 'পূর্বসূরি'-রূপে অনায়াসেই স্থান দেওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে মীর রচনাবলীর পুনর্মুদ্রণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তাঁর সমস্ত রচনা অগ্রন্থিত, অপ্রকাশিত থাকা যেমন একটা গোটা জাতির ক্ষতি, তেমনই বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে অবিলম্বে সহজপ্রাপ্য করে তোলা একটা মস্ত দায়-ও বটে।

স্মৃতিপটে অনেক পরম আত্মজনের কোলাহল। জীবনপথের পথিক কমরেড বিমান বসু। কমিউনিস্ট নীতি ও আদর্শকে সঙ্গী করে লক্ষ্যে অবিচল এই সংগ্রামী যোদ্ধা। নিঃস্ব, অসহায়, দীন-হীন মানুষের কল্যাণে পথ রচনা করতে ভালোবাসেন। কাতর হন পথসঙ্গীদের দুঃখ-যন্ত্রণায়। দুর্দম অভিলাষ নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করার। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ডিরোজিও-র প্রেরণা-জাত হয়ে নির্মাণ করেন অসংখ্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়। আবার আমাদের মতো সাধারণ সহকর্মীদের সহজাত দক্ষতায় অনায়াসেই নতুন উদ্যমে পথ চলতে উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। উচ্চারণ করতে পারেন : মানবৈতিহাসে তমসা নয়, প্রভাতের সূর্যোদয়ই শেষ সত্য। সারল্যে, অনাড়ম্বর জীবনচর্যায় তিনি নিজেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হয়ে উঠেন সকলের আত্মজন। আত্মার পরমাত্মীয়। এই খণ্ডটি তাঁরই প্রতি নিবেদিত, উৎসর্গীকৃত।

আত্মজা সানিয়া ও সহধর্মিণী ইন্দ্রাণী আমার সকল কাজের প্রেরণা। তাদের প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

'দীপ প্রকাশন'-এর কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডল, তাঁর অত্যুৎসাহী পুত্র দীপ্তাংশু মণ্ডল ও আশিস চৌধুরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের তরুণ গবেষক রাহুল ওরফে অরিন্দম দাশগুপ্ত প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে যথাসম্ভব সহায়তা করেছেন। তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ছোটো করতে চাই না। মীরের দুষ্প্রাপ্য রচনার সংগ্রাহক বাংলাদেশের 'কালি ও কলম' পত্রিকার হাসনাত ভাই-এর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আবদুস সাত্তার

উদাসীন পথিকের মনের কথা

মুখবন্ধ

এক

গুপ্ত কথা, গুপ্ত লিপি, গুপ্ত কাণ্ড, গুপ্ত রহস্য, গুপ্ত প্রেম, ক্রমে সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মনের কথা মনেই রহিয়াছে। মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমন কি জীবনের সংশয়। সংসারে আমার স্থায়ী বসতি স্থান নাই। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই। আপন বলিতে কেহই নাই। চক্ষু কাঁদে, না মন কাঁদে (যাহা চক্ষে দেখতে পাই) অনেকের জন্য কাঁদে। মনের কান্নার সহিত একত্রে মিলিয়া মিসিয়া কাঁদে না—উপরি ভাবেই চক্ষে জল গড়াইতে থাকে আবার পরস্পর তুমি 'আমার' আমি 'তোমার' বলিয়া প্রেমের হাট, মায়ার বাজার বসাইয়া দেই। সকলেই কি প্রেমের দোকানদারী করিতে জানি না—ঠিকভাবে খরিদ বিক্রী করে মহাজনকে কিছু লাভ দেখাইতে পারি না—সকলই মুখে!! এখন বাকি রইল, "আমি"। কারণ, "তুমি আমার আমি তোমার"। আমি কার কে, আমিই বা কে, সেই আমি—যাহার জন্যে কাঁদিবার একটি চক্ষুও নাই। আমি সেই আমি। কিন্তু আমি এমনই অজ যে একত্র এক দেহ এক প্রাণ হইয়া অনেকদিন কাটাইলাম। চক্ষুতে অন্ধকার ঘিরিল, কালকেশ ধবল হইয়া আসিল, জীবন শেষ, যাহা হইবার কথা, তাহা সকলই হইল, চিনিলাম না—চিনিতে পারিলাম না—আমি কে!

আমারই যখন আমিত্বে নানা গোল—তখন "আমি তোমার" একথাটাও বোধ হয় মুখেরই কথা,—কথারই কথা। আমাতেও সন্দেহ—তোমাতেও সন্দেহ। আসলেই ভুল। আমিও আমার নহে, তুমিও তোমার নহ। কাজেই "আমার" "তোমার" কথাটাও কিছু নহে। আপন বলিতে আমার কেহ নাই। কার্য্য এবং ব্যবহারেই মায়া—সংসারময় স্বার্থের অপচ্ছায়া।

দুই

এই অসার, অপরিচিত, অস্থায়ী "আমি", আমার ভাবনা চিন্তার কোনই কারণ নাই। সুতরাং মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিতে বোধ হয় পারিব। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, আর মা জানেন। কারণ শোনা কথাই পথিকের মনের কথা। সে কথার ইতি নাই। জীবনের ইতির সহিতেই কথার ইতি—আমার মনের কথার শেষ।

জলধির জলের ঘাত প্রতিঘাতেই স্তরের সৃষ্টি। সংসার সাগরেরও ঠিক তাহাই। সেই ভীষণ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যে সকল স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই একে একে ভাঙ্গিয়া দেখাইব। আর মনের কথা শুনাইব!

পাঠক সমালোচনার ভয় আমার নাই। কথা শুনাইয়া যাইব এইমাত্র কথা। তবে একটী কথা, যদি কাহার মনের কথার সহিত আমার মনের কথার কোন অংশ আঁকে জোঁকে, আকার প্রকারে, ইঙ্গিতে আভাষে, ঠিক বেঠিক, মিল গরমিল বোধ হয়, তবে কিছু মনে করিবেন না,—কোন সন্দেহ করিবেন না। মার্জ্জনা প্রার্থনা করি, ভুলভ্রান্তি সকলেরই আছে।

আপনাদের
অনুগ্রহ প্রত্যাশী—উদাসীন পথিক

প্রথম স্তর

প্রথম তরঙ্গ

নীল কুঠী

কুষ্টিয়ার বর্তমান রেলওয়ে ষ্টেসনের উত্তর সীমা গৌরী নদী, পূর্ব্ব সীমা কালী গঙ্গা। কালী গঙ্গা গৌরীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ছুটিয়া ক্রমে দক্ষিণ দিক্ বহিয়া কুমার নদে মিশিয়াছে। কালী গঙ্গার বাম তীরে শালঘর মধুয়ার নীল কুঠী। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে সাত মাইল ব্যবধান। বর্ষাকাল—নীল কাজ আরম্ভ, দিবা রাত্র লোকজনের কোলাহল।

বেলা প্রায় ৮টা। কুলিরা বোঝা বোঝা "নীল শিটি" মাথায় করিয়া হউজের বাহিরে ফেলিতেছে, নীল পচা দুর্গন্ধময় জল, নাক মুখ বহিয়া বুকে পিঠে পড়িতেছে। অল্প পরিসর পরিধেয়খানি ভিজিয়া পায়ের পর্য্যন্ত নীল রঙ্গে রাঙ্গিয়া যাইতেছে! ছোট হউজের কুলীরা ব'ঠে হস্তে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীল পচা জল, মাই* করিতেছে। জাঁতঘরে জ্বালানী মাল জাঁত হইতেছে। আপিস দালানে আমলাগণ আপন আপন কার্য্যে বসিয়া কাগজ কলমে মনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। মেঃ টি, আই, কেনী শয়ন কক্ষেই আছেন। দ্বিতল হইতে নামেন নাই। প্রতিদিন ৭টার সময় নীচে নামিয়া ডিহি দেখিতে গমন করেন, আজ ৮টা বাজিয়া যায়, নীচে আসিতেছেন না। কেফাতুল্যা দরওয়ান, সিঁড়ির সম্মুখে পায়চারী করিয়া খাড়া পাহারা দিতেছে। রাম ইয়াদ পাঁড়ে জমাদার ঢাল তরবার বাঁধা, দাড়ী দুই ফাঁক করা—কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, আমীন, তাগাদগীর, কোড়াবরদারসহ বারান্দার সম্মুখে মনিবের আগমন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণি মাহুত লাল বনাতের কুর্ত্তি পরিয়া, মাথায় লাল পাগড়ী বান্ধিয়া অংকুশ হস্তে প্যারীজান হস্তীর ঘাড়ের উপর বসিয়া সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। প্যারীজান শুঁড় দোলাইয়া, কর্ণ নাড়িয়া পুচ্ছ হেলাইয়া বিরক্তিকর কীট পতংগ সকল শরীর হইতে তাড়াইতেছে। জয়চাঁদ সইস, শ্বেতবর্ণ

---

* মাই : মন্থন।

অয়লারের বাগডোর ধরিয়া খাড়া রহিয়াছে। সময় সময় চামব দ্বারা ঘোটকবরের গাত্র হইতে মক্ষিকা তাড়াইতেছে। তত্রাচ খরগতি 'অয়লার' পুচ্ছ গুচ্ছ অনবরত নাড়িয়া হ্রেষারবে সকলের দৃষ্টির আকর্ষণ করিতেছে। বেহারাগণ পাল্কী মাটিতে রাখিয়া 'বেলা হইল' 'আজ রোদ্রে মারা পড়িব' 'সাহেবের বুদ্ধি নাই' ব'লে কার যেন পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিতেছে। সংগে সংগে সময় যাইতেছে। সকলেই দেখিল কেফাতুল্যা পায়চারী রাখিয়া সেলাম বাজাইবার জন্য নম্র ভাবে দাঁড়াইল। দরওয়ানজীর ভাবে সকলেই বুঝিল যে সাহেব নীচে নামিতেছেন, সকলেরই পূর্ব্বভাব পরিবর্তন। নূতন ভাব নম্র ও সতর্ক। বেহারাগণের মুখ বন্ধ, বেশীর ভাগ পাল্‌কী ঘাড়ে, কাম বাজাইতে খাড়া—প্রস্তুত। টি আই. কেনী পাইপ টানিতে টানিতে বেত হস্তে নীচে নামিলেন। সসব্যস্তে সকলেই ঘাড় নোয়াইয়া দস্তুর মত সেলাম বাজাইল। সামান্য চাকরের সেলামের প্রত্যুত্তর, প্রায়ই নাই, ইংরেজ আরও কড়া মেজাজ, সে দিক লক্ষ্য না থাকিবারই কথা। জয়চাঁদ সইসের দিকে বেত উঠাইয়া বলিলেন, গোরা লাও। জয়চাঁদ ঘোড়া লইয়া নিকটে আসিল। কেনী আরোহণ করিলেন। আবার বন্দুক শব্দ উচ্চারণ করিতেই পীরবক্‌স শিকারী তাড়াতাড়ি বন্দুক তোজাদান লইয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমীন, তাগাদগীর, কোড়াবরদার চাকুরী বাজাইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল।

নীলমণি মাহুত চাই ধাৎ করিয়া প্যারীজানকে পীলখানায় লইয়া গেল। বেহারাগণ আজিকার মত রক্ষা পাইল। কিন্তু সর্দ্দার বেহারা মধু বলিতে লাগিল, "দেখ ত ভাই! বেটার বুদ্ধি! কথাটা আগে বল্লেই হইত। আজ ঘোড়ায় চড়িয়া ডিহি দেখিতে যাইব, হাতী পালকীর দরকার নাই।" মনিবের বুদ্ধি বিবেচনায় সাত প্রকার ক্রটী দেখাইয়া আপীস ঘরের বারান্দায় পালকী রাখিয়া মধু সদলে বাসায় চলিয়া গেল।

টি, আই, কেনীর মনের কথা আগে কেহ জানিতে পারিত না। কোন্‌দিকে নীল দেখিতে যাইবেন, সে কথা কাহারও জানিবার সাধ্য ছিল না। কুঠীর চতুর্দ্দিকেই নীল জমি। যে দিকে তাঁহার ইচ্ছা হইত, সেই দিকেই তিনি যাইতেন। আমীন, খালাসীরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। একদিন যে দিকে যাইতেন, পরদিন আর সে দিকে যাইতেন না।—একথা সকলেই জানিত। আজ তিনদিন ক্রমাগত উত্তর দিকেই যাইতেছেন। কুঠীর উত্তর দিকে দমদমা গ্রাম। টি, আই, কেনী দমদমা গ্রামের মধ্যে যাইয়া পথ ভুলিয়া অন্য পথে যান। তাঁহার বহুকালের চেনা পথ কেন যে ভুল হয়, তিনিই জানেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি গৃহস্তের কুঁড়ে ঘরের দিকে লক্ষ্য করেন। গ্রাম্য পথ। গ্রাম্য লোক, সাহেব দেখিলেই ভয় পায়। সাহেব বাহির হইয়াছে শুনিলে যে যেখানে থাকে সে সেইখানেই গাছের আড়ালে কি পথের ধারে লুকায়,—ঝাড় জংগলে মাথা দেয়, একেবারে সরিয়া যাইতে না পারিলে কাঁপিতে কাঁপিতে সেলাম বাজাইয়া জোর পায়ে সরিয়া পড়ে। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সাহেবের নাম শুনিলেই ঘরের দোর আঁটিয়া কেহ মাচার নীচে, কেহ ঘরের আড়ালে থাকিয়া বিলাতী রূপ দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। কেনী একদিনে এক পথে কখনই যাওয়া আসা করিতেন না।

আজ তিনদিন হোতে তাঁহার সে নিয়ম ভংগ হইয়াছে। প্রতিদিনই দম্‌দমা গ্রামের মধ্য দিয়া যাওয়া আসা করেন। একজন দুঃখী প্রজার বাড়ীর নিকট বিনাপরাধে ঘোড়ার উপর চাবুক সৈ করেন।—কিন্তু অশ্বের বাগডোরে গতিরোধ সংকেত। অয়লারের মহা বিপদ। পিছাড়া, সিকপা যতরকমের বজ্জাতি সে জানিত, তাহা বাধ্য হইয়া করিতে বাধ্য হইত। খুরের খট্ খট্, চাবুকের পটাপট্, বিলাতী কণ্ঠের হুটপাট শব্দ শুনিয়া অনেকেই সাহেবের ঘোড়ার কাণ্ড কারখানা ছুপনি পাতিয়া দেখিত। কেনীর সাদা চক্ষুও চারিদিকে অনবরত ঘুরিয়া কি যেন দেখিত। —চক্ষু যাহাকে দেখিতে চাহে, তাহাকে দেখিতে পায় না। প্রথমদিন যেখানে ঘোড়া দাঁড়াইয়াছিল, আজও সেইস্থানে দাঁড়াইল। সিকপা, পিছড়া ঝাড়া, কিছুই বাকী রহিল না। পীরবক্‌স প্রভৃতি যাহারা কিছু পিছনে পড়িয়াছিল তাহারা আসিয়া জুটিল। ঘোড়া আর সোজা ভাবে চলে না। অনেক গৃহস্তের পরিবার ঘরের বেড়া ছিদ্র করিয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। কেনী বাহাদুরও আড় নয়নে চক্ষের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে মুখ দেখিবার জন্য নিরপরাধ দেড়হাজার টাকা দামের ঘোড়াটা নষ্ট করিতে উদ্যত, আজ সে মুখ তাঁহার পাপ চক্ষে পড়িল না। সাহেব অশ্ব হইতে নামিয়া স্নেহ বশে অশ্বগাত্রে হাত বুলাইয়া অনেক দেলাসা দিলেন। কিন্তু সে সময় তাহার চক্ষুর কার্য্য ভুলে নাই। সেই চক্ষু, সেই দর্শন, সেই আশা। ঘোড়া সহিসের হস্তে অর্পিত হইল। পীরবক্‌সের নিকট হইতে বন্দুক লইয়া কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দুক ভরা আছে?"

পীরবক্‌স জোড়াহাতে বলিল, "হুজুর আমি ভরিয়া আনিয়াছি।"

কেনী বন্দুক লইয়া একটী গ্রাম্য ময়না পাখীর প্রতি লক্ষ্য করিলেন। সকলেই বলিল, "হুজুর ও পোষা পাখী! হুজুরের চাকর জকি গাড়ওয়ানের ময়না পাখী, পোষ মানিয়াছে, বুলিও ধরিয়াছে!"

কেনী বলিলেন, "জকি গাড়োয়ান কে?"

একে বলিতে দশজনে বলিয়া উঠিল, "হুজুরেরই চাকর—গরুর গাড়ীর কাজ করে। হুজুরের বহুদিনের চাকর, এ বাড়ীঘর দোর সকলি হুজুরের, হুজুরই সকলের মালিক।"

সাহেব অন্যদিকে ফিরিয়া একটী ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ময়না জকির ঘরের মধ্যে পলাইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেনী পীরবক্‌সের হস্তে বন্দুক দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব শান্তভাবে চলিতে লাগিল। নীল জমি দেখা আজিকার মত এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। কিন্তু অকারণে দুই তিনজন কুলীকে চাবুক সই করিয়া কুঠীরদিকে ফিরিলেন। আপীস ঘরের সম্মুখে আসিয়া হরনাথ শ্রী মিশ্রী (নায়েব), শম্ভুচরণ সান্যাল (দেওয়ান) প্রভৃতিকে কটু কষায় কয়েকটী কথা কহিয়া গরম ভাবে বলিলেন, "যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কি করিয়াছ? সাঁওতার মীর সাহেবের নিকট পত্র লিখা হইয়াছে?"

হরনাথ বলিলেন—

"ধর্ম্মাবতার কোন বিষয়ে ক্রটী নাই। পত্র লিখা হইয়াছে, কেবল হুজুরের সহি বাকি।"

কেনী অশ্ব হইতে না নামিতেই তিন চারিজন আমলা ব্যস্ত সহকারে ঘোড়া ধরিলেন। "কৈ! সে পত্র কৈ?"

সান্যাল মহাশয় পত্র হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। আপীস ঘরের সম্মুখেই পত্র সহি হইল, তখনি সাঁওতায় লোক রওনা হইল।

কেনী বলিলেন—

"জকি গাড়োয়ানের বাড়ীতে একটী পোষা পাখী আছে, আমি সেই পাখীটা চাই।"

এইকথা বলিয়াই বাস ঘরের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন, "জকি যে দাম চাহে সেই দামই দিব। সকের জিনিষ জবরাণে লইব না। তোমরাও জবরদস্তি করিয়া আনিও না!"

এই কয়েকটী কথা যেন হৃদয় হইতে কহিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ
মীর সাহেব কে?

শাল ঘর মধুয়ার কুঠীর উত্তরে সাঁওতা গ্রাম। স্রোতস্বতী গৌরী নদীর পশ্চিম কূলে।—কুঠি হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান। সাঁওতার বিখ্যাত জমিদার মীর সাহেব। টি, আই, কেনীর চিন্তা উচ্চ, আশাও উচ্চ। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কুঠিয়ালগণ সাঁওতার জমিদারের সহিত ক্রমাগত বিবাদ, বিসম্বাদ করিয়া চিরকাল পরাস্ত হইয়াছেন। কেনী সেই সকল ইতিবৃত্ত শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই মীর সাহেবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। পরস্পর বিসম্বাদ করিবেন না—কোন প্রকারে কেহ কাহারও মন্দ চেষ্টায় যাইবেন না—আপদ বিপদে সকলেই সকলের সাহায্য করিবেন যোগ দিবেন। কোনদিন কোন কার্য্যে কেহ কাহাকে শত্রুভাবে দেখিবেন না। সর্ব্বদা পিরিত, প্রণয়ে, আপন বিষয় বিভবের কার্য্য চালাইবেন—উভয়েরই এই স্থির প্রতিজ্ঞা।

এই কেনীর সহিত বন্ধুতা স্থায়ী হওয়ায় ও অঞ্চলের সমুদায় নীলকরের সহিত মীর সাহেবের বনিবনাও হইয়াছিল। টি, আই, কেনী আজ যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মীর সাহেবের সহিত পরামর্শ আটিয়া অগ্রসর হইবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তাহাতেই পত্র লেখা।

মীর সাহেব কে? এখানেই পরিচয় দিয়া রাখি। কারণ অনেক সময় ইঁহার সহিত পাঠকগণের দেখা হইবে।

মীর সাহেব মোসলমান সমাজের সমুজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার বংশ মর্য্যাদা ভারত বিখ্যাত। যদিও তিনি ভারত রাজ্যের প্রান্তসীমা বঙ্গে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ, পবিত্র ধাম বোগদাদ শরিফের মহা মাননীয় এবং গণণীয়, সৈয়দ বংশ সম্ভূত, প্রভু সৈয়দ সাদুল্যার

বংশধর। সেই তাপসশ্রেষ্ঠ প্রভু সৈয়দ সাদুল্যা বোগদাদ শরিফ হইতে ভারতে ক্রমে বঙ্গরাজ্যে, পরিশেষে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত স্রোতস্বতী চন্দনা নদীর তীরে সেকাড়া গ্রামে অবস্থিতি করেন। সহচর, অনুচর, পরিসদ, মধ্যশ্রেণীর নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী, এমন কি রজক, নরসুন্দর পর্য্যন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে বোগদাদ হইতে ভারতে আসিয়াছিল। তাঁহার আগমনের কারণ ও অবস্থিতি বিষয়ে পর পর ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত সহ মীরসাহেবের সাঁওতা বাস পর্য্যন্ত বিবরণ 'আমার জীবনী' নামক গ্রন্থে লিখিত হইবে। এক্ষণে মীর সাহেবের উপস্থিত কার্য্য বিবরণই লেখকের লেখনীর আবশ্যকীয় উপকরণ।

মীরসাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি, এবং ঘোর আমোদী। পরিবার মধ্যে মাতৃহীন এক পুত্র, পিতৃহীনা এক ভ্রাতুষ্পুত্রী, দুই ভগ্নী এবং দাসদাসী ইত্যাদি। পুত্রের নাম আসগর আলী বয়স আট বৎসর। মীরসাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (শুকরন্নেসার পিতা) জীবিতকালে তিনিই সংসারের কর্ত্তা ছিলেন, এক্ষণে মীরসাহেবকে সেই সংসারের ভাল মন্দ যাবতীয় ভার বহন করিতে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর শুকরন্নেসার বিবাহ দেওয়াই মীরসাহেবের কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে অগ্রে প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি যে বিবাহ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই নারাজ। বিবাহের পূর্ব্বে মীর সাহেবের অতি নিকট সম্বন্ধীয় ভ্রাতা মীর আলী আসরফ খান বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, ভাই গট্টীর হজরত (প্রভু) দিগের সহিত কোন নূতন সম্বন্ধ করিও না। তাহাদের হৃদয় নাই, সমাজের ভয় নাই, লোক নিন্দার দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা মহাপাপকেও অতি তুচ্ছ মনে করে। আমি বার বার নিষেধ করিতেছি, সা গোলামের সহিত শুকরণের বিবাহ দিও না—কখনই দিও না—পরিণামে মনস্তাপ পাইবে, সর্ব্বস্ব হারাইবে—পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে। সাবধান! কখনই তাহাদের কথায় ভুলিও না। তুমি জাননা যে, তাহারা আপন সহোদরে সহোদরে কিনা করিতেছে! সমাজ হাসাইতেছে! ফরিদপুর অঞ্চল ডুবাইতেছে। এ সকল কথা স্মরণ রাখিও। কখনই সেই মূর্খ, নিরক্ষর সা গোলামের সহিত পিতৃহীনা কন্যার বিবাহ দিও না।

বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডাইতে কাহার সাধ্য! শত সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুকরন্নেসার বিবাহ সা গোলামের সহিত হইয়াছিল। বিবাহের পর জামায়ের হস্তে জমিদারী কার্য্যভার দিয়া মীর সাহেব আমোদের অংগ কিছু বেশী করিয়াছিলেন। সময় সময় জামাতাকে বলিতেন, দেখ বাপু! আমার কেহই নাই, কেবল মাত্র একটী পুত্র, তাহারও জীবনে সংশয়, সর্ব্বদাই পীড়িত। তোমরাই আমার বল, তোমরাই আমার সকল। আপন কার্য্য কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিবে। সংসারের ঝন্‌জাট আর আমার ভাল বোধ হয় না, স্ত্রী, পুত্র বিয়োগে আমার মন সর্ব্বদাই অস্থির থাকে। অনেক কার্য্যেও ভ্রম জন্মে। এক্ষণ বিষয়াদি রক্ষা করা না করা, সকলই তোমার ইচ্ছা। দুসন্ধ্যা দুমুট খেতে পেলেই আমি সুখী হইব।

সা গোলাম দেখিতে গৌরবর্ণ, মুখ চোখা, মাথায় কোঁকড়া চুল, চক্ষু দুটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, ভ্রূকুঞ্চিত। শীঘ্র শীঘ্র কথা, অস্পষ্ট কথা, বিশেষ মনযোগ করিয়া না শুনিলে সে কথা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তিনি অনেক শিষ্টচারী করিয়া বিশেষ ঐক্যের সহিত সংসারের কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। দিন দিন জমিদারীর উন্নতি, সংসারের উন্নতি, অবস্থার উন্নতি, বাড়ীঘরের উন্নতি, চারিদিকে উন্নতি। উন্নতির স্রোত লহরী, প্রবাহ, তরঙ্গ, ক্রমে বহিতে লাগিল,—ক্রমে ছুটিতে লাগিল।

মীর সাহেব অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়া আছেন, শালঘর মধুয়ার কুঠীর রামদয়াল সিং সেলাম বাজাইয়া একখানি পত্র দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। মীর সাহেব বাংলা ভাষা সচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন, লিখিতে জানিতেন না। মনে মনে পত্র পড়িয়া রামদয়ালকে বলিলেন,—সাহেবকে আমার সেলাম বল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পত্রের উত্তর যাইবে। রামদয়াল পুনরায় সেলাম বাজাইয়া নাগরা জুতা জোড়া যাহা দালানের সিঁড়ির নীচে রাখিয়া আসিয়াছিল, পায় দিয়া লাঠী ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেল।

মীর সাহেব বলিতে লাগিলেন, সুন্দরপুরের সহিত কাজিয়া করা বড় সহজ কথা নহে। সাহেব আজ পর্য্যন্ত প্যারী সুন্দরীকে চিনিতে পারেন নাই। তা—যা হ'ক্ দেবীপ্রসাদ কাছারীতে আসিয়াছেন কি না? মাংগন খানসামা দৌড়িয়া কাছারী ঘর হইতে প্রধান কার্য্যকারক দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া আনিল। কেনীর পত্র চৌবে ঠাকুরের হস্তে দিয়া মীর সাহেব বলিলেন, ইহার যাহা বিহিত হয় কর? আর সেইসঙ্গে ইহার উত্তর লিখিয়া দেও।

দেবীপ্রসাদ পত্র পাঠ করিয়া একটু চিন্তার পর বলিলেন, সাহেব যখন চাহিয়াছেন, দেওয়াই উচিত, কিন্তু এত লাঠিয়াল একদিনে ত জুটিবে না। মীর সাহেব বলিলেন, না জুটিলে উপায় কি। যত পার। যখন সাহায্য চাহিয়াছেন, তখন দিতেই হইবে। দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—নিজের হাত পা যাহারা, তাহাদের এ কাজে দিতে পারি না, সুন্দরপুরের ঘর কম নহে। পরিণামে যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। সাহেব এত দিন দুর্ব্বলকেই নির্য্যাতন করিয়াছেন, সকলের গায় ত হাত দেন নাই—এই প্রথম। যাক্ সে কথায় আমাদের কাজ নাই। এতদিন পরে মহীষ আর বাঘিণীতে বাধিল। ভালই হইল। হয় কেনীর সর্ব্বস্বান্ত, নয় প্যারীসুন্দরীর সর্ব্বনাশ! এই বলিয়া মীর সাহেব উঠিয়া গেলেন। দেবীপ্রসাদও পত্র হস্তে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কাছারি ঘরে আসিয়া বার দিলেন। চিঠি পত্র, লোক, যেখানে যেখানে পাঠান আবশ্যক, পাঠাইয়া স্নান আহার করিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ
প্যারীসুন্দরী

সুন্দরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরী। প্রধান কার্য্যকারক রামলোচন। সে সময়ের চলতি বাঙ্গলা ভাষায় রামলোচন খুব পাকা। জমিদারী ফন্দি ফেরেবেও দেশ বিখ্যাত। সকলেই জানে যে রামলোচন একজন বিখ্যাত মাম্‌লাবাজ।

কেনীর অত্যাচারে ছোট ছোট তালুকদার, জোতদার, নানা শ্রেণীর ব্যবসাদার, মহাজন প্রভৃতি নাজেহাল হইয়া পৈতৃক গ্রাম, বাড়ীঘর ছাড়িয়া নানা স্থানে নানা লোকের আশ্রয় লইতেছে, জাতি, ধন, মান, প্রাণ কৌশলে বাঁচাইতেছে। কেনী এ পর্য্যন্ত সুন্দরপুরের কোন প্রজার গায়ে হাত দেন নাই, কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, ইহাতেই রামলোচন নির্ভাবনায় জমিদারী চালাইতেছেন। প্যারীসুন্দরীও ঈশ্বরে ধন্যবাদ দিয়া নির্ভাবনায় আছেন।

একদিন প্রায় একশত প্রজা কাঁদিতে কাঁদিতে সুন্দরপুর উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের একমাত্র বল ভরসা, আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী যাহাকে জানিত তাঁহার নিকট বলিতে লাগিল, "মা রক্ষা কর! এতদিন বাঁচাইয়াছ, এখন বাঁচাও। দুরন্ত বাঘের মুখ হইতে তোমার গরীব প্রজার প্রাণ বাঁচাও। আগামীকল্য আমাদের বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল-বুনানী করিবে,—বহুতর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে। মা! আমাদিগকে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হস্ত হইতে তোমার গরীব প্রজাদিগকে রক্ষা কর। এতদিন ছিলাম ভাল, এখন মারা পড়িলাম। আর বাঁচিবার পথ নাই। সম্বৎসর আশা করিয়া চাষ করিয়াছি পেটে না খাইয়া ঘরের ধান মাঠে ফেলিয়াছি, স্ত্রী, পুত্র লইয়া খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব, আপনার রাজস্ব আদায় করিব আশাতেই সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ ধানখেতের দিকে চাহিয়া একটু স্থির রহিয়াছি। মা! আমাদের সেই বোনা ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব যদি নীল বুনানী করে, তবে আমরা একেবারে মারা পড়িব—ছেলেমেয়ে সমেত মারা পড়িব। মা! তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে আমাদের মুখের প্রতি একবার নজর করে এমন লোক জগতে আর কেহই নাই। মা! তুমিই আমাদের রক্ষা কর্ত্তা! মা! তোমার এই অধম সন্তানদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হাত হইতে বাঁচাও।"

প্রজাদিগের কাতর উক্তি শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন। প্যারীসুন্দরী রামলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমার প্রজার প্রতি অত্যাচার যাহা শুনিতে বাকি ছিল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ভাগ্যক্রমে তাহাই শুনিতে হইল! আমি থাকিতে আমার প্রজার প্রতি নীলকর ইংরেজ দৌরাত্ম্য করিবে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার প্রজার বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া কেনী

নীল বুনিবে, ইহা আমার প্রাণে কখনই সহ্য হইবে না। প্রজাদিগের দুরবস্থা আমি এ নারী চক্ষে কখনই দেখিতে পারিব না। যে উপায়ে হউক, প্রজা রক্ষা করিতেই হইবে। লোক, জন, টাকা, সর্দ্দার, লাঠিয়াল যাহাতে হয়, তাহার দ্বারা প্রজার ধন, মান, প্রাণ, জালেমের হস্ত হইতে বাঁচাইতে হইবে। ধান ভাঙ্গিয়া যাহাতে নীল বুনানী করিতে না পারে তাহার বিশেষ উপায় করিতে হইবে। আপন প্রজাকেই যদি দুরন্ত নর ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা করিতে না পারিলাম—ম্লেচ্ছ পাপাত্মার কঠিন হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলাম—তবে এ বিষয় বিভব, টাকা এবং জমিদারীতে প্রয়োজন কি? এখনি এ সকল প্রজার সাহায্যার্থ লোক পাঠাও। যদি যথার্থই সাহেবের পক্ষীয় লোকেরা এই সকল প্রজার ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী করিতে আইসে, দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা নাই—যে প্রকারে হয় তাহাদিগকে তাড়াইয়া—শাস্তি দিয়া তাড়াইয়া প্রজা রক্ষা করিবে। ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী করিলে কি আর প্রজা বাঁচিবে? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! কোথায় বেলাত, আর কোথায় এদেশ! একটী মাত্র ইংরেজ (কেনী) আসিয়া এদেশ উচ্ছিন্ন করিল। একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিল! কৃষি প্রজার জমাজামী কাড়িয়া লইয়া নীল বুনানী করিল। কত তালুকদারের তালুক, কত জোতদারের জোত জব্‌রাণে লিখিয়া লইল। কাহারও যথা সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া একেবারে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। হায় হায়! কি দুঃখ! যাহারা চিরকাল দুধে ভাতে, সুখ সচ্ছন্দে, আপন আপন পরিবার লইয়া সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে, কত অতিথি সেবায়, দেবতা পূজায়, দীন দুঃখীর সাহায্য করিয়া কত লোকের উপকার করিয়াছে, কত অনাহারীর আহার দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, এ ক্ষণে তাহারাই একটী পয়সার জন্যে লালায়িত! তাহাদেরই পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, থাকিবার স্থান নাই! হায়! হায়! তাহাদের মা, ভগ্নী, স্ত্রী, মাসী, পিসীর উদরের দিকে চাহিলে কাহার না চক্ষু জলে ডুবিয়া যায়? সে জীর্ণ শীর্ণ শরীরে শত গ্রন্থীযুক্ত পরিধেয় প্রতি দৃষ্টি পড়িলে কাহার না অন্তরে ব্যথা লাগে? সে দুঃখ কি আর মানুষে চক্ষে দেখিতে পারে? ঐ কেনীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া কত ভদ্র সন্তান, কত নিরীহ লোক পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোথায় কোন্ দেশে চলিয়া গিয়া জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতেছে। যাহারা পৈতৃক ভিটার মায়া মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা যথা সর্ব্বস্ব দিয়াও রক্ষা পায় নাই। নীল কাটা, হউজ মাই, নৌকার গুণ টানান এই সকল কার্য্যে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইতেছে। ইহার পর আবার সময় সময় হাত পা বান্ধিয়া গাছে লটকাইয়া চাবুকে পীঠের খাল তুলিতেছে! উহু! কি ভয়ানক নর ব্যাঘ্র! কি করিব, আমি দেশের রাজা নহি, সকলে আমার অধীনস্থ প্রজা নহে, এদেশের সকল জমিদারী প্যারীসুন্দরীর নহে। কি করিব, এদেশের আর কাহারও কিছু রাখিবে না। ও বেলাতী কুকুর এদেশের সকলকেই দংশন করিবে! সে বিষে সকলেই জর্জ্জরীভূত হইবে। প্রথমেই ঐ ম্লেচ্ছের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া না দিলে শেষে আমার জমিদারী পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ভস্মীভূত

করিবে। আমাকে যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। শেষে কি সুন্দরপুরের ঘরের নাম ডুবিবে! হায়! হায়! শেষে কি কেনীর হস্তে সুন্দরপুরের ঘর মাটি হইবে?

রামলোচন বলিলেন—"কেনীর সাধ্য কি যে আমাদের প্রজার উপর অত্যাচার করে। যে উপায়ে হয় আমি তাঁহাকে দুরস্ত করিব। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের বিষয় সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মেজাজ গরমী চড়িয়াছে। আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে যে উপায়ে হয় তাঁহাকে এমন শিক্ষা দিয়া দিব যে আর কখনও সুন্দরপুরের নাম স্বপ্নেও মুখে না আনেন—মনে না করেন। আর বাঙ্গালী হইলেই যে শেয়াল কুকুর হয় তাহাও না ভাবেন। এই বলিয়া রামলোচন বিদায় হইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত রামলোচন লাঠিয়াল জোগাড় করিয়া প্রজাগণের সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। এবং একজন সাহসী কর্ম্মচারীকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া প্রজাগণকে সঙ্গে দিয়া তখনই সুন্দরপুর হইতে ঘটনা স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে ভারলের[১] কাছারী পঁহুছিবে, এবং তথা হইতে যত লোক পাও সঙ্গে লইয়া সেই ধানের জমিতে যাইয়া থাকিবে। প্রাণ থাকিতে সাহেবের লাঠিয়ালকে আমার এলাকায় পা দিতে দিবে না। যেখানে যাহাকে পাও মারিবে! ধরিয়া আনিতে পারিলে ত কথাই নাই।

একে একে সকলেই রামলোচনের আশীর্ব্বাদ লইয়া সুন্দরপুর হইতে বিদায় হইল।

চতুর্থ তরঙ্গ
বাঙ্গালী যুদ্ধ

বাঙ্গালী যুদ্ধে ডাক ভাঙ্গা[২]। এক প্রকার উৎসাহ সূচক বাজনা—এবং দূতের কার্য্য করে। ডাকের উত্তর প্রত্যুত্তরেই ক্ষমতা, বল, লোকসংখ্যা সকলই বোঝা যায়। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, কেবল ডাক ভাঙ্গার উত্তর প্রত্যুত্তরেই নিস্তেজ পক্ষ হটিয়া যায়। আর অগ্রসর হয় না। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই প্যারীসুন্দরীর সর্দ্দারগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে মার্ মার্ শব্দে আসিয়া পড়িল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে একেবারে ভগ্নহৃদয়ে হতাশ হইয়া—নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কারণ সাহেবের লাঠীয়ালগণ বিরোধীয় ভূমিতে পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। কেবল প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিল মাত্র। উভয় পক্ষের মশালের আলো

১। "ভারল" গ্রামের নাম।

২। "ডাক ভাঙ্গা" সকলে একত্রে উচ্চৈঃস্বরে ভীষণ রব করা।

দেখিয়া উভয় পক্ষ ডাক ভাঙ্গিয়া উত্তর প্রত্যুত্তরেই বুঝ সমুজ হইয়া গেল! উভয় পক্ষ জানিল যে কোন পক্ষই কম নহে। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা স্থির করিল যে রাত্রে লাঠালাঠী, মারামারী করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। কে কোথা হইতে কাহাকে মারিবে, কে মরিবে, কে বাঁচিবে কে রক্ষা করিবে, কে দেখিবে, একটু অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বদিক ফরসার সহিত আমরাও ওদিকে ফরসা করিয়া দিব।

মায়াময়ী নিশা পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। দুই দলে স্পষ্ট দেখাশুনা হইল। ছেড়ছাড় মিষ্টি গালী গালাজ চলিল। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা সজোরে ডাক ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা মনে করিয়াছিল যে, যে জমির ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল বুনানী করিবেন, সে জমি পীছে ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমায় দাঁড়াইয়া বুনানী ধান রক্ষা করিবে। সাহেবের লাঠীয়ালদিগকে আর সে জমির দিকে আসিতেই দিবে না। সে আশা বিফল হইল। কারণ সাহেবের লাঠীয়ালেরা পূর্ব্বেই ধান খেত পাছে করিয়া আপন আপন আয়ত্ব ও সুবিধা মত আনি (ব্যূহ) বান্ধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাত বায়ু বহিয়া পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার করিয়া দিল। মশালের আলো মলিন হইয়া মুখে ছাই মাখিয়া নিবিয়া গেল। পুনরায় উভয় দলেব কথা চলিল। ক্রমে গালাগালী, শেযে লাঠালাঠীর উপক্রম। ওদিকে কেনীর পক্ষ হইতে শতাধিক লোক লাঙ্গল গরু জুড়িয়া ধান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। প্যারীসুন্দরীর কার্য্যকারক, যিনি হুকুম দেহেন্দা হইয়া আসিয়াছিলেন, ঘোড়া টপকাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দৈবাৎ সাহেবের সর্দ্দারদিগের পিছনে বহুতর গরু ও লাঙ্গল দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! আর দাঁড়াইয়া কি কর ওদিকে দফা রফা। ঐ দেখ ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনিতেছে। আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না! সর্ব্বনাশ হইল! সুন্দরপুর গিয়া কি জবাব দিব!"

প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা বিকট চীৎকার করিয়া কেনীর লাঠীয়ালের প্রতি আক্রমণ করিল। বিপক্ষদলও বিশেষ শিক্ষিত—কিছুতেই হেলিল না। আনি ভাঙ্গিল না—এক পাও নড়িল না। লাঠী উড়—সড়কী অবিরত চলিতে লাগিল। কেনীর লাঠীয়ালেরা কেবল আত্মরক্ষা করিতেছে, এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত (ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী) আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না, ইহাই তাহাদের স্থির সংকল্প।

এদিকে সূর্যদেবের আগমন সহিত টি, আই, কেনী বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্বরিত বেগে আপন লাঠীয়ালদিগের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। দেখিতে দেখিতে ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী শেষ হইয়া গেল।

সাহেব গভীর স্বরে বলিলেন, 'আর দেখ কি লাগাও!"

স্বয়ং মনিবের হুকুম। পাঁচ শত লাঠিয়াল একত্রে সেই বিকট চীৎকারে, মাঝে মাঝে ঝ—ঝ শব্দ করিয়া মনিবের সাহস ও উৎসাহ বাক্যে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেনী, লাঠীয়ালদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা সাহেবকে স্পষ্টভাবে দেখিতেছে। অশ্ব উচ্চ, কেনীর শরীর উচ্চ, সকলের মাথার উপর মাথা—সে মাথার উপরে

আরো উচ্চ টুপী। সকলেই দেখিতেছে যে, আজ কেনী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ মধ্যে সড়কিওয়ালা সর্দ্দার অনেক ছিল। একজন সড়কিওয়ালা সর্দ্দার টি, আই, কেনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উড়সড়কি এমন কৌশলে নিক্ষেপ করিল যে, সাহেবের টুপী সড়কির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল না। সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুই তিনজন প্রধান প্রধান লাঠীয়ালের পৃষ্ঠে চাবুক সই করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ড্যাম সুয়ার, কেবল ডাক ভাঙ্গিতে জান? পায়তারা করিতে জান, লাঠি ভাঁজিতে জান, মারিতে জান না? লাগাও, তাড়াও মার সুয়ার লোক্‌কো"।—

লাঠীয়ালেরা হুকুমের জোরে চাবুকের জ্বালায় বিপক্ষ দল প্রতি সজোরে লাঠী সড়কি মারিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমশই অগ্রসর—প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা আঘাতিত হইতেছে, কিন্তু পৃষ্ঠ দেখাইতেছে না, দৌড়িয়া পলাইতেছে না। ক্রমে পিছে হটীয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে যাইতেছে। দুই তিনটী লোক পীছে হটীয়া যাইতে যাইতে দৈবাৎ উচ্চনিচু স্থানে যেই পড়িয়াছে, অমনি সাহেবের লাঠীয়াল সড়কি দ্বারা আঘাত করিয়া বিন্ধিয়া ফেলিল, আর উঠিতে দিল না। মানুষের রক্তের ধার ছুটিল! কেহ উঠিয়া বসিতেই পড়িয়া গেল। কেহ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। রক্তমাখা সড়কির দিকে দৃষ্টি করিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ ঢাল, সড়কী, লাঠী ফেলিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে পালাইতে আরম্ভ করিল। যে যেদিক সুবিধা বুঝিল, সে সেইদিকেই যথাসাধ্য দৌড়িল। হুকুম দেহেন্দা মহাশয় কোন্ সময় চম্পট দিয়াছিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

টি, আই, কেনীর উৎসাহে তাঁহার লাঠীয়ালগণ অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত বিপক্ষগণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। শেষে তাহারা একেবারে দল ভাঙ্গা হইয়া ঝাড়ে জঙ্গলে এবং সম্মুখে গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। টি, আই, কেনী সদর্পে বলিতে লাগিলেন—"আর আগে বাড়িও না। এক্ষণে প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের বাড়ী ঘর যাহা সম্মুখে পাও ভাঙ্গিয়া ফেল। জিনিসপত্র লুটিয়া লও।"

আদেশমাত্র লুঠ আরম্ভ হইল। থালা, ঘটী, বাটী এবং কৃষক স্ত্রীদের গায়ের রূপার অলঙ্কার সর্দ্দারগণ টানিয়া ছিঁড়িয়া খসাইতে আরম্ভ করিল। পাষণ্ডেরা স্ত্রীলোকদিগের পরণের কাপড় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া কেহ মাজায়, কেহ মাথায় বান্ধিয়া বাহাদুরী দেখাইতে লাগিল। গরুসকল তাড়াইয়া কুঠীরদিকে লইয়া চলিল। ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র যাহাই সুবিধা পাইল লইল, অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার্ করিয়া শেষে ভাঙ্গাঘরে, ভালঘরে আগুন লাগাইয়া টি, আই, কেনী লাঠীয়ালগণসহ কুঠীরদিকে ফিরিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজার সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বনাশ!—বিনাস—একেবারে রসাতল। মাথা ভাঙ্গিয়া কান্না।—স্ত্রীলোকেরা ঝাড়ে জঙ্গলে প্রাণের ভয়ে জাতির ভয়ে লুকাইয়া বাড়ী পোড়া আগুন—জল পোরা চক্ষে দেখিয়া মৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সাহেব সদলে কুঠীতে আসিয়াই লাঠীয়ালগণকে বক্‌সিস্ দিয়া খুসি করিলেন। লুটের মাল কাঁসা, পীতল, বস্ত্রাদি লাঠীয়ালগণের বাড়ীতে গেল। সোনা রূপা সাহেবের আলমারীতে উঠিল। গরু সকলের

গায়ে তখনি T.I.K. মার্কা বসাইয়া কুঠীর সামিল হইল। সময়ে এ সংবাদ সকলেই শুনিলেন। হায়! হায়! ভিন্ন আর উপায় কি!

টি, আই, কেনী পত্র দ্বারা মীরসাহেবকে এ শুভ সংবাদ জানাইলেন। মীরসাহেব প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। কি করিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজের সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। জানিত পক্ষে কেনীর অপকার করিবেন না, এইটীই তাঁহার স্থির সংকল্প। বোধ হয় কেনীর পত্রের উত্তর, সন্তোষ এবং হরিষের কথা পুরিয়া দিয়াছিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজাদিগের দুরবস্থার কথা শুনিতে কাহারও বাকি থাকিল না। অন্যান্য জমিদার, তালুকদার, মধ্য শ্রেণীর জোতদার, প্রজা, সকলেই ভয়ে ভীত, ব্যস্ত—অস্থির। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, এই ভাবনাতেই সকলে অস্থির।

কেনী ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী জোতদার, তালুকদারদিগকে পত্র দ্বারা কাহাকে লাঠীয়াল দ্বারা আনিয়া, তাহাদের পৈতৃক ভূসম্পত্তি আপন সুবিধা মত কবালা, পত্তনী এবং মিরাস স্বত্বে দলীল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন। চির দখলী পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি লিখিয়া দিতে যিনি একটু ওজর আপত্তি করিলেন, তিনিই সিরাজদ্দৌলার অন্ধকূপসম গুদামজাত হইলেন। কষ্টের একশেষ। বাধ্য হইয়া, সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কেনীর মনোমত দলীল লিখিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। অমানুষিক কয়েদ হইতে খালাস পাইলেন।

সে সময় কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনীই রাজা, কেনীই প্রায় হর্ত্তাকর্ত্তার মালিক। যা করে—কেনী। শালঘর মধুয়ার কুঠীর দিন দিন উন্নতি। নীলের উন্নতি, রেসমের উন্নতি, চতুর্দ্দিকে কেনীর নাম। কেনীর নামে পুরুষের পীলে কাঁপে, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়! ছোট ছোট ছেলেরা কেনীর নামে ভয় পায়। কেনীর দৌরাত্ম্য আগুনে দেশের লোক জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল। কুঠীর নাম শুনিলেই হৃদয় কাঁপে। কুঠীর সীমা মধ্যে পা ধরিতে অনেকেরই প্রাণ কাঁপিয়া—অঙ্গ শিহরিয়া উঠে—মুখ শুকাইয়া যায়। কুঠীর সম্মুখে কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া লোকজনের গতিবিধি ভিন্ন, কুঠীর পার—পূর্ব্ব পার দিয়া কেহই যাইতে সাহসী হয় না। নিকটবর্ত্তী জমিদার, তালুকদার, সকলেই কুঠীর চট্‌কা (বৃক্ষ বিশেষ) তলায় পড়িয়া আপন আপন পীর পয়গম্বর বা ইষ্টদেবতার নাম করিয়া থাকেন। কার ভালে কি হয় কে জানে! বিনা তলবে আফিস ঘরে কাহারও যাইবার অনুমতি নাই। কার সাধ্য সে আজ্ঞা লংঘন করে? বা বিপর্য্যয় ঘটায়? ঘরাও বিবাদ, প্রজায় প্রজায় মারামারী, স্বত্বাস্বত্বের বিচার, খত পত্র তমঃসুক ইত্যাদি যাবতীয় নালীশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।—পরে শুনিয়াছি যে, কেনীর অনারারী মাজিষ্টারের ক্ষমতা ছিল।

কুষ্টিয়ায় মহকুমা হয় নাই। জেলাও পদ্মার পার। জমিদার কেনী—বিচার কর্ত্তা কেনী—মহারাজও কেনী। রাখেন তিনি, মারেন তিনি। যারা আগে থেকেই কেনীর পায়ে

মুজা চড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা একটু আছেন ভাল। বিশ্বাস ছিল যে, বিচার না করিয়া আর গুদামে পুরিবে না।

এ গুদাম—বড় ভয়ানক বন্দীখানা। সরকারী গুদামে পেট পুরিয়া না হউক, কয়েদী দুবেলা দুমুঠো ভাতের মুখ দেখিতে পায়। এ গুদামে তা-নয়, এ বন্দীখানার সে কথা নয়, ইহার ভিন্ন ভাব--অন্য কারবার—বড় ভয়ানক স্থান! সেখানে শুইবার বিছানা নাই, বালিস কাঁথা কম্বলের নাম নাই। ভাতের মুখ দেখিবার ভাগ্যই নাই। আহারের ব্যবস্থা ধান। —ধান বাছ, চাল্ বাহির কর, জলে মিশিয়ে গিলে ফেল।

পঞ্চম তরঙ্গ

আবার

রামলোচন একখানি পত্র প্যারীসুন্দরীর নিকট দিয়া বলিলেন, পত্র প'ড়ে দেখুন।

প্যারীসুন্দরী পত্র পাঠ করিয়া ক্ষণকাল নিরবে চিন্তা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, যে কোন বিশেষ গুপ্ত কথা পত্রে লিখা।—ক্ষণকাল পরে বলিলেন, এবারেও যদি গত বারের মত হয়, তবে আর—কাজ নাই,—অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।—

রামলোচন বলিলেন।—

—চেষ্টায় ত্রুটি নাই। জয় পরাজয় ভগবানের হাত—দেখি! এবারেও দেখি!

প্যারীসুন্দরী বলিলেন,—

—দেখিতে আমার আপত্তি নাই।—কিন্তু খুব সাবধান—খুব সতর্কে, এবারে খুব সতর্ক ভাবে কার্য্য করিবে। ঐ ম্লেচ্ছ ইংরেজ বেটা (কেনী) কোন্ দেশ হইতে এদেশে আসিয়া, দেশের লোকের সাহায্যে আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছে। প্রজার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! একটী শ্বেত রাক্ষসে আমার জমিদারী পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে বসিয়াছে।—ম্লেচ্ছ বেটা দর্প করিয়া বলিয়াছে যে, "প্যারীসুন্দরীক্কে যে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। আমি ভাল করিয়া বিলাতী সাবানে তাহার গায়ের মলা দূর করিয়া যাতে বাঙ্গালীর গন্ধ শরীর হইতে একেবারে সরে যায় তার উপায় করিব। গাউন পরাইয়া দিব্বি মেম সাজাইয়া কুঠীতে রাখিব।" কি ঘৃণা!! কর্ণ তুমি বধির হও বধির হও—

রামলোচন বলিলেন।—

"হুজুর! যত শুনা যায় তত নয়। আবার পর মুখে পরের কথা কিছু বেশী পরিমাণেই কানে আসে। ও সকল কথায় কান দিবেন না। শত্রুর মুখ—আর পাগলের জিহ্বা, এ দুই ই সমান! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!—বাজে কথা বলার জন্য বাজে মুখ আছে। শুনিবার

জন্যও বিস্তর কান রহিয়াছে! আমরা কাজের কথা শুনিব। এবং যাহা মনে আছে করিব। ও সকল হাওয়াই কথায় কখনই কান দিব না।

"বাজে কথায় কান না দেওয়াই ভাল, কিন্তু কেনীর মেমকে যে হাতে আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া তাহার জন্যে ধরা রহিল,—ইহার পর—মনের মত তাহাকে সন্তুষ্ট করিব।—আজীবন তাহার চাকুরী বজায় থাকিবে। মৃত্যুর পরেও তার বংশাবলী সুন্দরপুরের ঘর হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইবে।"

রামলোচন বলিলেন।—

এ উতলার কার্য্য নহে। সকল দিক রক্ষা করিয়া, মান, সম্ভ্রম, এবং প্রাণ বাঁচাইয়া এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রোষবসে সাংঘাতিক কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া মানুষের কার্য্য নহে। আগে আত্মরক্ষা শেষে যাহা ইচ্ছা। ইহার অন্যথায় নিত্য নূতন বিপদ ঘটিবারই বেশী সম্ভাবনা। এই ত সেদিন তাড়াতাড়ী করিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া আগা গোড়া আঁটিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কিছুতেই ঠকিতাম না। সাহেবের লোকেরা কি সুন্দর কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া চলিয়া গেল। বিবেচনার ত্রুটিতেই সরকারী চাকর ১০/১২ জন অনর্থক জখমী হইল। যদিও তাহারা প্রাণে মরিবে না কিন্তু আশঙ্কা অনেক।

"আমি যে কিছু না বুঝি তাহা নহে। কিন্তু এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য ইহা আমার প্রাণে কখনই সহিবে না। যাহা হইবার হইয়াছে। গত কথায় আর ফল কি? এবারে কত লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়াছ? এবার তোমাকে স্বয়ং যাইতে হইবে। কুঠী পর্য্যন্ত নিজে না যাও, আমার কাছারী বাড়ীতে থাকিবে। ইংরেজ দেখিলেই তোমরা যে কেন এত ভয় কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সেও মানুষ, তোমরাও মানুষ। তোমাদেরও দুই হাত দুই পা, তাহাদেরও তাহাই। কোন হাড় কি শিরা তোমাদের শরীর অপেক্ষা তাহাদের বেশী নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও কোন প্রভেদ নাই, আছে কেবল রঙ্গের প্রভেদ। আর একটু প্রভেদ আছে। তোমরা নীলকর কুঠীয়ালদের ন্যায় পরিশ্রমী নও, বুদ্ধিমানও নও। কেনীর ন্যায় মিথ্যাবাদীও নও, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চকও নও। অত স্বার্থপরও নও। আমি শুনিয়াছিলাম যে টি, আই, কেনী বিলাতের ভদ্রবংশীয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সে সকল কথারই কথা। এখন দেখিতেছি কেনী চামার অপেক্ষাও অধম, মেথর অপেক্ষাও নীচ। ঐ কুঠীরই একজন সাহেবকে সাঁওতার বড় মীর সাহেব কি করিয়াছিলেন মনে আছে? আজ যে মীর সাহেব কেনীর আজ্ঞাবহ, সেই মীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে কীর্ত্তি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, চিরকাল এদেশে সাধারণের মনে সে কথা আঁকা থাকিবে। তাঁহার ক্ষমতাকে সহস্র ধন্যবাদ। যে নীলকরকে দেখিলে তোমরা দশ হাত সরিয়া পড়, দুই হাত সেলাম বাজাইতে বাজাইতে পিছে হটিয়া হাঁপ ছাড়, দেবতার ন্যায় পূজা কর, যম হইতেও ভয় কর। সত্য কথা বলিব তাহাতে আর দোষ কি? নিন্দারই বা কথা কি? সাহেব দেখিলে সকলেরই যেন গা কাঁপিয়া ওঠে। সে গিডিমিডি কথা কানে গেলে মহামহিম মহাশয়েরও

প্রাণ উড়িয়া যায়। সেই নীলকরকে ধরিয়া তিনি যেরূপ শাস্তি করিয়াছিলেন, তাহা এদেশের সকলেই জানে। বড় মীর ঐ শালঘর মধুয়ার কুঠীর একজন কুঠীয়াল সাহেবকে ধরিয়া, দিনে দুপুরে তাহার একটী কান কাটিয়া লইয়াছিলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচার করাতেই না তাহার রাগ—সাহেবেরও শাস্তি। —আমি কি বলিব। আর কি করিব। —সমুদায় কার্য্য পরের হস্তে। —সুধু মুখের কথায় কি হয়? যা হউক আমি আবার বলিতেছি কেনীর মেমকে তোমার নিকট চাই।"

রামলোচন বলিলেন।—

হুজুর! আমার নিজের কার্য্য নহে। যাহা করিব সকলই পরের হস্তে, আমি জোগাড়ের ত্রুটি করি নাই, কখনও করিব না। টাকা খরচ করিতেও আপনার হুকুমের অপেক্ষায় থাকি নাই, থাকিবও না—দেখি, এবারে ঈশ্বর কি করেন। এই বলিয়া রামলোচন প্যারীসুন্দরীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ
মিসেস কেনী

যে সময়ের কথা, সে সময় কুষ্টিয়ার মহকুমা বসে নাই। কেনীর জমিদারীর কতক অংশ পাবনার সামিল, কতক মাগুরা যশোহরের অধীন। বিশেষ কোন আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে কেনীকে স্বয়ং যশোহরে যাইতে হইয়াছিল। যখন সংবাদ পাইয়াছেন, তখনই বেহারার ডাক বসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রে সংবাদ রাত্রেই যাওয়া—অনেকেই তাঁহার যশোহর গমনের খবর পায় নাই।

প্যারীসুন্দরীর গুপ্তচর সন্ধান করিয়া সুন্দরপুরে যে সংবাদ দিয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ কুঠীর লোকেই কেনীর সংবাদ ঠিক জানে না। অনেকেই জানে, সাহেব কুঠীতেই আছেন। কেনী কুঠী হইতে বাহির হইলেন, মেম সাহেব পিয়ানোয় হাত দিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ানোর সুরে সুর মিলাইয়া গান করিলেন। ক্লান্তবোধেই হউক, কি নিশির স্তব্ধতায় বিশেষ কোন কথা মনে উঠিয়াই হউক, হৃদয় বিচলিত হইয়া মিহি সুর বন্ধ হইল। পিয়ানোর বাজনাও থামিয়া গেল। হৃদয়ে যে চিন্তার লহরীই খেলিতে থাকুক, তাহা মুখে ফুটিল না। মনের কোন কথা মুখে আনিলেন না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল যেন তিনি কি ভাবিতেছেন?—তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থার কথা—ইংলণ্ডের কথা? তাঁহার ভাগ্যের কথা? ভাবিতেছিলেন কেনীকে বিবাহ করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইংলণ্ডে থাকিলে এত সুখ ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। নৃত্য, গীত, আহার, বিহার, আমোদ, রাজপ্রাসাদে রাজভোগ, ইহা কখনই তাঁহার সুন্দর ললাটে জুটিত না। হয় জুতা সেলাইয়ের সুতার যোগাড়, না হয় কাপড় স্ত্রীর সরঞ্জাম দুরস্ত, নয় দোকান ঘরে বিকি, কিনি, কি অন্য কোনরূপ ব্যবসা অবলম্বন
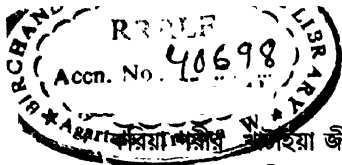
করিয়া শরীর খাটাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ভারতে আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। সুখের সীমা পর্য্যন্ত (বোধ হয় তাহার মতে) উপভোগ করিতেছেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়া যেন তিনি চেয়ার হইতে উঠিলেন। শয়ন কুঠরীতে গিয়া রাত্রিবাস মোলায়েম (রেশমী) কাপড় পরিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। পাখা চলিতে লাগিল। বোধ হয় ভাগ্য-ফল আলোচনা করিতে করিতে ঘুমে মাতিয়া পড়িলেন।

পাখীদের প্রভাতি গানেই প্রতিদিন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। নিশি শেষে আজ নূতন প্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। হো! হো! মার! মার! লাঠির ঠাকাঠক, লোকরে গব্‌রা—এই নূতন প্রকার শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাত বায়ু জানালার খড়্‌খড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার রেসমী বসন সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখার ঝালর মৃদু মৃদু নড়িতেছে। মিসেস কেনী এই সকল ভাব, আধ নিমীলিত আঁখিতে, আধ আধ ভাবে দেখিয়া প্রাভাতিক সমীরের স্বাভাবিক মোহমন্ত্রে আবার নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। কিন্তু নিদ্রার আবেশ বেশীক্ষণ রহিল না। ভীষণ রবে, লাঠীয়ালগণের হুহুঙ্কার এবং মার্ মার্ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণ দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একি কাণ্ড? কি ব্যাপার? মহা গোলযোগ! পালঙ্ক হইতে ত্রস্তে উঠিয়া তাড়াতাড়ি গবাক্ষ দ্বারে মুখ দিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শয়ন ঘরের চতুঃপার্শ্বে এবং কুঠীর চারিদিকে বহুতর লাঠীয়াল। কুঠীর হাতায়, এবং প্রবেশ দ্বারে, ঢাল সড়কী, বল্লমধারী সারি সারি লাঠীয়ালগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান, সকলেই অপরিচিত। কুঠীর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিবার মধ্যে দেখিলেন প্রবেশ দ্বার হইতে কুঠীর লোকদিগকে মারিয়া তাড়াইতেছে। তাহারা আঙ্গিনায় আসিতে যতই চেষ্টা করিতেছে, ততই লাঠির আঘাতে আঘাতিত হইতেছে। বহু চেষ্টাতেও আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মহা বিপদ! একি! এরা কারা? কি জন্য আসিয়াছে—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া সিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। গবাক্ষে মুখ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাহেব কুঠিতে নাই।"

লাঠীয়ালদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, আমরা সাহেবকে চাই না। তোমাকে চাই। প্যারীসুন্দরীর হুকুম, তোমাকে সুন্দরপুর যাইতে হইবে। কথায় না যাও—লইয়া যাইব!

মিসেস কেনী বলিলেন—

"বাপু সকল! তোমরা আমাকে লইয়া কি করিবে? আমি তোমাদের কিছুই করি নাই, আমাকে বাঁচাও!"

সাদা মুখের কথা শুনিতে কাহার ভাগ্য! আজ মিসেস কেনী বিপদে পড়িয়া লাঠীয়ালদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু কার ভাগ্য সে মুখের কথা শুনিতে পায়? যাহা হউক মিসেস কেনী তিন চারটী কথা কহিয়াই কার্য্য উদ্ধার করিলেন। স্ত্রীলোকের জয় না আছে কোথায়? তাই আবার বিলাতী মুখ! যার তুলনা ভারতে নাই। লাঠীয়ালগণের এত উৎসাহ এত জোরে কথা,—মিসেস কেনীর ঐ একটী কথায় কোথায় যে সরিয়া

গেল তাহার সন্ধান হইল না।—যে মুখ তুলিয়া তাকাইল সে তাকাইয়া রহিল। যে কানে শুনিল সে কান পাতিয়াই রহিল। মিসেস কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া এক তোড়া টাকা উপর হইতে নীচে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। অর্থের কাঙ্গাল বাঙ্গালী। টাকার মুখ দেখিয়াই গলিয়া পড়ল। যে কার্য্যে আসিয়াছিল, তাহা মন হইতে একেবারে সরিয়া গেল। সড়কী, ঢাল, লাঠী, তরবার মাটিতে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি টাকা কুড়াইতে লাগিল। যে যত পারিল লইল, কেহ কোমরে গুঁজিল, কেহ কাপড়ে বান্ধিল। টাকার লোভে শেষে আপসে আপসে সংগ্রাম বাধিল। মিসেস কেনীর নিক্ষিপ্ত টাকা সমুদয় কুড়াইয়া লইয়া শেষে বলবানেরা, দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। কেহ সাহায্য করিল, কেহ বা সে সাহায্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইল।

মিসেস কেনী এই সুযোগ দেখিয়া আর এক তোড়া কুকুর কাণ্ড মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। সে সময়ে আপসে আপসে প্রকাশ্য ভাবে মারামারি বাধিয়া গেল। কোথায় সড়কী, কোথায় লাঠী, কোথায় কি পড়িয়া রহিল সে দিকে কাহারও লক্ষ থাকিল না। টাকা লইয়া কাড়াকাড়িতেই মাতিয়া গেল। আপসে আপসে মারামারি, টানাটানী, হেঁচড়াহেঁচড়ী আরম্ভ করিয়া কেনীর লাঠীয়ালগণের অনেক সুবিধা করিয়া দিল। বিপক্ষ দলের লাঠী সড়কী হাতে লইয়া অর্থলোভী নিমক হারামদিগকে ধরিবার আশয়ে কুঠীর লাঠীয়ালেরা মার্ মার্ শব্দে আসিয়া পড়িল। টাকার এমনি লোভ—টাকা এমনি জিনিষ যে তখনও সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। রূপার চাকিতে চক্ষে ধাঁদা লাগিয়াছে। আত্মহারা, জ্ঞানহারা হইয়া সকলেই ভ্রমে—মহাভ্রমে পড়িয়াছে। কুঠীর লাঠীয়ালগণের লাঠী পিঠে পড়িতেছে, মাজা দমিয়া যাইতেছে, কেহ মাটিতে গড়িয়া পড়িতেছে, চক্ষু তুলিয়া ফিরিয়া দেখিয়াই চম্পট।—দৌড়িয়া পথে অপথে পলায়ন। যাহারা প্যারীসুন্দরীর নির্দ্দিষ্ট বেতন ভোগী তাহারাই কেবল রামলোচনের নিকটে ভারলের কাছারীতে ফিরিয়া গেল। বিদেশী সর্দ্দারেরা আপন আপন সুবিধা মত আপন আপন পথ খুজিয়া লইল। হুকুম দেহেন্দা দলপতি মহোদয়ের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না।

মিসেস কেনী নীচে নামিয়া বাক্স, আলমারী যাহা পূর্ব্ব হইতে জরাজীর্ণ ছিল, নিজের চাকর দ্বারা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ফুলের টব, পাপোস, চেয়ার ইত্যাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কতক ঘরের বাহিরে, কতক সিড়ির নীচে, কতক ভগ্ন, কতক স্থান ভ্রষ্ট করিলেন। এবং তখনই জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট পত্র লিখিয়া রামরূপ সিংহকে অশ্বারোহণে জেলায় পাঠাইয়া দিলেন। সম্ভু সান্যালকে ডাকিয়া কুঠীতে চড়াও, মালামাল লুট, বাক্স আলমারী ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা অপহরণ—দিনে ডাকাইতি, এই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিয়া মীর সাহেবের নিকটেও পত্র পাঠাইলেন।

হরনাথ মিশ্র প্রধান কার্য্যকারক বাসাবাড়ীতে থাকিয়াই কুঠীর সমুদয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এখন আর গোলযোগ নাই দেখিয়া মেম্ সাহেব নিকট আসিয়া বলিলেন—

"হুজুর! আর একটী কার্য্য করিতে হইবে গোপনে বলিব।"

মিসেন কেনী বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল জান কর, আমার নিকট আর জিজ্ঞাসা করিও না।"

হরনাথ তখনি অফিস ঘরে যাইয়া কি মন্ত্রণা করিলেন তিনিই জানেন। এক ঘণ্টার পর এক প্রকার হৃদয় বিদারক শব্দ শুনা গেল। বাবাগো—মলেমগো—আমি কিছুই জানি না—হা খোদায়—

সপ্তম তরঙ্গ

ঘর জামাই

এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না। কলমের চারাও একেবারে খাঁটী ওৎরে না। আর একটী কথা, শত বৎসরও যদি কোন গাছের উপর, ভিন্ন গাছ জীবিত থাকিয়া ডালপালা ছাড়ে, তত্রাচ তাহার নাম পরগাছা। জামাই পরগাছা, জামাই কলমের চারা, এবং ব্যবহারে বাকল। হাজার ঘাস মাজ, মিশিবার নহে।—মিশিবে না। স্থূল কথা জামাই জেতেই বিশ্বাস নাই, তারপর আবার ভাইঝি জামাই। খুড় ভাইপোয়ে প্রায়ই কাটাকাটী, মারামারী, খুনাখুনী।. পরিশেষে—শ্রাদ্ধ আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। পরিণামে উভয়ে প্রায় এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়া পরের অন্নে উদর পূরণ, কেহ অন্য কোন নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভিন্ন আর কোনই ভাল ফল দেখা যায় না। এক রক্ত, এক গোত্র, এক বংশ, তাতেই এই দশা,—পর গোত্র, পরপুত্র জামাই, তাহার সঙ্গে এক কায়া, এক প্রাণ, দুইয়ে এক হওয়া বড়ই কঠিন কথা। যাহাদের শরীর এক রক্তে গঠিত, তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ থাকা সত্ত্বেও রক্তের গুণ না থাকিয়া যায় না। পাষাণ হইলেও সময়ে নরম হয়, কালে স্নেহ ভক্তি প্রণয় এবং প্রেমভাব,—সে কলুষিত পাপময় অন্তরেও দেখা যায়, জামাই পরের সন্তান, পররক্তে গঠিত, সুতরাং মনের ভাব ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, হৃদয় ভিন্ন। সে বসে থাকিবার নয়। থাকিবে কেন সে শ্বশুরকে পিতৃতুল্য মানিবে কেন? সে খুড় শ্বশুরকে শ্বশুরের স্থানে বরণ করিবে কেন? তার কার্য্য উদ্ধারই ভক্তি, তার স্বার্থ সাধনই শ্রদ্ধা, তার অভিষ্ট সাধন করাই প্রেম। তার সকলই কৃত্রিম। মীর সাহেব আপন বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছেন। আপন মন্দ আপনি ঘটাইয়াছেন। আপন পায়ে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। রে সংসার। রে লোভ! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। রে অর্থ। রে জমিদারী। তোরা না ঘটাতে পারিস এ জগতে এমন কোন কুকার্য্যই নাই। মায়া, মমতা, স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম, সকলই স্বার্থের নিকট পরাস্ত। তোদের নিকট জিয়ন্তে বলি। মীর সাহেবের দেবীপ্রসাদ প্রধান কার্য্যকারক। সা গোলামের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। কালের ধর্ম্ম! সময় সময় তাঁহাদের উভয়ে অনেক কথা, অনেক আলাপ হইয়া থাকে। কোন কোন দিন আবশ্যক মতে নিকটস্থ আম বাগানে, কি বকুল তলায় বসিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা হয়। প্রথম সূত্রপাত,

পরে অনেক কথা, দিন দিন বহু কথা, বহু জোগাড়, গোপনে গোপনে বহু মন্ত্রণা, বহু কার্য্য সাধন হইতেছে ও হইয়াছে। এখনও অনেক বাকি, সীমা পর্য্যন্ত যাইতে বহু বিলম্ব। তাই কথা ফোটে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। মীর সাহেবেরও কানে ওঠে নাই।

রাত্র দুই প্রহর। দেবীপ্রসাদের বৈঠক খানাতেই আজ বৈঠক। দেবীপ্রসাদ ছোট একখানী জল চৌকির উপর। সা গোলাম বড় গোছের একটী মোড়ায় বসিয়া উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ঘরের এক কোণে মিট মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। সে সময় কেরোসিন তেলের চল্‌তি হয় নাই। দিশী তৈল, দিশী প্রদীপ, দীপ গাছাও মাটির।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—মীর এব্রাহিম হোসেনের "অছিয়ত নামায়" যাহা যাহা লিখা আছে তাহারত অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমার বেশ মনে আছে, দুই ভ্রাতারই জমিদারিতে সমান অংশ। সাঁওতাল বসত বাটীতেও তুল্যাংশ। কনিষ্ঠ পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কারণ অতি শৈশবকালেই মীর সাহেব মাতৃহারা হন বলিয়া পদমদীর বাড়ী তাঁহাকে বেশীর ভাগ দিয়া গিয়াছেন। সে বাড়ী এ বাড়ীর ন্যায় পাকা নহে। সামান্য একখানি ঘর, আর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। বেশীর ভাগ পুস্করিণী ও একটী আমবাগান মাত্র। মীর এব্রাহিম হোসেন, আপনার শ্বশুরকে রাজী করিয়া, কন্যাদ্বয়কে বলিয়া পদমদীর বাড়ী—বিষয়, মীর সাহেবকে অতিরিক্তরূপে দিয়া গিয়াছেন। একথা সকলেই জানে, অছিয়ত নামাতেও স্পষ্ট ভবে লিখা রহিয়াছে।

সা গোলাম বলিলেন।—একথা অসম্ভব—অসম্ভব! বাড়ী যেমনই হউক পৃথক হওয়ার কারণ কি? নির্দ্দিষ্ট করিয়া যখন লিখা, তখন কি আর কথা আছে! না—উহাতে কোন গোল উপস্থিত হইতে পারে? ঘর থাক্, পুস্করিণী থাক, প্রাচীর থাক্, বাগান থাক্, হাজার থাক্, সে বাড়ীর সকলি তাঁহার। আর এই সাঁওতার বাড়ীতে যাই থাক্, সকলি আমার শ্বশুরের। দালান কোঠা আছে বলিয়াই কি ভাগ দিতে হইবে?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—দেওয়াইত কথা—বিষয় সম্পত্তি জমিদারী সকলি এখানে, পদমদী পৈতৃক স্থান বটে, কিন্তু ধরিতে গেলে সকলই এখানে। সে কেবল নাম মাত্র বাড়ী। আমি বেশ জানি, যাহার ভাগে যে গ্রাম পড়িয়াছে বৃদ্ধ মীর সাহেব যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি অছিয়ত নামায় নির্দ্দিষ্ট রূপে লিখিয়া দিয়াছেন। কেবল এই বাড়ী, আর এ বাড়ীর মোতালকের অস্থাবর সম্পত্তি এ জমালিতে রাখিয়া গিয়াছেন। অছিয়তনামা এবং অন্যান্য দলিল মীর সাহেব নিকট আছে, তাহা দেখিলেই আপনার মনের ধান্দা ছুটিয়া যাইবে।

সা গোলাম বলিলেন। অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ যে বাক্সে আছে সে বাক্সে অছিয়তনামা নাই। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। আপনি যে স্থানে থাকার কথা বলিয়াছিলেন, সেখানেও নাই—আমি সন্ধান করিয়াছি। যেখানে আছে, তাহা জানিতেও পারিয়াছি। আমাদের সংসারে তাঁহার পক্ষে এখন একটী প্রাণীও নাই। মনে মনে সকলেই ফাঁক। দুহাত ফাঁক। ফাঁক পেলে কেহই ছাড়িবে না। দু একটী দাসী মাত্র তাঁহার স্বপক্ষে আছে। কিন্তু তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। আমাদেরই সকল, আমরাই কর্ত্তা, আমরাই মালিক।

আমি ইচ্ছা করিলে এই রাত্রেই একেবারে নিস্কণ্টক হইতে পারি। নির্ব্বিবাদে স্বীয় সম্পত্তি লইয়া সুখে থাকিতে পারি, কিন্তু—

দেবীপ্রসাদ বলিলেন। সে কি কথা! ওসকল কথা কখনই মনে স্থান দিবেন না। মুখেও আনিবেন না। লোকের কুপরামর্শে কখনই ভুলিবেন না। কোনরূপ অমানুষিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না। যাহা সহজে হইবে তাহার জন্য এত ব্যস্ত কি? নখের আঁচড়ে ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহার জন্য কামান পাতিবার দরকার কি?

সা গোলাম হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ও কিছু নয়, ও কথাটা আমি তামসা করে বলছি। বিবেচনা করুন অছিয়তনামা যদি কোন কৌশলে হস্তগত করিতে পারি—তাহাতে যাহা লিখা আছে, তাহার কি আর অন্যথা হইতে পারে না।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—তাই বা কি করিয়া হইবে। এখন অন্যথা করিতে পারে এমন সাধ্য কার?

সা গোলাম বলিলেন।—কেন সেত কোম্পানির ঘরে জানিতে হয় নাই, কোন হাকিমের নিকটও আজ পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া কোনরূপ সহি করান হয় নাই। ঘরাও দলিল, ঘরাও লিখাপড়া। তাতে আছে কি? আপনারইত পিতার হাতের লেখা। আপনার হাতের লেখা হইলে ক্ষতি কি? যে সকল সাক্ষী আছে, তাহাদের দ্বারা সাক্ষী শ্রেণীতে নাম লেখাইতে কতক্ষণের কাজ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—মীর এব্রাহিম হোসেনের দস্তখতের কি হইবে?

সা গোলাম বলিলেন।—সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সে ভার আমার প্রতি।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—"ভার আপনার প্রতিই থাক্, গড়িয়া উঠিতে পারিলে হয়। ইহার জন্য সময় চাই,—গোপন চাই, ছদ্মবেশী হওয়া চাই, কপটতা শিক্ষা করা চাই,—বিশেষ পরিশ্রম এবং উদ্যোগী হওয়া চাই।"

"সে আপনাকে বলিতে হইবে না, বহুকাল হইতে শিক্ষা আছে। আমি না পারি জগতে এমন কোন কার্য্য নাই। সংসার চালাইতে আমি ভাল জানি—সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিতে আমার বেশী সময় আবশ্যক করে না। ধর্ম্মভয় আমার অতি কম।"

"ভালইত, ভয় যত কম থাকে ততই ভাল। কিন্তু ধর্ম্মভয় একটু থাকিলে যেন ভাল হয়। যাহাই বলুন আর যাহাই করুন, কিন্তু অছিয়তনামা আগে হস্তগত করিতে না পারিলে আর কোন আশা নাই। আপনি বলেন সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। অছিয়তনামার বিষয় মীর সাহেব ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। জানিবার সম্ভাবনাও নাই।"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সন্ধান করিতে আমি কম করি নাই। শীঘ্রই সফল হইব—কোন চিন্তা করিবেন না।"

দেবীপ্রসাদের বাটীর পূর্ব্বদিকে বড় রাস্তা। গ্রামের ভিন্ন গ্রামের ও অন্য স্থানের লোকজন ঐ পথে চলাচল করে—"চৌকিদার" "চৌকিদার" বলিয়া একটী লোক ডাক ছাড়িয়া উঠিল।

সে সময় চৌকিদার চাকুরী বড়ই জঘন্য ছিল। নাম মাত্র চৌকিদার। চৌকিদারকে পেটের

অন্ন জোটাইতে সারাদিন পরের দ্বারে মজুরী করিতে হইত। নিতান্ত হীনাবস্থার লোক না হইলে চৌকিদারী কার্য্য কেহ স্বীকার করিতে না। বৎসরান্তে কেহ এক কাঠা ধান, কেহ এক জোড়া নারিকেল, দুই এক মুটো পাট, দু এক সের কলাই চৌকিদারের বেতন স্বরূপ দিত। বড় বড় ঘরে বার্ষিক বরাদ্দ চারি আনা, বড় বেশী হইলেও আট আনার উর্দ্ধ ছিল না। ছেলেমেয়ের বিবাহে লোকে কিছু পয়সা, দু একখানা কাপড় চৌকিদারকে দিত মাত্র। মাসিক বরাদ্দে প্রায় কেহই বেতন দিত না। চৌকিদারও বেতন বলিয়া কোন দাবী করিত না। চৌকি পাহারাও সেই প্রকার—যেমন দান তেমন দক্ষিণা—যেমন বেতন তেমন কাজ। কিন্তু থানার দারোগা জামাদার বরকন্দাজের হাত হইতে বাঁচাও ছিল না। প্রতি কথায় মার, প্রতি কথায় গালাগালি, এই সকল ব্যবহারে, নীচ শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভাল লোকে এখনও চৌকিদারী করে না। সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া চৌকিদার বিভোর ঘুমাইয়াছে।

"চৌকিদার"—"চৌকিদার"—অনেকক্ষণ ডাকাডাকি হাঁকা হাঁকিতে চৌকিদার হাজির হইল না।

এত রাত্রে চৌকিদারের ডাক কেন? কে ডাকে? দেবীপ্রসাদ দুই এক পায়ে দেউড়ি পর্য্যন্ত আসিলেন। রাস্তার নিকট আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুক পাবনার বরকন্দাজ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠীতে যাইবেন। পথে পথে মশাল, মশালচির যোগাড় করিয়া, শালঘর মধুয়া যাওয়াই বরকন্দাজের এখন কর্ত্তব্য কার্য্য।

দেবীপ্রসাদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আসিলেন। সা গোলামকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া বরকন্দাজ ও তাহার সঙ্গি লোকজনসহ মনিব বাড়ীতে আসিলেন। সদর দেউড়িতে তাহাদিগকে বসিবার স্থান দিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠীতে গমন সংবাদ মীর সাহেব নিকট বলিতে অগ্রসর হইলেন। বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিলেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। কারণ সে সময় মজলিস জমিয়া গিয়াছে। মীর সাহেব স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন, গোপাল ঢোলক বাজাইতেছে। দেশীয় নর্ত্তকীদ্বয় নৃত্য করিতেছে। মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেবীপ্রসাদের পা উঠিল না। ডাকিলেই বা শুনে কে! বাজে লোক পাঠাইয়া খবর দিতেও সাহস হইল না। আমোদে বাধা দেয় কার সাধ্য?

দেবীপ্রসাদ বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সা গোলাম দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে বাটীতে আসিয়া, বৈঠকখানা ঘরের দিকে যাইলেন না। মীর সাহেবের বিশ্বাসী খানসামা বিনোদের সহিত গোপনে গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এ দিকে আমোদের ঢেউ খেলিতেছে। হাসীর গব্‌রা গানের তান, বাজনার বোলে হুলুস্থুল ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেতারের তার ছিঁড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই যেন নর্ত্তকীর পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িল। লয় বিহনে, বে-লয়ে, তাল কাটিয়া বাজনা বন্ধ হইল। বসিরুদ্দিন মোসাহেব ও গায়ক—তিনিও বাঁচিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গলাবাজী করিয়াছেন বাহিরে আসিবার

নিতান্তই দরকার হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই, হঠাৎ দেবীপ্রসাদকে দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। দেবীপ্রসাদ বসিরুদ্দিনের হস্ত ধরিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া চুপি চুপি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শালঘর মধুয়ার কুঠীতে গমন বিষয় বলিয়া দিলেন। বসিরুদ্দিন উঠিতে পড়িতে মীর সাহেবের নিকট যাইয়া চুপি চুপি সকল কথা শুনাইলেন। মীর সাহেব আমোদে ভঙ্গ দিয়া তখনি বাহিরে আসিলেন। মশাল, তৈল, মশালচির সংগ্রহ করিয়া দিতে দেবীপ্রসাদকে আদেশ করিলেন। এবং তখনি জানমামুদ, কদম, ফটিক, চাকরাণ জমিভোগী বেহারাদিগের বাটিতে লোক ছুটিল। কারণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই মীর সাহেব, কুঠীতে যাইয়া মিসেস কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিৎ মনে করিলেন।

বসিরুদ্দিন দেবীপ্রসাদকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কারণ আমোদে আহ্লাদে মনোমত কার্য্যে, বাধা দিতে দেবীপ্রসাদের হস্তই অগ্রে প্রসারিত হইত। বসিরুদ্দিন মীর সাহেবের প্রধান মোসাহেব। নাচিতেন গান করিতেন, পাশা খেলিতেন। সং সাজিয়া রঙ্গ মাখাইয়া—ঢং দেখাইতেও—লজ্জা বোধ করিতেন না। এবং ইচ্ছা করিয়া নর্ত্তকীদিগের মুখের মিষ্টি মিষ্টি বোল শুনিয়া সৌভাগ্য মনে করিতেন। তিনি যে, একজন মহা রসিক একথা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আর ছিল যে, কমল পদের কোমল আঘাতে শরীর পবিত্র না করিলে রসিকের পরীক্ষা হয় না, রসিক নামও জাঁকিয়া উঠে না। যেমন আগুনে না পুড়িলে সোণার আদর বাড়ে না, তেমনি কামিনী কোমল পদের আঘাত সহ্য না করিলেও রসিক নামের সার্থকতা হয় না।—বোধ হয় এই অপকথাটা বসিরুদ্দিনের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগিত। তাই তিনি ঐ সকল কোমল পদের আঘাত সহ্য করিতেন,—শরীর পবিত্র করিতেন। পূর্ব্ব পুরুষের নামেও কিছু শুনিতেন।

আরও একটী আশা ছিল। মীর সাহেবের অনুগ্রহ—আর সুদৃষ্টি,—বিষয়াদির কার্য্যেও মীর সাহেব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাও তাঁহার অন্তরে অন্য একটী আশা। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শেষ আশাটী কখন পূর্ণ হয় নাই। বিষয়াদিকার্য্যে দেবীপ্রসাদেয় কথাই বলবৎ থাকিত। এই দুঃখে বসিরুদ্দিন সর্ব্বদাই চিন্তিত ও দুঃখিত থাকিতেন। সময় সময় সে দুঃখের কাহিনী মীর সাহেবের নিকট স্পষ্টভাবে বলিতেও ত্রুটি করিতেন না। মীর সাহেব কিন্তু সে কথায় কান দিতেন না। যাক্ সে কথা। এখনকার কথা—এই যে, এত আমোদ মুহূর্ত্ত মধ্যেই বন্ধ হইল। এক দেবীপ্রসাদ আসিয়া নাচ, গান, বাজনা, মাটি করিয়া দিল। এই কথাটা বসিরুদ্দিনের শিরায় শিরায় বসিয়া গেল।

মীর সাহেবের গমনের আয়োজন। পাল্কী বেহারা সমুদায় প্রস্তুত—হাসি, তামাসা, রসিকতা রগড়ের কথা আর কাহারও মুখে নাই। সেতারের তার ছিঁড়িয়াই রহিল। নর্ত্তকীর পায়ের নূপুর ফরাসের উপরে যে স্থানে খসিয়া পড়িয়া ছিল, সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। বসিরুদ্দিন বারান্দায় আসিয়া মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "এখন না যাইয়া প্রাতে গেলেও হইতে পারিত।" মীর সাহেব সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি প্রস্তুত হইয়া

পাল্‌কীতে উঠিলেন। বৈঠকখানা ঘরের দ্বার বন্ধ হইল।

সা গোলাম বিনোদ খানসামার সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিয়া তাঁহার বসিবার কুঠরীতে বসিয়া আছেন। চঞ্চল ভাব। রাত্রি প্রায় একটা—কি চিন্তা করিতে করিতে একবার বাটীর মধ্যে তাঁহার শয়ন কুঠরীতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। আবার বাটীর মধ্যে গিয়া সমুদয় স্থান অতি সাবধানে বেড়াইয়া দেখিয়া আসিলেন। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ পাইলেন না। আজিই সময়, আজিই অবসর, এই উপযুক্ত সময়। মনে মনে স্থির করিয়া এক পায়ে দুপায়ে মীর সাহেবের তোষাখানার দিকে চলিলেন। তাঁহার এরূপ চলা ফেরা নূতন নহে। আরও কয়েকদিন নিশীথ সময়ে মীর সাহেবের তোষাখানার দিকে পা ধরিয়াছেন। চুপে চুপে বাড়ীর অনেক ঘর খুঁজিয়াছেন।

মাঙ্গন ও বিনোদ দুইজনেই তোষাখানার জমাদার। মাঙ্গন মীর সাহেবের বিশ্বাসী এবং প্রধান চাকর। বিনোদ মাঙ্গনের সাহায্যকারী। দুলা মিয়া (জামাই বাবু) অর্থাৎ সা গোলাম পূর্ব্ব হইতেই ঐ তোষাখানার কোথায় কি আছে বিনোদের সাহায্যে সকলি জানিয়া ছিলেন। কোন্ দ্বার খোলা থাকে, কোন্ জানালা বন্ধ, কোন্ দিকে বাক্‌স, কোন্ পার্শ্বে আল্‌মারী সিন্ধুক সকলি তাঁহার জানা ছিল। জামাই বাবু সংসারের সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মীর সাহেবের আদেশ ও অনুগ্রহেই তাঁহার ঐ অধিকার।

মাঙ্গন, মীর সাহেবের বিশ্বাসী তাহা জামাই বাবু বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন। মাঙ্গনও বিশ্বাসের গৌরব দেখাইতে অনেক গুপ্তকথা যাহা কেহ জানিত না, তাহার কিছু কিছু জামাই বাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া বিশেষ বিশ্বাসী হইয়াছে। সা গোলামের বিশ্বাস, মাঙ্গন যাহা বলে সে সমুদয়ই সত্য। মাঙ্গন গাঁজাখোর—কিন্তু সরল।

সা গোলাম বিনোদের সাহায্যে তোষাখানার দরজা খোলা পাইলেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চোরের প্রপিতামহের ন্যায় অতি সাবধানে পা ফেলিয়া তোষাখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিনোদের অনুগ্রহে তোষাখানা অন্ধকার। বাতিটী ইচ্ছা করিয়াই নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘোর অন্ধকার কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই! কেবল অনুমান আর হাতের আন্দাজ এই দুইটীর উপর নির্ভর করিয়াই জামাই বাবু অন্ধকার ঘর মধ্যে আপন অভিষ্ট সাধন জন্য হামাগুড়ি দিয়া যাইতে লাগিলেন। মাঙ্গন কিছুই জানে না। বিনোদকেও আসল কথা বলেন নাই। কেবল মাত্র এই বলিয়াছিলেন যে, নিশীথ সময়ে কোন গুপ্তস্থানে আমোদ আহ্লাদ করিতে যাইব, তুমি তোষাখানার দ্বার খুলিয়া রাখিও। আমি তোমাকে খুব গোপনে জাগাইয়া লইয়া যাইব।

বিনোদ জানিলেও মা'র নাই,—পূর্ব্ব মন্ত্রণাই তখন আশ্রয়। মাঙ্গন জাগিলেও শীঘ্র উঠিবে না। কারণ সে নেশায় ভোর। সা গোলাম গড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। যে জিনিসের জন্য তাঁহার এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা—মহা পাপকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সে জিনিসটী হস্তগত হইল। অছিয়তনামা যে বাক্‌সে আছে সন্ধানে জানিয়াছিলেন সে বাক্‌সটী হস্তগত হইল। বিশেষ সাবধানে হাতবাক্‌সটী বগলে চাপিলেন।

মাঙ্গন টের পাইল যে, কে যেন ঘরের মধ্যে আসিয়া কি লইয়া গেল। নেশার ঝোঁকে উঠিতে ইচ্ছা হইল না! চক্ষু বুজিয়াই দুর দুর করিয়া আবার নিরব হইল। পূর্ব্ববৎ নিশ্বাস চলিতে লাগিল।

জামাই বাবু হাতবাক্সটী লইয়া তখনই নিজের বড় বাক্সে বন্ধ করিলেন। পাখীরা প্রভাতি গাইয়া উঠিল। শুকতারা মলিনভাবে নিজ গম্য পথে মিটি মিটি চাহিয়া যাইতে লাগিল, জামাই বাবু শয্যায় শুইয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল।

অষ্টম তরঙ্গ

তদারক

পাবনা রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। সময়ে সময়ে রাজশাহীর জজ দাওরার মোকদ্দমার বিচার করিতে পাবনায় আসিয়া থাকেন। কালেক্‌টরী মুন্সেফী সকলি আছে, সুতরাং জেলা বলিয়াই অভিহিত। পাবনা হইতে শালঘর মধুয়ায় আসিতে হইলে পদ্মা পার হইয়া আসিতে হয়।

পদ্মা পাড়ী দিয়া দক্ষিণ পারে আসিলেই কুষ্টিয়ার থানা। পাঠক! বর্তমান কুষ্টিয়া যে স্থানে স্থাপিত সে স্থানের যথার্থ নাম কুষ্টিয়া নহে। পুরাতন রেলওয়ে ষ্টেসনের উত্তর দিকে কুষ্টিয়া গ্রাম আজি পর্য্যন্ত বর্তমান আছে। এইক্ষণ তাহার নাম পুরাতন কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়ার থানা—পুরাতন কুষ্টিয়া হইতে উঠিয়া গৌরী নদীর দক্ষিণ পার আসিলে, সে থানার নামও কুষ্টিয়া এবং সেই নামেই মহকুমা ইত্যাদিও রেলওয়ে ষ্টেসনের নাম হইয়াছে। এইক্ষণে যে স্থানে কুষ্টিয়ার থানা বর্তমান, সে স্থানের নাম "মজমপুর"। এই প্রকারে বাহাদুর খালী, এক পাড়া গ্রাম লইয়া কুষ্টিয়া। যে সময়ের ঘটনা, সে সময় কুষ্টিয়ার মহকুমা হয় নাই, রেলওয়ে ষ্টেসন হয় নাই। বর্তমান থানারও সৃষ্টি হয় নাই। সেই পুরাতন কুষ্টিয়াতেই থানা—সে থানাতেও শালঘর মধুয়ার লুটের এজাহার পড়িয়াছে। অন্য লোকে এজাহার দিলে, দারগা সাহেব সে লোকটীকে যাহা করিয়া বিদায় দিতে হয় করিতেন! কুঠীর এজাহার না লইয়া উপায় নাই।—মেম সাহেবের প্রেরিত লোকের এজাহার। বিশেষ দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত টি, আই, কেনীর কুঠী লুট। এ এজাহার না লইলে কি রক্ষা আছে? লাভের প্রত্যাশা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া এজাহার লইতে হইয়াছে।

থানাদার কেবল নিজ নাম সহী করিতে জানেন। তাইদনবীস বাবুকে সঙ্গে লইয়া ৫ জন বরকন্দাজ সহ মাজেরার স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু মেম সাহেবের আদেশ হয় নাই বলিয়া তদারকে প্রবৃত্ত হন নাই। রীতিমত খোরাকি পাইতেছেন। থাকিবার স্থানও ভালই জুটিয়াছে। আহারাদি করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছেন মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তদন্তে আসিবেন।

সূর্য্যোদয়ের সহিত স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর, সদর দারগা (পাবনার) ও সদরের বরকন্দাজগণকে সঙ্গে করিয়া শালঘর মধুয়ায় দেখা দিলেন। প্রথমে মিসেস কেনীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া মোকদ্দমা তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও একবার কুঠীতে আসিয়া মিসেস কেনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। সময় সময় চিঠী পত্র পাইতেন এবং লিখিতেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা কুঠী আক্রমণ করিয়াছে, অনেক সাক্ষী জবানবন্দী দিলেন। সাহেব পক্ষের দুইজন লোককে যে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিয়াছে, তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাইলেন। জখমীদ্বয়কে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে বাঁশের চাঙ্গিতে শোয়াইয়া আনা হইল। সড়কীর আঘাতে একজনের বক্ষ ভেদ, লাঠির আঘাতে অপরের মাথা ফাটা, তখনও নাক মুখ ভাসিয়া রক্ত পড়িতেছে। কথা কহিবার শক্তি নাই।—বোধ হয় বাঁচিবে না। বাঁচিবার ভরসা একেবারে নাই বলিলেও হয়।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, কুঠীর লোক হইতে অধিক বিশ্বাস্য প্রমাণ এই দুইজন লোক। কুঠীর সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। সাঁওতার জমিদারের লোক। আপন জমিদারের পত্র লইয়া সাহেবের নিকট আসিয়াছিল। সাহেব কুঠীতে না থাকায় পত্রের উত্তর পায় নাই। বাধ্য হইয়া ইহারা অফিস ঘরের বারান্দায় রাত্রে শুইয়াছিল। প্রাতের ঘটনা সমুদয় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। প্যারীসুন্দরীর লোক যে যে প্রকার এই দুই ব্যক্তিকে সাংঘাতিক রূপে জখম করিয়াছে, তাহাও ইহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ, ইহারাই মূল সাক্ষী।

উভয় জখমীকে পাবনার ডাক্তারখানায় ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবার আদেশ করিয়া সাহেব খানার কামরায় চলিয়া গেলেন। মোকদ্দমা তদন্ত শেষ হইল। আফিস ঘরে কুঠীর প্রধান নায়েব হরনাথ মিশ্রী এবং অন্যান্য আমলাগণ বসিয়া মোকদ্দমার প্রমাণ, সাক্ষীর জবানবন্দী বিষয় আলোচনা করিতেছেন। পাবনার মোক্তার চাঁদ অধিকারীর নিকট পত্র লিখিতেছেন। সাহেব কুঠীতে নাই, আফিস ঘরেই তামাক চলিতেছে। কত ভদ্রলোক নায়েব মহাশয়ের মুখের একটি কথার জন্য লালাইত হইয়া বসিয়া আছেন। কেহ কাগজে মোড়ক করিয়া কিছু কিছু প্রণামী বাম পার্শ্বে রাখিয়া দিতেছে—নায়েব মহাশয় বেরেঁয়া। কথায়, কার্য্যে, হাসি, তামাসায় সকল দিকেই আছেন। প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গেও হাসি তামাশা চলিতেছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আরদালী সঙ্গীয় বেহারা এবং লোকজনের আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে একটি স্ত্রীলোক "আমার বাবা কোথায়, ওরে আমার বাবা কৈ" উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কাহারও বাধা না মানিয়া আফিস ঘরের নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিতে লাগিল "আমার বাবা সন্ধ্যার সময় বাড়ী হইতে আহার করিয়া আসিয়াছে। নায়েব মহাশয়! আমার বাবা কৈ? এই একমাস হয় নাই, তিন কুড়ি টাকা খরচ করিয়া বাবার বিবাহ দিয়াছি। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে আল্লা!! ও খোদায় !!! একি করিলে!!! ওরে এমন ডাকাত কখনই দেখি নাই।

দিনে দুপুরে ডাকাতি। সাহেবের চাকর হইয়া সুখে থাকিবে, গায়ে কাঁটার আঁচড়টী লাগিবে না, তাহার ফল বুঝি এই হইল? আপনারা আমার ছেলেকে কি করিলেন? আমার ছেলে কৈ নায়েব মহাশয়? আপনার দুখানি পায় ধরিয়া বলিতেছি আমার কালু কোথায়? দোহাই তোমাদের পিতা মাতার, আমার কালুকে একবার দেখাও!"

হরনাথ মিশ্র মানুষ কিন্তু গঠিত পাষাণে। কুঠীয়াল নর ব্যাঘ্র; তার চাকরের মনে মায়া মমতা থাকা সম্ভবতই অসম্ভব। কিন্তু সে সময় সে কঠিন প্রাণও গলিয়া গেল। কালুর মাতার ক্রন্দনে সে নিরস, নির্দ্দয় হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল। মায়াবসে সে বিকট চক্ষেও জল ঝরিল। জিহ্বায় জড়তা আসিল। মুখে কথাটী নাই! যার মুখে সর্ব্বদা কথা, মেজাজ গরম, নজর গরম—কালুর মাতার কথা কয়েকটিতে একেবারে বিপরীত ভাব ধারণ করিল। কি বলিবেন কি করিবেন, কি বলিয়া তাহার কথার উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পর বহু কষ্টে বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর, কুঠীতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন। গোল কর না। তোমার কালু ভালই আছে। কোন চিন্তা নাই। তার কিছু হয় নাই। কে বলেছে? মিছে কথা,—ও সকলি মিছে কথা।"

কালুর মা হরনাথের পদতলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে বাবা! আমার ঐ একটী ছেলে। বড় দুঃখে ওকে বড় করেছি। ভিক্ষা করে,—নিজে পেটে না খেয়ে বাবাকে খাওয়াইয়ে মানুষ করিছি। ওর বয়স যখন সাড়ে চার বছর সেই সময় ওর বাপ মারা গেছে। আরে আল্লা! সে কথা না আমার মনে গাঁথা আছে। হায়! হায়! এখনও কল্‌জে ফেটে যায়, এই সাহেবই তার হাত, পা, টানা দিয়ে গাছে বেঁধে মার দিয়েছিলেন। তাতেই সারা। যে বিছানায় পলো, আর উঠে বস্‌লো না। আর ধানের ভাত মুখে গেল না। পেট দিয়ে থানা থানা রক্ত পড়ে মাস খানেক ভুগে ভুগে যেখানকার লোক সেইখানে চলে গেল। দুট মুখের কথা কয়ে দেলসা দেয়, এমন লোক দুনিয়ায় আমার কেউ ছিল না। এখনও নাই। খেয়ে না খেয়ে কালুকে মানুষ করেছিলাম। বাবা আমার! কাল রেতে ভাত খেয়ে সাহেবের কামরায় পাখা টান্‌তে এসেছিল, রোজ রোজ বেলা উঠলে বাড়ী যায়, আজ দুদিনের মধ্যে তার খোজ খবর নাই। লোকে যা বল্‌ছে তা মুখে আন্‌তে পারি না। তোমরা আমাকেও খুন কর।"

হরনাথের তখন মেজাজ একটু গরম হইল। বলিলেন, "চুপ কর্ চুপ কর্। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা যে কালুকে জখমী করেছে তাকি তুই শুনিস নাই? মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাকে পাবনার ডাক্তারখানায় আরাম হবার জন্য পাটিয়ে দিয়েছেন। আরাম হলেই ফিরে আসবে। যে কদিন কালু বাটীতে না আসতে পারে, সে কদিন তোমার খাবার কোনই কষ্ট হবে না। এই চারিটী টাকা দিচ্ছি পেট চালাওগে। ফুরাইলে আবার আসিও।"

কালুর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "নায়েব মহাশয়! আমি তোমার টাকা চাহি না। আমি আমার বাবাকে পাবনায় দেখিতে চল্লেম।" এই বলিয়া কালুর মাতা টাকা ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে অফিস ঘর হইতে বাহির হইল।

নায়েব মহাশয় চৈত সিং আর দুই তিনজন লোককে তখনি আদেশ করিলেন যে, হারামজাদীকে ধরিয়া উহার বাটীতে লইয়া যাও। কিছুতেই বাটী ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে যাইতে না পারে। খুব সাবধানে রাখবে। খুব সাবধান! শীঘ্র যাও।

হুকুম পাওয়া মাত্র যমদূতেরা পুত্রহারা মায়ের প্রাণে নূতন রকমের যন্ত্রণা দিতে লাঠী ঘাড়ে করিয়া তখনি ছুটিল।

বাঁসীর কাঁদিবার কেহ ছিল না। ষোড়সী মাত্র। সে আপন কুঁড়ে ঘরে একা বসে কি ভাবিতেছে, ঈশ্বর জানেন! ভিন্ন গ্রামের মেয়ে, ঘর হইতে বাহির হওয়া তাহার সাজে না। সে আর কুঠীতে গেল না। বাঁসী সাহেবের শয়ন ঘরের পাহারাদার ছিল। কালু ও বাঁসীর ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা পাঠক বুঝিতেই পারিয়াছেন। হায় রে সংসার! হায়রে শত্রুতা। শত্রুতা সাধনে লোকে না পারে এমন কোন কার্য্যই নাই। ধন্য সংসার!!

নবম তরঙ্গ
কালু ও বাঁসী

মোকাদ্দমা সাজাইবার জন্য একজন পাহারাওয়ালা এবং পাংখাবরদারকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা হইয়াছে। কালু সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়াছিল, কুড়ন সর্দ্দার হরনাথের হুকুম কালুর পিছন হইতে বিনা অপরাধে দুঃখিনীর সন্তানকে সড়কী মারিয়া বুক পার করিয়া দিয়াছে। বাঁসী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গুদাম ঘরে গিয়া ঘুমাইয়াছিল। শয়ন অবস্থাতেই ঐ পাষণ্ড কুড়ন, হরনাথের আজ্ঞায় বাঁসীর মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। গুদাম ঘরের মধ্যে হঠাৎ আর্তনাদ এবং চিৎকারের কারণও তাহাই।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীদিগের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করিয়া দুই থানার দারগা মোতাইন করিলেন। কোন্ সময় কুঠী ছাড়িয়া পাবনাভিমুখী হইলেন, তাহা কথকের মনে নাই। তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাবনায় চলিয়া গেলে মীর সাহেব মেম সাহেবের সহিত দেখা করিয়া বাটীতে আসিয়াছিলেন, ইহা বেশ মনে আছে।

এদিকে টি, আই, কেনী যশোহর হইতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কুঠীতে আসিয়া সমুদয় বিবরণ শুনিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা যে, প্যারীসুন্দরীর বাটী লুট করেন। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত দিলেন। সাহসও হইল না। কারণ বেপাল্লা। সুন্দরপুরের নিকটে সাহেবের জমিদারী নাই। লোকজন সংগ্রহ করিয়া রাখারও কোন সুযোগ স্থান নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া মোকদ্দমার যোগাড়ই ভালরূপ করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রমাণ ইত্যাদি ও আর তদ্বীর যাহা বাকি ছিল, তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও আদেশ করিলেন যে,—“প্যারীসুন্দরীর চাকর কি প্রজা যাহাকে যে, যে স্থানে পাও, ধরিয়া আমার নিকট হাজির করিলেই উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।”

দেশময় লুটের কথা—খুনের কথা—সত্য কথা—নানা কথা—নানা লোক নানা প্রকার, প্রকাশ্যে গোপনে, বলাবলি করিতে লাগিল। চারিদিকে হুলুস্থূল ব্যাপার—তুমুল কাণ্ড!

দশম তরঙ্গ

আক্ষেপ

রামলোচনের মুখে কথা নাই। লজ্জা রাখিবারও আর স্থান নাই। নিজে দলপতী হইয়া অপ্রস্তুত—শুধু অপ্রস্তুতের একশেষ। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বিনাশ—অযথা অর্থের শ্রাদ্ধ এবং শত মুখে নিন্দা! প্যারীসুন্দরীর নিকটে রামলোচন সকল কথা খুলিয়া বলেন নাই। সত্য মিথ্যা একত্রে, ভেল আসলে "আমেজ" করিয়া যুদ্ধের কথা শেষ করিয়াছেন।—"সন্ধানী লোকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিল। মেম সাহেব কি সাহেব কেহই কুঠিতে ছিলেন না। অনর্থক যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সাহেব মোকাদ্দমা সাজাইতে ত্রুটী করেন নাই। কুঠির উপর পর্য্যন্ত যখন চড়াও করা হইয়াছে তখন সাহেব অল্পে ছাড়িবেন না। কোনরূপ মিথ্যা ফাঁদে ভাল করিয়া আটকাইবার চেষ্টা করিবেন। কথা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে, সকলেই শুনিয়াছে, প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা সাহেবের কুঠী লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। ১০-১২টি লোক জখমী, তিনটী খুন!!

প্যারীসুন্দরী এই ঘটনা শুনিয়া একটুকুও ভীত হইলেন না। ক্ষণকালের জন্যও ভাবিলেন না। রামলোচনকে স্পষ্ট ভাবে বলিলেন, "বেশ হইয়াছে। আমার লাঠীয়াল কুঠী লুট করিয়াছে, দশজনের মুখে একথা শুনিয়াও আমার সুখ বোধ হইতেছে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেবের কুঠী লুটিয়া আনিয়াছি, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে! সাহেবের পক্ষে ১০/১২টী জখম, তিনটী খুন! চিন্তা কি, মোকদ্দমার পথে চলিলে প্যারীসুন্দরী কখনই হটিবে না। সদর নেজামত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইবে। এতদিনে জানিলাম—কেনীর ক্ষমতা বল্ সকলি বুঝিলাম।—আমি যাহা ভাবিয়া ছিলাম তাহা নহে। তোমরা ক্ষণকাল জন্যও অন্তরে ভয়কে স্থান দিও না। একবার—দুবার—না হয় তিনবার—চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? আবার চেষ্টা। এখন তোমাদের কার্য্য মোকদ্দমার জোগাড়। অন্যদিকে আবার লাঠীয়াল সংগ্রহ। দেখি কয়বার ফাঁক যায়। একদিন হাতে পাইবই পাইব। আরও একটী কথা আমি তোমাকে বলি, যে ব্যক্তি যে কোন কৌশলে কেনীর মাথা আমার নিকট আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া আমি তাহার জন্য বাঁধিয়া রাখিলাম। এই আমার প্রতিজ্ঞা, আমার জমিদারী, বাড়ী, ঘর, নগদ টাকা, আসবাব যাহা আছে, সমুদায় কেনীর কল্যাণে রাখিলাম। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, সুন্দরপুরের সমুদয় সম্পতি কেনীর জন্য রহিল। অত্যাচারের কথা কহিয়া মুষ্টিভিক্ষায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। দ্বারে দ্বারে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া বেড়াইব। যে ঈশ্বর জগতের মুখ দেখাইবার পূর্ব্বেই আহারের

সংস্থান করিয়া মায়ের বুকে রাখিয়া দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের নাম করিয়া প্যারীসুন্দরী যাহার দ্বারে দাঁড়াইবে, সেইখানেই সমাদরে স্থান পাইবে। দুরন্ত নীলকরের হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিতে জীবন যায় সেও আমার পণ। আমি আমার জীবনের জন্য একটুকুও ভাবি না। দেশের দুর্দ্দশা, নিরীহ প্রজার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। মোকদ্দমার জন্য তোমরা ভাবিও না। যত প্রকারের তদবির হইতে পারে তাহা কর।"

রামলোচন বলিলেন।—আমার বোধ হইতেছে শীঘ্রই থানাদার দারগা, জমাদার, আসামী ধরিবার জন্য মফস্বলে গ্রামে গ্রামে আসিবে।

প্যারীসুন্দরী বলিলেন—তাহাতে ভয় কি? যত টাকা লাগে দারোগাকে দেও, আর এই বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়াইয়া দেও যে, আসামীর নামের কোন লোক আমার বাটীতে নাই, আমার সরকারে নাই। সুন্দরপুর গ্রামে নাই। আমার এলাকার মধ্যে নাই। আমরা কখন সে নামের কথা শুনি নাই। সাহসে কম হইবে না। রামানন্দ বাবুর উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য, জমিদারী সকলি আজ কেনীর জন্য তাঁহারই কন্যা প্যারীসুন্দরী রাখিয়া দিল। আর তাঁহারাও পৈতৃক জমিদারী নহে। ইহাও ইংরেজের অনুগ্রহেই হইয়াছিল। তাহারাও ইংরেজ, কেনীও ইংরেজ, একপ্রাণী বটে,—তবে,—মানুষ আর শূকর। এক ঝাঁড়ের বাঁশ—কেহ হাড়ীর ঝাঁটা, কেহ পূজার ফুলের সাজী। কত ইংরেজ কত কার্য্যে এদেশে আসিতেছেন, কৈ কেনীর মত নররাক্ষসত একটীও দেখি না। অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কুমারখালীর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেসমের কুঠীর কল্যাণেই পিতার এত ঐশ্বর্য্য, এত জমিদারী। ইংরেজ বাহাদুরের শুভদৃষ্টিতেই সুন্দরপুরের ঘরের সৃষ্টি। বোধ হয় কেনীর কল্যাণে সকলি মাটি হইবে। একেবারে সারা হইবে!! তোমরা আমার আদেশ মত কেহই কার্য্য করিতে পার না, ইহাই আমার মনের দুঃখ। একজন—দৌরাত্ম্যকারী ইংরেজকে জব্দ করিতে পারিলে না, ভালরূপ শিক্ষা দিতে পারিলে না! ছি! ছি! বড় লজ্জার কথা! বড় ঘৃণার কথা! দেখত এদেশে আমরাই সকল, আমাদেরই দেশ, আমাদেরই লোকজন লইয়া একা কেনী আমাদের উপর এত অত্যাচার, এত দৌরাত্ম্য, এত জুলুম করিতেছে। তোমরা শত সহস্র লোক একত্র হইয়াও দুইবারে কিছুই করিতে পারিলে না। নিশ্চয় জানিলাম তোমাদের মাথায় কিছু নাই। কিছুই নাই,—খালি হাড় আর পচা মজ্জা। কি করি মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। আমি স্ত্রীলোক—! কেনীর দৌরাত্ম্যে না টিকিতে পারিয়া এদেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিয়াছে, সত্য সত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? মনেও করো না—সে কথা কখনই মনে করো না। সে যোগ দায়ে পড়িয়া, সে প্রণয় না পারিয়া, সে ভালবাসা, সে আনুগত্য—অপমানের ভয় প্রাণের ভয়, স্ত্রী পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয়, ভাবিয়া। যাহা মনে জাগে, তাহা তাদের মনেও জাগে। তাহারা কি কেনীর কুটুম্ব না আত্মীয় না দেশের লোক? তাহাদের নিকটে যাওয়া আসা করা চাই। যথাসাধ্য গোপনে গোপনে তাহাদের সাহায্য, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া চাই। যাহাতে সকলের মন এক হয়, তাহার উপায় করা চাই। প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু মুসলমানকে এক ভাবা চাই।

শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা দেশের মঙ্গল জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই। সকলের এক প্রাণ—এক দেহ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা চাই। একভাবে, একমতে বুদ্ধি চালনা করা চাই। আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, যাহারা কেনীর পক্ষে আছে তাহারা মনের সহিত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না। কেনীর মন যোগাইতে হাঁ, হুঁ করিবে মাত্র। চেষ্টা করিলে, বিপদকালে সকলেই সকলের উপকার করিতে পারে। অর্থবল আর বাহুবলই যে বল তাহা নহে। শত্রু দমন করিতে হইলে, অন্য বলেরও আবশ্যক। চেষ্টা করিলে সকলেই সকলের কিছু না কিছু উপকার করিতেই পারে। আমি অর্থের বল চাই না। বাহুবলেরও তত দরকার করিতেছে না। ঈশ্বর আমাকে এ দুই বল যা দিয়াছেন কেনীর জন্য উহাই যথেষ্ট। যে বলের অভাব সেই বলের অন্বেষণ কর, যদি পাও, সাহায্য চাও—সাহায্য লও। আর কেনী যে বলে বলিয়ান, তার অনুকরণ কর। দেখি কেনী যায় কোথা? একা কেনী—আসিবার দিন মাত্র একখানি বেত, আর একটী টুপী লইয়া আসিয়াছিল, তা লোকের কাছে গল্পও করে যে, আমার বেত টুপী সার। যদি নাই থাক্‌তে পারি যাহা লইয়া—আসিয়াছিলাম তাহাই লইয়া যাইব। দেখত কেমন সাহস। আর কেমন ভাল হওয়ার চেষ্টা। তোমাদের কি ওরূপ সাহস আছে, না উৎসাহ আছে? তোমাদের সকলি মুখে, কাজে কিছুই নাই। কেবলই হৈ হৈ। কার্য্য বুঝিয়া, কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া চলিবে না, বুঝিয়া করিবে না। আচ্ছা যাহা বল তাহা করিতে পারিলেও মুখের গৌরব বজায় থাকে। কথার মূল্য বাড়ে। ফাঁকা আওয়াজ আর ফাঁকা কথা দুই সমান। কেবল বারুদ ক্ষয়, আর মাথা ক্ষয়। তোমরা বোঝ আর না বোঝ, পার আর না পার, মুখের জোর কিছুতেই কমে না। বাকি রহিল মাথা—সে মাথা একেবারে নাই বলিলেও হয়, কারণ প্রায়ই ঠিক থাকে না। যাঁহা হউক আর বেশী বল্‌তে ইচ্ছা করি না। মনে ভেবে রেখ, খুব দৃঢ় বিশ্বাস করে স্থির করে রেখ যে, সকলেরই শেষ আছে। আমি যদি এই জালেমের হাত থেকে আমার প্রজা রক্ষা করিতে না পারি তাতে দুঃখ নাই, কারণ কালে কেনীর ধ্বংস আছেই আছে। আমার দুঃখ এই যে, আমি সে সকল ঘটনা চক্ষে দেখিতে পারিব না। দয়ার হাত বিস্তার—নির্দ্দয়ের হাত সঙ্কোচ। যে দিন কেনীর সময় পূর্ণ হইবে, সে দিন সামান্য বলে সামান্য কারণে কেনী মহা অস্থির হইয়া উঠিবে।

কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় খবর আসিল যে, দারগা, জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদারের প্রায় ৪ শত লোক আসিতেছে।

প্যারীসুন্দরী বলিলেন।—তাহারা কোম্পানীর লোক, তাহাদিগকে খুব আদর কর। কি জন্যে আসিয়াছে শোন। যদি সেই কারণেই আসিয়া থাকে, তবে এইক্ষণে সে সব আলাপ কিছু না করে,—আগে আহারের জোগাড়, জল খাবার জোগাড়, বাসার জোগাড়, বিশ্রাম উপযোগী স্থানের জোগাড় করিয়া দেও, পরে অন্য জোগাড়। কিছুতেই যেন তাহাদের সমাদর, আদরের, যত্নের ত্রুটী না হয়। সেলাম বাজাইয়া রামলোচন ত্রস্তে চলিয়া গেলেন।

একাদশ তরঙ্গ

দলীলের বাক্স

পাঠক! জামাই বাবুর সেই বাক্স চুরির কথাটা একবার মনে করুন। তিনি অন্য কোন মূল্যবান জিনিস না লইয়া সামান্য একটা বাক্স অত পরিশ্রম অত জোগাড়ে হস্তগত করার কারণ কি? তাহা বোধহয় বুঝিতেই পারিয়াছেন। সন্ধানী বিনোদ, ঐ বাক্সে অছিয়তনামা—

বিনোদ বলিয়াছে, আমি জানি ঐ আলমারীর নিকটে হাত বাক্সটীর মধ্যেই অছিয়তনামা আছে। আমি মীর সাহেবকে রাখিতে দেখিয়াছি। আমি অছিয়তনামা চিনি। বিনোদ মীর সাহেবের বিশ্বাসী, মীর সাহেবের অনেক গুপ্তকথা জানে, সুতরাং অছিয়তনামার সন্ধানও যথার্থ। জামাই বাবু বিনোদকে একেবারে বড়লোক করিবেন,—কোরাণ ছুইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইহার পরেও শতেক দেড়শত বিনোদের বাড়ী গিয়াছে। তাহার পরেও বিনোদের কত তোযামোদ, কত খাতির। বাক্সটী খুব সাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। সুযোগ পান নাই বলিয়া খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। একদিন খুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, চাবি নাই। অন্য অন্য চাবি দিয়াও দেখিয়াছেন, খোলে না। তালার কল্‌টি পর্য্যন্ত ঘোরে না। ভাঙ্গিতেও সাহস হয় না। বাক্স ভাঙ্গার কথা প্রকাশ হইলে যদি ঐ বাক্সের তালাস হয়—না পাওয়া গেলেই সন্দেহ হইবে যে, জামাই বাবুই এ কীর্ত্তি করিয়াছেন। বাক্স ভাঙ্গার কারণ কি? রাত্রে বাক্স ভাঙ্গার আবশ্যক কি? নানা ভাবনার পর স্থির করিয়াছেন যে হাতে পাইয়াছি কাজ উদ্ধার হইয়াছে। যে দিন সুবিধা আর সুযোগ পাইব, সেই দিন আবার খুলিবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। নিতান্ত পক্ষে না খোলে ভাঙ্গিব। দেখি কি হয়। কিছু দিন চাপিয়া যাই। এমন সুন্দর বাক্সটী ভাঙ্গিতেও মনে কষ্ট হয়। ভাবি স্বার্থে অযথা ব্যাঘাত, ভয়, কলঙ্ক, অপবাদ, লজ্জা, এই কএকটি বিষয় ভাবিয়া বাক্স খুলিবার কি ভাঙ্গিবার চেষ্টা আর করিলেন না। মনে মনে আরও স্থির করিলেন যে মূল দলীলত হাতে আসিল, এখন অন্য অন্য দলীল হাতে করা চাই।

সকলের সম্মুখে মীর সাহেব জামাই বাবুকে একদিন বলিলেন।—চিরকাল শালঘর মধুয়ার কুঠীর মালিক সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় "কেনী" এখন অনুগ্রহই করেন। এদিকে বিষয়াদিতেও আর কোন গোলযোগ দেখি না। এই সময় আমি একবার সেরাজগঞ্জ* হইয়া আসি। অনেক দিন যাই না। একবার গিয়ে দেখিতে হয়। এ বাটীর

---

*সেবাজগঞ্জের অধীন কোন গ্রামে মীর সাহেবের ভগ্নী বাড়ী।

কাজ কর্ম্ম সকলি আপনি দেখিবেন। বাপু! আমার আর কোন আশা নাই। সকলি তোমাদের, আমার আর কিছুই ভাল বোধ হয় না। তোমাদের কাজ কর্ম্ম তোমরা দেখে শুনে কর। আমি নিশ্চিন্ত ভাবে বসে বসে দুট খেতে পেলেই হল। তোমাদের ঘর সংসার তোমরা দেখে শুনে রক্ষা কর।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন। —স্ত্রী পরিবার বিহীন গৃহী বড়ই অসুখী। ঘরের লক্ষ্মীই ঘরণী। যদি তাহাতেই অনিচ্ছা, তবে একেবারে সর্ব্বত্যাগী হয়ে "ফকিরী" গ্রহণ করাই ভাল। গৃহী অথচ কিছুই নাই। হুজুর এর অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না।

মীর সাহেব বলিলেন।—আবার!! —জেনে, শুনে, আবার!! যে নূতন সংসারী তার কাছেই সংসার সুখের। ভুক্ত ভোগীর নিকট অন্য প্রকার। সে ফাঁদে আবার পড়িব। সংসারে সুখ নাই। যদি বলেন আমার বংশলোপ হইবে, স্ত্রী পুত্র কন্যা কিছুই নাই। তাহাতে দুঃখ কি? কত লোকের সন্তান জন্মিবে, বংশ রক্ষা করিবে। আমার নাইবা হইল। আমি স্ত্রী পরিবার এবং দুনিয়ার সুখ দুঃখ ভাল করিয়া ভোগ করিয়াছি। সন্তানের সাধ, বিষয় সম্পত্তির সাধ সকলি মিটাইয়াছি। আমোদ আহ্লাদের সাধ মিটাইতেও কম করি নাই। আর কেন? অনেক হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে শরীরের অবস্থার সঙ্গে সংসারীর অনেক কার্য্যে যোগ আছে।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—আপনি যদি বয়সের কথা পাড়েন, তবে ত, আমরা মারা গিয়াছি। বড় মীর সাহেব আমার ছোট ছিলেন। বয়সে কি করে?

মীর সাহেব বলিলেন। —বয়সে কিছু না করুক। আমি আর ও ফাঁদে পা, দিতে ইচ্ছা করি না। আমার গায়ে বাতাস লাগিয়াছে। সর্ব্বস্ব গিয়া একটি মাত্র ছিল তাহাও যখন গেল, আর আশা কি? সকলি ঈশ্বরের কৃপা। এখন আছি ভাল। দয়াময়ের দয়ায় এখন আছি ভাল।

কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কেনীর চাকর কলিম সর্দ্দার আসিয়া, সেলাম বাজাইয়া বলিল,—

হুজুর!—সাহেব!—এই ডিহীতে নীল দেখিতে আসিয়াছিলেন, হুজুরের আম বাগানের নিকট, হাতীর উপরে আছেন, কি কথা আছে—সেলাম দিয়াছেন।

মীর সাহেব যে, অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই বাগানের নিকট গিয়া, কেনীর সহিত সাক্ষাত করিলেন। অনেকেই দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতদৃশ্য দেখিতে লাগিল। কথাবার্ত্তা স্পষ্ট ভাবে হইলেও দূরতা হেতু স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল না। কেবল সময় সময় কেনীর মুখে চক্ষে, রাগের চিহ্ন দেখা—আর প্যারীসুন্দরীর নাম কানে শোনা। —শেষের কথাটা বোধ হয়, স্পষ্ট ভাবেই সকলের কানে গেল। "বেত আর টুপী—আবার উহা লইয়াই জাহাজে চড়িব।"

অনেকে অনেক অর্থ ঘটাইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ হইল। কেনী যাইবার সময়ে, আর কএকটি কথা চুপি চুপি মীর সাহেবকে কহিয়া হাতিতে উঠিলেন। হাতিতে উঠিতে উঠিতে আবার বলিলেন, "ভুলিবেন না, ফের বলিতেছি ভুলিবেন না।"

পুনরায় উভয় উভয়কে সেলাম দিয়া কেনী দক্ষিণ মুখি হইলেন। মীর সাহেব উত্তর মুখি হইয়া বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলেন। গুপ্ত দর্শকগণ মীর সাহেবকে আসিতে দেখিয়া আমবাগান হইতে, নানা পথে ছুটিয়া মীর সাহেবের অগ্রেই বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

মীর সাহেবও ধীরে ধীরে আসিয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। মজলিস আবার জমাট্ বান্ধিয়া গেল। কথা চলিতে লাগিল।

মীর সাহেব বলিলেন।—ধন্য বাঙ্গালীর মেয়ে। সাবাস সাবাস! সাহেবকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সাহেব এতদিন সকলকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ বুঝি প্যারীসুন্দরীর হাতে হয়। প্যারীসুন্দরী সাহেবের ধনে প্রাণে সারা করিতে স্থির হইয়া বসিয়াছে! আবার কুঠী লুট করিবে। কেনীর মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে। মেম সাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসী বানাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সাহেব না কি এই সকল কথা তাঁহার কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনিয়াছেন। শুনিয়া মহা ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্যস্ত হইবারই কথা। হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া কুঠী রক্ষা, আত্মরক্ষা, মেমসাহেবকে রক্ষা করিবার উপায় করিয়াছেন। ধন্য—প্যারীসুন্দরী। এতবড় মোকদ্দমা মাথার উপরে, তার উপরেও এত সাহস! এত জেদ! এতদূর চেষ্টা।

অনেক কথাবার্ত্তার পর সময় বুঝিয়া দেবীপ্রসাদ বলিলেন, হুজুর! থাকের নক্‌সাটা দেখা নিতান্তই আবশ্যক হইতেছে। কি কুক্ষণেই যে, আসাদ আলীর সহিত স্বর্গীয় বৃদ্ধ মীর সাহেবের বিবাদ বাধিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলিতেছে। দুই পুরুষ যায়। তবু বিবাদের শেষ হইল না। কত পুরুষ যে এই বিবাদ থাকিবে ঈশ্বর জানেন। আবার এই সম্মুখের চর লইয়া বিবাদ উপস্থিত, নক্‌সাটার নিতান্তই দরকার হইয়াছে।

"থাকের নক্‌সা কেন? আমি অনেকদিন হইতে ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, বিষয়াদির যাবতীয় দলীল এক ফিরিস্তি করিয়া "দুলা মিয়াঁকে" বুঝাইয়া দেও। যাহাদের কাজ তাহারা দেখে শুনে করুক। আমি আর ও ঝঞ্ঝাটে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আজই সমুদায় দলীল বুঝাইয়া দেও।"

জামাই বাবু শ্বশুরের কথা শুনিয়া, চমকিয়া উঠিলেন! অন্তরে আঘাত লাগিল। এ অন্য আঘাত নহে, এ দুঃখের আঘাত নহে, ভক্তির সহিত প্রেমের আঘাতও নহে। এ গ্লানি! এ আত্মগ্লানির বিষম আঘাত।

যাহার সর্ব্বনাশ করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, যাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিবার কথা সময় সময় অতি গোপনে মুখে আনিতেছেন, অস্ত্রে খুন, কি ঔষধে, নিজে কি অপরের দ্বারা, এ চিন্তাও মস্তকে আনয়ন করিয়াছেন, যাঁহার মুখ দেখিতে চক্ষু নারাজ! তাঁহার এই ভাব? এমন সরল ভাব এমন প্রেম পূর্ণ—পবিত্র ভাব? কি ভালবাসা কথা! "যাহাদের কাজ তাহারা করুক।" সা গোলাম অস্থির হইলেন। মনে সেই এক প্রকার নূতন ভাবের দেখা দিল। কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী শক্তি ছটা—একটি

কথায়, কোথায় সরিয়া গিয়া, ভয়ের সঞ্চার হইল, হৃদয় কাঁপিয়া গেল, অঙ্গ সিহরিয়া উঠিল; বুক শুকাইয়া দুর দুর করিতে লাগিল কথাটা কি? কথা আর কিছু নহে, মীর সাহেব মাঙ্গনকে দলীলের বাক্স আনিতে আদেশ করিয়াছেন, সমুদায় দলীল এখনই জামাই বাবুকে বুঝাইয়া দিবেন।

কোন কোন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ও কথায় অঙ্গ সিহরিবে কেন? ভয়েরই বা সঞ্চার হইবে কেন? জামাই বাবুর ত, এক প্রকার—শুভ সংবাদ, মঙ্গলের কথা—আনন্দের কথা। তাহা নহে, পাঠক! তাহা নহে, আনন্দের কথা নহে, সম্পূর্ণ নিরানন্দ। মহা সঙ্কট! এবং বিষম ভয়। এখনও বুঝিতে পারেন নাই? জামাই বাবুর মুখশ্রী, বিশ্রী হইয়া ধুলা উড়িবার কারণ এখনও বুঝিতে পারেন নাই..! "তাঁহার সেই চুরি করা বাক্স।" সেই বাক্সটিই যদি দলীলের বাক্স হয়, ঐ নিশীথ সময়ে তোষাখানার মধ্যে হামাগুড়ি পাড়িয়া যাইয়া চুরি করা বাক্সটিই যদি দলীলের বাক্স বলিয়া চিহ্নিত থাকে, তবেত এখনই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে, ধরা পড়িলেও পড়িতে পারে। এই কারণে জামাই বাবু—চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে কত পীর, কত ফকির দোরবেশদিগের দরগায় নজর, সত্যপীরের সিন্নি, মাণিকপীরের খাজা, বড় পীরের মলিদা, মুস্কিল আসানের রোজা, কত কি মানত করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাঙ্গন দলীলের বাক্স আনিয়া মীর সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। জামাই বাবু বাঁচিলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, গা দিয়া ঘাম ছুটিল, চিন্তা বিকার ছাড়িয়া গেল, রক্ষা পাইলেন, ধরা পড়িলেন না। কেহ কিছু জানিতেও পারিল না। সে বাক্সের কোন কথাই উঠিল না। দলীলের বাক্স তবে অন্য বাক্স, তাহা স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। আর চিন্তা কি?

মীর সাহেব বাক্স খুলিয়া থাকের নক্সাটা দেবীপ্রসাদের হাতে দিয়া, বাক্স সমেত দলীল জামাই বাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। এবং বলিলেন—

আপনি সমুদায় দেখিয়া আপন হাতে রাখিয়া দিন। জমিদারী সংক্রান্ত সমুদায় দলীল, ঐ বাক্সে আছে।

বিনা পরিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে, এবং অনায়াসে, জামাইবাবুর মনের আশা পূর্ণ হইল। মীর সাহেবের সরল ভাব, প্রেমপূর্ণ পবিত্র ভাব, সাগোলামের পাপময় চিরকলুষিত, হিংসাপূর্ণ অন্তরের দুষ্ট দুরাশাও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়া দিল।

মীর সাহেব উঠিয়া যাইবার সময়, দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া একটু গোপনভাবে চুপে চুপে বলিলেন, এখন ৮০/৯০ জন লাঠিয়াল জোগাড় করিয়া, যত শীঘ্র হয়, শালঘর মধুয়ার কুঠীতে পাঠাইয়া দেও। বিশেষ দরকার—সাহেবেরও বিশেষ অনুরোধ।

দ্বাদশ তরঙ্গ

বিলাতী বুদ্ধি

উভয় পক্ষেরই গুপ্ত সন্ধানী, চর অনুচর, খবুরে,—সকলি আছে। সুন্দরপুরের খবর, কুঠীতে আসিতেছে, কুঠীর খবর সুন্দরপুরে যাইতেছে। সাধারণের মনে বিশ্বাস, যে প্যারীসুন্দরী কিছুতেই কেনীকে ছাড়িবেন না। হাজার টাকা! কথার কথা—কেনীর মাথার মূল্য এখন হাজার টাকা। যে ঐ মাথা সুন্দরপুরে লইয়া দিতে পারিবে, সেই ঐ টাকা পাইবে। মেম্‌সাহেবকে চান—চাকরাণীর জন্য। সাড়ী পরাইয়া, হাতে বালা দিয়া মনের মত জব্দ করিবেন, দেশের লোককে দেখাইবেন। কিন্তু কেনীয় কম পাত্র নহে, সেও প্যারী-সুন্দরীকে কুঠীতে লইয়া যাইবার যোগাড়ে আছে। কি কাণ্ড। ভয়ানক ব্যাপার। কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে?—আপন কথাই আপন মুখে প্রায় লোকের ঠিক থাকে না। —বিশেষ বাঙ্গালী। পরের কথায়, কত কথাই যে, বাতাসের আগে আগে দৌড়িয়া যাইতে থাকে তাহার সীমা করা কঠিন।

বেলা দুই প্রহর ৪টা। মিসেস কেনী এবং কেনী, উভয়ে দ্বিতল গৃহের উপরের হলে, আজ বড়ই মিসামিসী ঘেঁসাঘেসী। সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের গোলাকার ক্ষুদ্র টেবিল—টেবিলের উপর টম্‌লট পূর্ণ এক্‌সা ব্রাণ্ডি। সোডাওটারে মিশ্রিত, এখনও গ্লাসের নিম্নভাগ হইতে বুদবুদ উঠিতেছে, এক্‌সার রঙ্গ ক্রমশই ফিকা হইতেছে।

কেনী পাচারি করিয়া বেড়াইতেছেন। দুই তিন পাক ফিরিয়া একটু ব্রাণ্ডি মুখে দিতেছেন। কিন্তু মস্তক চিন্তার কার্য্য ভুলে নাই।—কেনীর মস্তক এইক্ষণ বিশেষ একটি চিন্তায় রহিয়াছে। অবশ্যই কোন কার্য্য উদ্ধারের জন্যই চিন্তা দেবীকে স্মরণ করা হইয়াছে। ব্রাণ্ডির ঢোকে ঢোকে, মনগত ভাবের, উদয় হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমে কেনী চিন্তা করিয়া তাহার দোষ গুণ সমালোচনার জন্যেই মস্তিষ্কের সহিত কার্য্য বিবরণের আলোচনা হইতেছে। মনের একাগ্রতা, চিন্তার বেগ বৃদ্ধি, ভাল মন্দ বিচার, পরিণাম এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনার জন্যই বোধহয় অল্প মাত্রায়, ব্রাণ্ডি সেবনে মন দিয়াছেন। কারণ ব্রাণ্ডি যে মস্তকে যাহা পায়, তাহাই বৃদ্ধি করে।

মিসেস কেনীও কিছু গরমেই আছেন। অন্য টেবিলে, সেরীর বোতল খোলা রহিয়াছে। —পিয়ানোর সহিত সুর মিলাইয়া, স্বামী সোহাগিণী, গান ধরিয়াছেন, আবশ্যক মত সেরীর স্বাদ লইয়া রমণী হৃদয়, প্রফুল্ল করিতেছেন। স্বামী স্ত্রী এক কক্ষে—আনন্দময়ী মদিরা সম্মুখে। স্ত্রীকণ্ঠে গীত। হস্তে বাদ্যযন্ত্র। সুরন্‌জিত, এবং সুসজ্জিত দ্বিতল গৃহ। সুখ সেব্য সামগ্রী

খাদ্যাদি প্রচুর—ভাণ্ডার পূর্ণ।—সুখের একশেষ। কিন্তু এ সুখ সময়ে বিলাতী দম্পতীর বদন মণ্ডল প্রফুল্লতার বিশেষ চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। উভয়েই আমোদ প্রমোদে, মনের সুখে আছেন বটে—কিন্তু আন্তরিক নহে।—ভাবে বোধ হইল যেন উভয়েরই দুরন্ত শত্রু সময়, প্রয়োজন ও কার্য্য গতিকে, নিতান্ত আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয়, মূল্যবান সময়কেও লোকে শত্রু মনে করে, ইহা মিথ্যা নহে। সেই অমূল্য সময়, এইক্ষণে ইঁহাদের পক্ষে নিতান্তই বিষম ও কষ্টকর বোধ হইতেছে।—কারণ আছে!

মেঃ কেনীর চিন্তা অন্য প্রকারের। চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে গোলযোগ। যশোহর, মাগুরায়, পাবনায়, এই তিন জেলা মাখিয়া মোকদ্দমা। আদালত ফৌজদারী। নড়ালের রামরতন রায়, নলভাঙ্গার রাজা, পাংশার ভৈরব বাবু, আরও কত জমিদার, তালুকদার সহিত কত গোলযোগ। সকলের উপর সুন্দরপুর। মেমসাহেবকে লইয়া সাড়ী পরাইবে। বড় শক্ত কথা। আবার নিজের মাথার কথাটাও কম নহে। কোন্ দিক রক্ষা করিবেন।

মেমসাহেবের বিশ্বস্ত খানসামা ত্রস্তে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—"হুজুর পাবনার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে।

মেমসাহেব পিয়ানো ফেলিয়া মহাব্যস্তে বাদ্য আসন হইতে উঠিলেন। তাড়াতাড়ি নীচে যাইয়া পাবনার পত্র লইলেন। নীচের তালাতেই পত্রের লেপাফা খোলা হইল। এক লেপাফায় ছোট বড় দুই খানি কাগজ, ছোট কাগজ খানা পাকেট পুরিয়া পত্র হস্তে কেনীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কেনী টমলট্ খালী করিয়া পুনরায় ব্রাণ্ডি ঢালিতেছেন। পাবনার পত্রের কথা শুনিয়া ব্যস্ততা প্রযুক্ত ব্রাণ্ডিতে সোডাওয়াটার না মিশাইয়াই যত পারিলেন পান করিয়া, মিসেস্ কেনীর বাম স্কন্ধে বাম হস্ত রাখিয়া পত্রখানির আগা গোড়া ২/৩ বার মনে মনে পাঠ করিলেন। মুখে কথঞ্চিত হর্ষিবের লক্ষণ দেখা দিল! বোধ হয় কোন সুখবর।

সোনাউল্লা খানসামা বিশ্বাসী ও চতুর। সময়ে রাগী ও ধীর। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বিশ্বাসী, কেনী সোনাউল্লাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপে চুপে কি কি বলিয়া দিলেন। কেনী যে দিন বেশী মাত্রায় ব্রাণ্ডি চড়াইতেন, সে দিন বিষয়াদীর কাজ আফিসে গিয়া করিতেন না। এমন কি উপরতালা হইতে কিছুতেই নীচে নামিতেন না। যদি কথা প্রকাশ হইত যে সাহেব আজ ব্রাণ্ডির বোতল খুলিয়াছেন, তবে কুঠী সমেত নীরব। কাহার মুখে উচ্চ কথাটী বাহির হইত না। ভয়ে সকলের প্রাণ কাঁপিত। কেনীর আদেশ ছিল যে আমোদের সময় কোন আমলা তাঁহার সম্মুখে না যায়। মেমসাহেবের পিয়ানোর আওয়াজ, আর গলার মিহি সুর শুনিয়াই কার্য্যকারকগণ বুঝিয়াছিলেন যে, আজ আমাদের দিন। আমাদেরও ছুটী। কেহ দাবায়, কেহ পাসার খ্যালে বসিলেন। কেহ অন্য আমোদে মন দিলেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত—সম্পূর্ণ অস্ত। ঘোর সন্ধ্যা। কোথাও লণ্ঠন জ্বলিল, কোথাও প্রদীপ দেখা দিল। কোথায় কোথায় মোমবাতী শোভা পাইল, ঝাড়ে দেয়ালে বৈঠকি সেজে লণ্ঠনে নিজে পুড়িয়া আমোদে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

সোনাউল্লা সাহেবের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিরুণী, ব্রাস, গ্লাস, অল্প পরিমাণ কিছু খাদ্য পুরিয়া একটী পোর্টম্যান সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

আহারের টেবিল সাজান হইয়াছে। কেনী তাড়াতাড়ি আহারে বসিলেন। মিসেস্ কেনী টেবিলে বসিলেন, কিন্তু আহার করিলেন না। কেনী সামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন। সোনাউল্লার মুখের দিকে তাকাইতেই সোনাউল্লা জোড় হাতে বলিল—

"খোদাবন্দ পাল্‌কী বেহারা হাজির।" কেনী দেসলাই জ্বালাইয়া পাইপ মুখে ধরিলেন, এবং বলিলেন, সব ঠিক?

সোনাউল্লা পূর্ব্ববৎ বলিল—খোদাবন্দ সকলি ঠিক।

কেনী মৃদুস্বরে কয়েকটী কথা মেমসাহেবকে বলিয়া সোনাউল্লাকে বলিলেন, দেখ বাবুরচিকে গিয়ে বল, ভাল ভাল খানা তৈয়ার করিতে। আর যা যা করতে হবে মেমসাহেবের কাছে শুন্‌বে। এই বলিয়াই মেমসাহেবের হাত ধরিয়া নীচে নামিলেন! সিঁড়ির নিকটেই পাল্‌কি, পাল্‌কীতে উঠিবার সময় কাহাকে কোন কথা বলিতে অবসর পাইলেন না। কারণ, স্ত্রীর মুখে গাঢ়ভাবে চুম্বন করিতেই অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন। চুম্বনের স্বাদ লইয়া পাল্‌কীর দরওয়াজা বন্ধ হইল। বেহারাগণ নিঃশব্দে কুঠীর পশ্চাৎ দ্বার হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ মুখে চলিল।

কিছুদূর গেলেই মশাল, মশালচি, লোকজন সকলি সঙ্গে হইল। পাল্‌কী দক্ষিণদিকেই চলিল। কুঠীতে সোনাউল্লা এবং মেমসাহেব ভিন্ন, কেনীর গমন সংবাদ কেহই জানিতে পারিল না। জানিবার কথাও নহে।

মেমসাহেব উপরে আসিয়াই জাঁকালভাবে খানার টেবিল সাজাইতে আদেশ করিলেন। রূপার চামচ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলেন। সমুদয় ঝাড়ে বাতি জ্বালান হইল। বাহিরের কাজ কর্ম্ম সমুদায় ঠিক করিয়া ড্রেসিং রূমে প্রবেশ করিলেন। মনের মত সাজ সয্যায় অঙ্গ সাজাইয়া ড্রেসিং রূম হইতে বাহির হইলেন। সে সময়ের ভাবই ভিন্ন—রূপ ভিন্ন। বৃহদাকার আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের পরিচ্ছদ, সাজের নিজেই ভাল মন্দ বিচার করিতে লাগিলেন। কোনখানে টানিয়া দিলেন। দুই একটী চুল যাহা বেকেতাভাবে কপালের কি ভ্রূর উপর উড়িয়া পড়িয়াছিল, তাহা হস্ত দ্বারা, ব্রাস দ্বারা সোজা করিলেন। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হেলিয়া দুলিয়া, বাঁকা হইয়া, পাস ফিরিয়া দেখিয়া "অল্ রাইট" বলিয়া জানালার দিকে মুখ দিয়া ইজিচেয়ারে পা ছড়াইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলেই দেখিতে পাইলেন যে একখানা পাল্‌কী আর জন পঞ্চাশ লোক নানা রকম পোষাক পরা, ক্রমে আপিস দালান বাম দিকে রাখিয়া একেবারে তাঁহার দ্বিতল বাস ঘরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এবং পাল্‌কীর দ্বার খুলিয়া গেল।

মিসেস কেনী আগ্রহের সহিত ও! মিষ্টার! মহানন্দে ত্রস্তপদে সিঁড়ির নীচে আসিয়া আগন্তুক ইংরেজের হাত ধরিলেন। যথারীতি অভিবাদনাদী করিয়া উপরে আসিলেন। পর্দ্দা সরিয়া দ্বার অবারিত করিল। দস্তুর মত পাখা চলিতে লাগিল।

মিসেস কেনী পুনরায় তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া সাহেবের লোকজনকে বিশেষ আদর করিয়া নীচের তালায় স্থান দিলেন। তাহাদের আহারাদির জন্য সোনাউল্লাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া উপরে আসিলেন।

পাঠক! আগন্তুক নূতন লোক নহেন। আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিত মাজিষ্ট্রেট। সঙ্গের লোকজন ইহারাও নিরর্থক আসে নাই। উহাদের মধ্যে দারোগা, নাএব দারগা, বরকন্দাজ—সকলি আছেন। কিন্তু সকলেই ছদ্মবেশী। মেমসাহেব, সাহেবকে বসাইয়া ঐ কক্ষের নিম্ন কুঠরীতে দারোগা, জমাদার এবং বরকন্দাজদিগকে যথোপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। কুঠীর অন্য অন্য চাকর, আমলা প্রভৃতি কেহই এ নিগূড়তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই।

উভয় পক্ষের গোয়েন্দাই চতুর। কে কোন্ সময়ে কোন্ সন্ধান লইতেছে, কি কৌশলে কি বেশে আসিয়া খবর জানিয়া যাইতেছে, সাবধান সতর্কে, বিশেষ সতর্কে থাকিয়াও কোন পক্ষই তাহা জানিতে পারিতেছেন না। কুঠীর খবর দিন দিন সুন্দরপুরে যাইতেছে।—সুন্দরপুরের গুপ্তচর সংবাদ দিয়াছে যে, কেনী আজ কুঠীতেই আছেন। আমোদে মাতিয়া আছেন। ব্রাণ্ডি পানিতে মাতওয়ারা—বিভোর। মেমসাহেব পিয়ানো বাজাইতেছেন। হাসি তামাসা খুব চলিতেছে—ইত্যাদি—

মিসেস কেনী আজ যে অভিনয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই কঠিন। তবে ভরসা এই যে, স্বয়ং নেতৃ—সোনাউল্লা সাহায্যকারী,—আগন্তুক পাবনার দল প্রকাশ্যে সাহায্যকারী না হইলেও শান্তিরক্ষক, বিচারক। এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ, পরিদর্শক।

সোনাউল্লা মেমসাহেবের নিকট বলিল—"হুজুর! মীর সাহেব তাঁহার নিতান্ত বিশ্বাসী লোক দ্বারা এই পত্র পাঠাইয়াছেন সে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহে। পত্রের লিখা ছাড়া আরও কি কথা আছে।"

মিসেস্ কেনী অতি ত্রস্তে নীচে আসিয়া গোপালকে দেখিয়াই চিনিলেন। বলিলেন, "গোপাল, খবর কি?"

গোপাল সেলাম বাজাইয়া বলিল,—"হুজুর। একশত আসিয়াছে। আর সমুদয় ঠিক। আপিস ঘরে ইহাদের স্থান দিলে ভাল হয়।"

মিসেস্ কেনী আপিস ঘরের দ্বারবানকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। গোপাল এবং গোপালের সঙ্গিরা আপিস ঘরে স্থান পাইল।

মিসেস্ কেনী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বসিয়া খোসগল্প করিতেছেন। আবার সোনাউল্লা আসিয়া করজোড়ে বলিল,—"হুজুর! সান্যাল মহাশয় সাহেবের নিকট বিশেষ কি কথা বলিতে চান।"

মিসেস্ কেনী বলিলেন,—"তুমি গিয়ে দেওয়ানজীকে বল, আজ সাহেবের শরীর অসুখ।"

সোনাউল্লা চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"হুজুর! বড় জরুরী

খবর—তিনি বলিলেন,—"যদি সাহেবের শরীর অসুখ হইয়া থাকে তবে মেমসাহেব নিকটেই বলিতে হইবে। বড়ই জরুরি কথা।"

মিসেস্ কেনী উঠিলেন এবং সিঁড়ির নিকটে আসিয়া সম্ভু সান্যালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা?"

সান্যাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"হুজুর! এখনই খবর পাইলাম যে, প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়াল সুন্দরপুর হইতে রওয়ানা হইয়াছে। ঢাল, সড়কী, লাঠী ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিতেছে। বহুতর লাঠীয়াল একত্রে আসিতেছে। সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল না। কোন পরামর্শও করিতে পারিলাম না। দিন বুঝিয়াই সাহেবের শরীর অসুখ হইয়াছে, এখন উপায় কি?

মিসেস্ কেনী বলিলেন,—"কুঠীতেও আমার অনেক লোক আছে, ভয় কি।"

সম্ভু বলিলেন,—"হুজুর! কুঠীতে যে লোক আছে, তাহাদের দ্বারা কুঠী রক্ষা হইতে পারে না। প্যারীসুন্দরী এবারে বিশেষ যোগাড় করিয়াছে। আর একটী কথা, তাহারা শুধু কুঠী লুটপাট করিয়া যাইবে না, তাহাদের মনের ভাব ভাল নহে।"

মিসেস্ কেনী বলিলেন—"আর কি করিবে? আমাকে সুন্দরপুরে লইয়া যাইবে। যে লোক আছে, তাহাতে যদি তোমাদের সাহস না হয়, আরও লোক সংগ্রহ কর। টাকায় কিনা হয়। দুই টাকার যায়গায় চারি টাকা খরচ কর এই রাত্রেই কত লোক জুটিয়া যাইবে। যত পার সংগ্রহ কর আমার হুকুম।"

সম্ভু বলিলেন,—"এত রাত্রে লোক পাওয়াইত কঠিন কথা।"

মিসেস্ কেনী বলিলেন,—"তবে সাহেবকে কি বলিতে আসিয়াছ? কোথা পাইবে? সে কি কথা? কুঠীর চারিদিকে আমারই প্রজা—তাহাদিগকে বেশী করিয়া টাকা দেও, অবশ্যই আস্‌বে। যত লোক পার, আনিয়া কুঠীর চারিদিকে খাড়া করিয়া দেও। রাত প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত খাড়া পাহারা দিবে।"

সম্ভু সান্যাল সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। মিসেস কেনী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে সান্যাল মহাশয় বাসা বাড়ীতে যাইয়া প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্র সহিত পরামর্শ করিয়া লোক সংগ্রহ জন্য লোক মতাইন করিলেন। হুকুম পাইলে কি আর রক্ষা আছে? "ঝাকড়া চুল" লাঠিয়ালেরা দুহাতে সেলাম ঠুকিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গ্রামে লোক সংগ্রহ করিতে ছুটিল।

উপস্থিত বিপদে আবশ্যক মতে সাহায্য করিবে, এই আশ্রয়েই মিসেস কেনী নিকটস্থ প্রজাদিগকে আনিতে আদেশ ও রাত্রি জাগরণে কষ্ট হইবে বলিয়া দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে আদেশ করিয়াছেন।

স্বার্থই অনর্থের মূল, স্বার্থই দুর্দ্দশার সোপান, জগতে স্বার্থই পতনের মূল কারণ—প্যারীসুন্দরী বলিয়াছেন, দেশের লোকেই দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্টকারী। কেনী বিলাত

হইতে লোকজন সঙ্গে করিয়া এদেশে আসেন নাই। দেশের লোক দিয়াই স্বদেশীয়ের সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন। রাত্র জাগরণে প্রজার কষ্ট হইবে, সেদিকেও মিসেস কেনীর লক্ষ্য ছিল। থাকিয়া কি হইবে? কার্য্যকর্ত্তা বাঙ্গালী—অধীনস্থ চাকরগণ বাঙ্গালী, কিন্তু স্বার্থের দাস। দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়া লোক সংগ্রহ করার আদেশ! এখন দেশের লোকের হাতে পড়িয়া নিরীহ প্রজাকুলের কি প্রকারে দুর্দ্দশা ঘটে—দেখুন।

লোক সংগ্রহকারীরা সেলাম ঠুকিয়া নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিল। দেওয়ানের হুকুম কার সাধ্য আর রাত্রে ঘরে থাকিতে পারে? নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। যে উঠিতে বিলম্ব করিল, কি শরীর অসুস্থ—অসুখ হেতু কুঠির পাহারায় যাইতে নারাজ হইল, তাহার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইল। যন্ত্রণার দায়ে, প্রাণের ভয়ে, অপমানের ত্রাসে অনেকেই দেওয়ানজীর প্রেরিত লাঠীয়ালের সঙ্গি হইল। যাহারা দুই চারি আনা প্রণামী দিতে সমর্থ হইল, তাহারা আর আসিল না। যাহাদের পয়সা দিবার শক্তি নাই, বাধ্য হইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। কুঠী রক্ষার্থে চলিল কাহারা? যাহাদের পেটে অন্ন নাই, সংসারে কষ্টের সীমা নাই। কোথায় যাইতে হইবে, কি কার্য্য করিতে হইবে, কেন টানিয়া লয়, কেনই বা বিনাপরাধে লাথী, কীল, চড় মারে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাধ্য নাই। অনেকেই সারাদিন নীল জমির কারকিদ করিয়া বাড়ী আসিয়াছে। নিজের জমি উপযুক্ত সময়ে চাষ আবাদের ক্ষমতা নাই। সময় বহিয়া যাউক, রৌদ্রে পুড়িয়া যাউক, জলে ডুবিয়া যাউক "জো" সরিয়া যাউক, কার সাধ্য নীলজমি ফেলিয়া ধানের আবাদ করিতে পারে! আগে নীল, পাছে ধান। কৃষকের জীবন উপায় শষ্য বপনোপযোগী জমি প্রস্তুত করিতে বিঘ্ন, বুনীতে বাধা, কর দিতেও অক্ষম। কাজেই খাবার সংস্থান অনেকেরই নাই।

বাড়ী আসিয়া কেহ আধ পেটা আহার করিয়াই কুহকিনী নিশার কুহকে পড়িয়া মাতিয়াছে। কেহ অনাহারেই মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে। অল্প পরিমাণ ক্ষুধা নিবারণ জন্য এক মুঠো অন্নও অনেকের ভাগ্যে ঘটে নাই। যাহা ছিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি দিনের বেলা নিরন্নে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মায়ের অঞ্চল ধরিয়া কান্দিয়াছে। মায়ের প্রাণ! যাহা ঘরে ছিল, তাহাই সিদ্ধ পোড়া করিয়া প্রাণ হইতে প্রিয়তর সন্তান সন্ততীগণের মুখে সুদু নুন ভাত দিয়া তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে। হাঁড়ীতে আর অন্ন নাই। থাকিলে ছেলেমেয়েরাই আর কিছু খাইতে পারিত। কি করে সজলনয়নে কৃষকপত্নী হাঁড়ি আঁচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীর জন্য রাখিয়া দিয়া স্বামীগত প্রাণা পত্নী কেবল ঈশ্বরের নাম করিয়া রহিয়াছে। স্বামী সারাদিন নীলকুঠীর কাজ করিয়া বাটী আসিয়াছে, ছেলেমেয়ে দিনে খেতে পায় নাই।—সন্ধ্যাবেলাও ভরপেট হয় নাই। স্ত্রীর মুখে খবর শুনিয়া আর সে পোড়া ভাতও মুখে দিতে সাধ্য হয় নাই। ঈশ্বর ভরসা।—মহাজনের বাড়ীতে গিয়া দ্বিগুণ তৃগুণ লাভ স্বীকারে ধান কর্জ্জ করিয়া আনিবেন, তাহারও সময় নাই। রাত্র প্রভাত হইতে না হইতেই আমীন খালাসী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। নীল জমীর কারকিত, চাষ ইত্যাদিতে নিযুক্ত করে। তবে কিছু প্রণামী দিতে পারিলে সে, যমদূতগণের হাত হইতে

রক্ষা পাইতে পারে। তাহাই বা কোথায় পাইবে? পেটে পাথর বান্ধিয়া থাকাই অভ্যাস। দিবসে দু এক পয়সার জলপানই পূর্ণ আহার—পরিশ্রমের ইতি নাই—নিদ্রাদেবী ছাড়িবেন কেন? বিছানা থাক্ বা না থাক্, বালিসে মাথা পড়ুক বা না পড়ুক, ঘুমের ঘোরে সকলেই কাতর। তাহার উপর এই দৌরাত্ম্য। যাহারা দুই এক আনা দিতে পারিল, তাহারা কীল, লাথী খাইয়া রক্ষা পাইল। যাহাদের দিবার শক্তি হইল না, তাহারই কুঠী পাহারা দিতে চলিল। হায়রে বঙ্গ! হায়রে নীলকর!! হায়রে স্বদেশীয়!!!

মিসেস্ কেনী পূৰ্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা রাত্র প্রভাত হইতেই কুঠী আক্রমণ করিবে। কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন, তাইতে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটকে গোপনে আনিয়া রাখা। আরও একটুকু সূক্ষ্ম কথা আছে যে, কেনীর মাথা কাটিয়া সুন্দরপুর লইয়া যাইবে। ভ্রমে যদি মাজিষ্ট্রেটের মাথাটা কাটা যায়, তবে কেনীর মনষ্কামনা শীঘ্রই সিদ্ধি হয়। প্যারীসুন্দরীর সর্ব্বশান্ত, কেনীর জয় জয় আনন্দ। কুঠী ছাড়িয়া গুপ্তভাবে যাওয়ার কারণও তাহাই।

মিসেস্ কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া ভিন্ন কক্ষে জাগিয়া আছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভিন্ন কক্ষে নিদ্রিত। স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট—শান্তিরক্ষকগণ সহ রক্ষার জন্য উপস্থিত, কুঠীর লোকজনও সতর্কীত, বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু মন অস্থির, মহা অস্থির! আজ রাত্রে নিদ্রার সহিত তাঁহার দেখা নাই। কি জানি কি হয়! বিপদ সম্ভাবনায় অবশ্যই অধিক ভয়, ঘটনাচক্রে কোথায় লইয়া ফেলে, কি ঘটে কি হয় সমুদায় ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহীত। কাজেই অস্থির—কাজেই চঞ্চল।—কাজেই চিন্তা, কাজেই আকুল।

উষাদূত কুক্কুট রাত্র শেষ হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিল। পাখীরা এখনও বাসা ছাড়ে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া ডালে বসে নাই। প্রভাতী গানেও জগৎ মাতায় নাই। দয়াময়ের সত্য নাম ঘোষণা করে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া কেবল ডাকিতেছে। মিসেস্ কেনী মোরগের ডাকের দিকেই মন দিয়াছেন; এক ডাক, ক্রমে তিন চারি ডাক শুনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও এক প্রকার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এরূপ শব্দ আর একদিন তিনি শুনিয়াছিলেন। সেই ডাক, সেই ভীষণ রব। শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী, ক্রমেই বেশী আতঙ্ক। ব্যস্ত ভাবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কক্ষের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও অৰ্দ্ধ নিদ্রিত ভাবে ছিলেন। মিসেস্ কেনীর গলার স্বর শুনিয়া পালঙ্গ হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি"?

পাঠক! এইস্থানে লিখকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। অস্বাভাবিক দোষের পোষকতা হেতু লিখক দোষী, তাহাতেই ক্ষমা প্রার্থনা। মিসেস্ কেনী এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়ে বিলাতী, সম্মুখে বিপদ আশঙ্কা, মিসেস্ কেনী ভয়ে ভীতা ও আশঙ্কিতা। এ অবস্থায় জাতীয় ভাষাতেই কথাবলা যুক্তি সঙ্গত। আপনাদেরই অসুবিধা ও শ্রুতিকঠোর হইবে বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাতেই সে কথার ভাবার্থ আপনাদিগকে শুনাইতে হইল।

মিসেস্ কেনী বলিলেন—"শুনিতেছেন না"?

মাজিষ্ট্রেট—"কৈ আমিত কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।" মিসেস্—"ঐ শুনুন বিপক্ষদল নিকটবর্ত্তী! বাঙ্গালী বিক্রমের ঐ শব্দ! প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ ঐরূপ শব্দ করিয়াই আসিয়া থাকে। সে দিনও আসিয়াছিল।"

মাজিষ্ট্রেট—"কোন চিন্তা নাই। আপনী নিশ্চিন্ত ভাবে আপন কামরায় থাকুন। আমি নীচে যাইতেছি। গভর্ণমেন্টর রাজ্য—আমি ব্রিটিশ গবর্ণরের পক্ষের লোক। আমি থাকিতে আপনার কোন ভাবনা নাই। আপনি নির্ভয়ে উপরে থাকুন। আমি নীচে চলিলাম।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আপন পরিচ্ছদ লইয়া জোর পায়ে নীচে নামিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা বিষম বিক্রমে কালীগঙ্গার পশ্চিম পারে আসিয়াই পুনরায় ডাক ভাঙ্গিল। দারগা জমাদার সকলেই আপন আপন পোষাক লইয়া সাহেবের আদেশে কোমর বান্ধিলেন, কিন্তু ঘরের বাহির হইলেন না। কুঠীর হাতায় প্রবেশ করিলেই গ্রেপ্তার করিবেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা,—ঘটিলও তাহাই।

এখনও রাত্র প্রভাত হয় নাই, উষা দেখা দেয় নাই,—তারাদল লইয়া তারাপাতি এখনও স্বস্থানে চলিয়া যান নাই। একে একে যাইতেছেন—এখনও সম্পূর্ণরূপে চক্ষের আড়াল হন নাই।—আবার সেই হো হো শব্দ! সেই ঝ ঝ শব্দ! সেই হৃদয় কম্পিত, দেহ কম্পিত, শব্দ—ভীষণ রব মেমসাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। পশ্চিমেও ঐ শব্দ দক্ষিণেও ঐ।

রামলোচন এবারে বিশেষ জোগাড় করিয়াছেন। কুঠীর পশ্চিম এবং দক্ষিণ উভয় দিক হইতে কুঠী আক্রমণের জোগাড়। মিসেস্ কেনী দুই দিকে দুই প্রকার শব্দ শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। নিমক হালাল চাকর সোনাউল্লার চক্ষে নিদ্রা নাই। কি হইল?—একি ব্যাপার? সাহেব কুঠীতে নাই, একি কাণ্ড! এই সকল ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মহা অস্থির। একবার নীচে একবার উপরে যাইতেছে। ক্রমে কুঠীর নেগাহ্‌বান সর্দ্দারগণও জাগিয়া উঠিল—ঢাল, সড়কী, লাঠী লইয়া সকলেই খাড়া হইল।—

সোনাউল্লা সিঁড়ির নিকটে মেমসাহেবকে পাইয়া বলিল, "হুজুর! মীর সাহেবের চাকর গোপাল সর্দ্দার হুজুরে সেলাম দিতে চায়।"

বোধহয় পাঠকগণের মনে নাই—মনে করিয়া দিতেছি। মীর সাহেবের আমগানের নিকট কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া যে লাঠীয়াল জোটাইতে আদেশ করিয়াছিলেন—সেই আদেশই গোপাল সর্দ্দার এক শত লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। আফিস ঘরে স্থান পাইয়াছে।—

মিসেস্ কেনী বলিলেন—"গোপাল! তুমি আমার এই ঘর রক্ষা কর। কুঠীর লাঠীয়ালেরা কুঠী রক্ষা করিবে। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালের সম্মুখীন হইয়া লাঠী মারিবে—তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

পুনরায় দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ববৎ শব্দ হইল—গোপাল বলিল—হুজুর! প্যারীসুন্দরীর লোক পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই দুই দিক হইতে নিশ্চয়ই আসিতেছে। দক্ষিণ দিকে কোন বাধা

নাই। পশ্চিমে নদী—বেশী জল—অধিক পরিমাণ পরিসর না হইলেও নদী—কিন্তু দক্ষিণে খোলা মাঠ, পূর্ব্বেও তাহাই। পূর্ব্বদিকে তত আশঙ্কা নাই। কারণ দক্ষিণ দিক হইতেই পূর্ব্ব দিকে যাইবার পথ। এক্ষণ দক্ষিণ দিক না ঠেকাইলে কুঠী রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইবে। পশ্চিমে নদী—জল কম হইলেও তত্রাচ ঐ দিকে হইতে শত্রুদল আসিতে যত বিলম্ব হইবে, দক্ষিণ দিক হইতে আসিতে তত বিলম্ব হইবে না। আমি দক্ষিণ দিকেই চলিলাম। হুজুর! আর বিলম্ব করিতে পারি না।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোপাল মেমসাহেবকে আবার সেলাম বাজাইয়া বেগে ছুটিল।

কুঠীর নিযুক্তীর লাঠীয়ালেরাও ডাক ভাঙ্গিয়া কুঠীর পশ্চিম দিকে দ্বিতল গৃহের পশ্চিম দিকে "আনি" বাঁধিয়া দাঁড়াইল। কত লোক কুঠীর উত্তর সীমায় প্রবেশ দ্বারে ঢাল, তরবার বাঁধিয়া খাড়া হইল।—এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রভাত হয় নাই। গোপাল সর্দ্দার আপন বেরাদরীদিগকে বলিল "দক্ষিণে এত আলো কিসের"—

সকলেই দেখিল অনেকের হাতেই মশাল। মশালের আলোতে আরও দেখা গেল, সড়কীর অগ্রভাগের চাকচক্য, লাঠীর দীর্ঘতা, কমরবান্ধা, মুখপাট্টা বান্ধা, বাঙ্গালার যোধ, অগণ্য লাঠীয়াল দেখিতে দেখিতে বিকট চিৎকার করিতে করিতে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে।—

কালিগঙ্গার পশ্চিম পারেও ঐরূপ আলো ঐ প্রকার বিকট রব,—মাঝে মাঝে ভয়ানক চিৎকার,—দেখিতে দেখিতে কালিগঙ্গার পশ্চিম তট আলোক মালায় পরিশোভিত হইল—জলে স্থলে জ্বলন্ত মশালের শিখা অধো ঊর্দ্ধভাবে প্রভাত বায়ুর প্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য!! সে সুদৃশ্য বেশীক্ষণ থাকিল না। ঊষাদেবী পূর্ব্বদিক হইতে দুহাতে অন্ধকার সরাইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা মার মার শব্দে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া বীরত্বের শেষ, সাহসের শেষ, কার্য্যের শেষ দেখাইয়া মহাতেজে কুঠী অভিমুখে আসিতে লাগিল।

কুঠীর সকলেই জাগিয়াছে।—মুচ্ছুদ্দী, দেওয়ান, নাএব, পেষকার, ইত্যাদি আমলাগণ, লাঠীয়ালগণের হুহুঙ্কারে ভীষণ চিৎকারে জাগিয়াছেন, কুঠীর লাঠীয়ালেরাও প্রস্তুত হইয়া উত্তর দিকে প্রবেশ দ্বারে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল। প্রায় শতাধিক লাঠীয়াল নদীর পূর্ব্বপারে দাঁড়াইয়া জলস্থ শত্রুদলের আগমনে বাধা দিতে লাগিল।

প্যারীসুন্দরীর কড়া হুকুম। কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলে বিশেষ পুরষ্কার আছে। তাহার পর এক হাজার টাকা অতিরিক্ত। যে সেই কাজ পারিবে, তাহার ভাগ্যেই হাজার—সে হাজার কাহার ভাগ্যে আছে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু আশা আছে—আমিই পাইব।

রে টাকা! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। পরের জন্য, পরের প্রয়োজনীয় মাথার জন্য জলে ঝাঁপ, সম্মুখশত্রুর অস্ত্রের মুখে বক্ষ বিস্তার, লাঠীর তলে মস্তক দান! রে টাকা! তোর জন্যই কেনী, বিলাত পরিত্যাগ। তোর জন্যই নীলের ব্যবসা। জমিদারের পত্তন। তোর জন্যই নিরীহ বঙ্গের প্রজার প্রতি অত্যাচার—পিশাচি! তোর জন্য আজ এই বাঙ্গালী

যুদ্ধ। পরিণামফল ভবিষ্যৎ গর্ভে। জয় পরাজয় অবশ্যই হইবে। পরাজয় পক্ষেও তুমি, জয় পক্ষেও তুমি। তোমারই জয়, জগতে তোমারই জয়!!

প্যারীসুন্দরীর পক্ষের লোকের পূর্ব্বেই স্থির পরামর্শ ছিল যে, পশ্চিম দক্ষিণ উভয়দিক হইতেই কুঠী আক্রমণ করিবে। করিলও তাহাই।

দক্ষিণ দিকে গোপাল—গোপালের দলের সহিত খুব চলিতেছে। স্বয়ং গোপাল সুশিক্ষিত। সঙ্গিরাও বাছা বাছা। সহজে পরাস্ত হইবার নহে। লাঠী, সড়কী সমানভাবে চলিতেছে। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা—এক পাও অগ্রে বাড়িতে পারিতেছে না। যেখানে বাধা সেইখানেই দণ্ডায়মান।

এদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ভিন্ন প্রকার কাণ্ড। একদল জল ঝাঁপাইয়া ভিজা কাপড়ে ডাঙ্গায় উঠিতে অগ্রসর হইতেছে। অপর পক্ষে উপর হইতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একশত লোকে কি করিবে? দক্ষিণে ফিরাইতে ফিরাইতে বামদিক হইতে অসংখ্য শত্রুদল কেনীর লাঠীয়ালদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। এখন তাহাদের প্রাণ যায়। আর কতক্ষণ—মাথা ভাঙ্গা, পা ভাঙ্গা, মাজা ভাঙ্গা, হাত ভাঙ্গা হইয়া পীট দেখাইল। লাঠী, সড়কী ফেলিয়া কেনীর দ্বিতল শয়ন কক্ষের দিকে ছুটিল।—ছুটিল ত ত্রাসে একেবারেই ছুটিল। কে কোন্ পথে কোথায় পালাইল তাহার খবর আর কে করে? কিন্তু সে সময় সন্ধান করিলে বাবুরচিখানায়, ঘোড়ার আস্তাবলে, নীল হাউজের মধ্যে, জাঁতঘরের জাঁতের নীচে অবশ্যই অনেককে পাওয়া যাইত। দেওয়ানজীর আদেশে আবার বেশী পরিমাণ লাঠীয়াল, কুঠীর পশ্চিমে কালিগঙ্গা তীরে ডাকে হাঁকে বিক্রমে উপস্থিত হইয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়াল প্রতি লাঠী ঝারিতে লাগিল। জল হইতে তাহারা আর ডাঙ্গায় না উঠিতে পারে। কুঠী আক্রমণ করা দূরে থাকুক কুঠীর সীমায় পা ধরিতে না পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

কার সাধ্য আজ প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণকে বাধা দেয়? কার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায়? কালিগঙ্গা জলে—লাঠীয়াল,—পূর্ব তীরে কেনীর লাঠীয়াল—পশ্চিম তীরে প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়াল, ক্রমাগত আসিয়া জুটিতেছে। আর ডাক ভাঙ্গিয়া আলী আলী শব্দ করিতে করিতে জলে পড়িতেছে। কয়জনকে কয় হাতে বাধা দিবে। মাথা ফাটিল, জলে ডুবিল, হাবুডুবু খাইয়া আবার উঠিল। একদিক এইরূপ চলিতে লাগিল, কিন্তু বামদিক হইতে জল সাঁতরাইয়া মার মার শব্দে লাঠীয়ালগণ কেনীর লাঠীয়ালদিগকে ঘিরিয়া লাঠীবাজির প্রতিশোধ আরম্ভ করিল। কুঠীর দক্ষিণ দিকেও খুব গোল।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্যারীসুন্দরীর কতক লাঠীয়াল দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া পশ্চিম, পূর্ব্ব এই দুই দিক হইতে একেবারে আক্রমণ করিবে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মীর সাহেব প্রেরিত লাঠীয়ালগণ দক্ষিণ দিক রক্ষা করিতেছে, গোপাল স্বয়ং লাঠী ধরিয়াছে।

নদীতীরে এখন আর লাঠীর ঠকাঠক শব্দ হইতেছে না।—কারণ কুঠীর লাঠীয়ালগণ বেগোছ দেখিয়া পীট্টান দিয়াছে।—আর কোন বাধা নাই। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ মার

মার শব্দে কেনীর শয়ন ঘরের সম্মুখে আঙ্গিনায় আসিয়া কেনীর নাম ধরিয়া বেজায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল।

আয় নামিয়া আয়। দালানের মাঝে কপাট দিয়া কেন? পুরুষ বাচ্চা হও—বাহিরে এসো। দেখি একবার তোমাকে। আর তুমি মনে করোনা যে দালানের কপাট এঁটে বাঁচতে পারবে? পঞ্চাশ তোড়া টাকা ছড়াইয়া দিলেও, আজ খালি হাতে যাবার লোক নাই। তোমার মাথা, হাতে হাতে সুন্দরপুর যাইবে। বাহির হও শীঘ্র বাহির হও।

মিসেস কেনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্য বুঝাইয়া শেষে বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা নাই।—ঐ লাঠীয়ালেরা আর একটু অগ্রসর হইলেই পাকড়া করিব। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।

মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে লাঠীয়ালেরা লাঠী ভাঁজাইতে ভাঁজাইতে একেবারে সিঁড়ির নিকটে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিল। এমন সময় লাল পাগড়ী বাঁধা কয়েকজন লোক বাহিরে আসিয়া "পাক্ড়ো পাক্ড়ো" শব্দ করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

লাঠীয়ালের চক্ষে লাল পাগড়ী বড়ই মারাত্মক অস্ত্র, বড়ই ভয়ের কারণ।—নাম ডাকের লাঠীয়াল হইলেও লাল পাগড়ীর নিকট মাথা হেঁট।—

লাল পাগড়ী দেখিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া যাহা দেখিল তাহাতে পূর্ব্বভাব অনেক পরিবর্তন হইল। স্পষ্ট বলিতে লাগিল। যা থাকে কপালে হইবে আগে ধর বেটাকে। এই কথা বলিয়াই আবার যেন কি মনে হইল।—পিছে হটিল। ক্রমেই পিছে হটিতে লাগিল। একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল। ওতো কেনী সাহেব নহে। আমি বেশ চিনিতে পারিয়াছি কখনই ও কেনী নহে।

সন্দেহটা শীঘ্রই মিটিয়া গেল। কারণ লাল পাগড়ীওয়ালা সেপাই সাহেবরা পাকড়ো পাকড়ো বলিয়া বেগে ছুটিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও স্বীয় দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ঐ বোল "পাকড়ো পাকড়ো" দারগা জল্‌দি পাকড়ো লোককে হাতকৌড়ি লাগাও—

লাঠীয়ালেরা বলিতে লাগিল। "আজ মারা গিয়াছি। ধরা পড়িলাম। এতদিনের পরে মারা পড়িলাম। আর দেখ কি ও কেনী নহে। আমি ভাল করিয়া চিনি ইনিই সেই মাজিষ্ট্রেট—

ইহারাও "পাকড়ো পাকড়ো" করিয়া ছুটিয়াছেন, কিন্তু একজনকেও পাকড়াতে পাচ্ছেন না। পিছে হটিয়াই নদীতীর পর্যন্ত চলিয়া গেল। লাল পাগড়ীধারী সেপাই সাহেবরা মুখে পাকড়ো পাকড়ো করিতেছেন, পাকড়া করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতেছেন কিন্তু তাহাদের লাঠীর নিকট যাইতে সাহসী হইতেছেন না।

ভাগড়া লাঠীয়ালেরা লাঠী ভাঁজিতে ভাঁজিতে জলে নামিল—সেপাই সাহেবেরা কাপড় কসিতে কসিতে "ডিঙ্গি লাও ডিঙ্গি লাও" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহারা নদী পার হইয়া কালিগঙ্গার পশ্চিম তীরে যাইয়া উঠিল। কেহ পলাইল না। পীট দেখাইয়া দৌড়িল না। সকলেই দাঁড়াইল এবং সাহেবকে বলিতে লাগিল। হুজুর! আপনি রাজা—আপনি

দেশের বাদসা। আমরা তাবেদার চাকর, গোলাম, নফর—দয়া করে আমাদিগকে মাপ করিবেন। হুজুরের সহিত আমাদের কোন কথা নাই।—

জোড় হাতে লাঠীয়ালগণ এইরূপ বলিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং দারগা জমাদার নদী পারের নৌকার উপর থাকিয়াই ঐ সেই কথা—সেই বুলি—নৌকা পশ্চিম তীরে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া সহিত পার হইয়াছেন। ঘোড়া উঠিয়াই দারগা মাহাম্মদ বক্‌সকে বলিলেন—"কি কর তোমরা কর কি? একজনকেও ধরিতে পারিলে না?"

লাঠীয়ালেরা ঐরূপ কাকুতি মিনতি করিতে করিতে ক্রমে পিছে হটিতেছে। ইঁহারাও অগ্রসর হইতেছেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া উঠাইয়া যাইতেই মাহাম্মদ বক্‌স দারগা বলিল—"হুজুর লাঠীয়াল গ্রেফতার করিতে আপনি যাইবেন না। আমরা উপস্থিত থাকিতে আগে হুজুরের যাওয়া ভাল দেখায় না। তবে যে বেটা দৌড় দিবে, তাহার পাছে পাছে ঘোড়া উঠাইবেন।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহা বিরক্ত হইয়া দারগাকে গালাগালী দিয়া বলিলেন, এত বরকন্দাজ, এত চৌকিদার, কেনীর এত লোক জন থাকিতে উহাদের একগাছা সড়কী, কি একখানা লাঠী ধরিতে পারিলে না? লাঠীয়াল গ্রেফ্‌তার করা তোমার কাজ নহে।—

লাঠীয়াল দল হইতে একজন হাত জোড় করিয়া, গলায় কাপড় বান্ধিয়া বলিতে লাগিল—"ধর্ম্মাবতার! আজ ফিরিয়া যাউন। দারগা সাহেবকেও ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন। দোহাই ধর্ম্মাবতার ফিরিয়া যাউন, একজনকেও ধরিতে পারিবেন না। আর আগে বাড়িবেন না। কেনীর কপালের ভারি জোর! হুজুরের সাহায্যে আজ বাঁচিয়াছে! হুজুর না থাকিলে এতক্ষণ তাহার মাথা সুন্দরপুর নিশ্চয়ই যাইত। ধর্ম্মাবতার। জোড় হস্তে বলিতেছি আজ ফিরিয়া যাউন। আমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দারগাসহ আজিকার মত ফিরিয়া যাউন আমরাও ফিরিয়া যাইতেছি।

সাহেব শুনিলেন না। বেশীর ভাগ, ড্যাম, শুয়ার, ডাকু ইত্যাদি বলিয়া গালাগালী দিলেন, এবং মাহাম্মদ বক্‌সকেও যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। জমাদার বরকন্দাজ কেহই বাকী রহিল না।—

মাহাম্মদ বক্‌স নিরুপায় হইয়া ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদারগণও ধর ধর রব করিতে করিতে দারগা সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—সাহেবও ত্রস্তপদে ঘোড়া চালাইলেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়াল পুনরায় বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি রাজা আমরা প্রজা, আমাদিগকে নষ্ট করিবেন না। আজ ছাড়িয়া দিন। জোড় হাতে গলায় কাপড় লইয়া বলিতেছি, আজ ফিরিয়া যাউন। আর আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন না। কিছুতেই আমাদিগকে ধরিতে পারিবেন না। আপনি সমস্ত দিন এ প্রকারে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেও ধরিতে পারিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট সাহে। সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। আর একটু ত্রস্তে যাইয়া একেবারে লাঠীয়ালদিগকে ধরিবার উপক্রম করিলেন।

লাঠীয়ালগণ মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাক ভাঙ্গিয়া তখনি আনি বাঁন্ধিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল। "ভাই সকল। আর দেখ কি? বাঁচিবার আশা ত নাই। হাতে অস্ত্র থাকিতে রাখালের হাতে ধরা পড়িব, বড়ই দুঃখের কথা! সাহেব কিছুতেই যখন শুনিতেছেন না, আমাদের কথা মানিতেছেন না। এত মিনতি, এত কাকুতি করিয়া বলিলাম, কিছুতেই যখন তাঁহার মত ফিরিল না, তখন স্ত্রীলোকের ন্যায় কান্দাকাটী করিয়া মরি কেন? ধর দারগা। ধর জমাদার বরকন্দাজ—নে মাথা, নে ঐ বেটার মাথা—একে একে দেখিয়া দেই। আয় আমাদিগকে ধরিয়া নিয়ে যা। দেখি তোদের বুকের পাটা—দেখি তোদের বুকের সাহস। আয় বেটা। কেনীর গোলাম। হারামখোর আয়। ধর দেখি কাকে ধরিবি। আয়!"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া মাহাম্মদ বক্‌সকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। "পাক্‌ড় পাক্‌ড় পাক্‌ড় ডাকু লোককে পাক্‌ড়।"

মাহাম্মদ বক্‌স সাহেবের আজ্ঞায় একটু অগ্রসর হইলেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিলেন যে, একজন লাঠিয়াল ঢাল মাথায় করিয়া রি রি শব্দ করিতে করিতে আসিয়া মাহাম্মদ বক্‌সের বক্ষে সড়কী মারিয়া পীট পার করিয়া দিল! পলক ফেলিতে ফেলিতে ৮ গাছী সড়কী মাহাম্মদ বক্‌সের বুক পেট পার হইয়া রক্ত মুখে বাহির হইল। অন্য দিকে আর একটি বরকন্দাজের মাথা লাঠির আঘাতে ফাটিয়া গেল। সাহেব সকলের পাছে, কিন্তু চক্ষু সকলের অগ্রে-চারিদিকে ঘুরিতেছে। নজল পড়িল—তিন চার গাছা সড়কী তাঁহার মস্তক বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে। সাহেব মাহাম্মদ বক্‌সের অবস্থা দেখিয়াই এক প্রকার চৈতন্য হারাইয়াছেন। কোন্ দিকে কোন্ পথে যাইবেন, পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। লাঠীয়ালের হস্তে প্রাণ যাইবে সেই ভাবনাই অধিক। সম্মুখে আর একজন বরকন্দাজ পড়িয়া গেল। সাহেব অশ্বকে সজোরে কশাঘাত করিয়া চম্পট দিলেন না—প্রস্থানও করিলেন না রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইলেন না। আত্মরক্ষা করিলেন। চক্ষের পলকে বাতাসের আগে আগে উড়িয়া বহুদূর আসিয়া পড়িলেন। জমাদার, বরকন্দাজ এবং চৌকিদারেরা লাঠীয়ালদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহারাও আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু মাহাম্মদ বক্‌সের মৃতদেহ লাঠীয়ালেরা ফেলিয়া গেল না। প্রায় পঞ্চাশ গাছা সড়কীর আগায় গাঁথিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মার মার শব্দে চলিয়া গেল। যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া গেল। দারগার লাস লইয়া চলিয়া গেল।

মাহাম্মদ বক্‌সের মৃতদেহ প্যারীসুন্দরীর ভারলের কাছারীতে লইয়া গেলে, কার্য্যকারক মহাশয় ভীত হইলেন না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন—"সর্ব্বনাশ দারগা খুন! বড় ভয়ানক কথা।"

লাঠীয়ালেরা বলিল, "দারগা খুন সহজ কথা! যে বিপাকে পড়িয়াছিলাম যে ফাঁদে আমাদিগকে আজ আপনি ফেলিয়াছিলেন, আর একটু থাকিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেই এই

অবস্থায় দেখিতে পাইতেন। কি করি প্রাণের দায় মহা দায়! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাহাতে আমরা বাঁচি তাহার উপায় করুন। মাজিষ্ট্রেটকেও তাড়াইয়াছি। দারগার দশা সাহেব স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। বাঁচিবার আশা যে আর নাই তাহা বুঝিয়াই আপাততঃ রক্ষার এক উপায় করিয়া আসিয়াছি মাত্র। আমরা বিদায় হইলাম। আর আমাদের দেখা পাইবেন না। এখন আপনাদের রক্ষার পথ আপনারা দেখুন। আমরা বিদায়। যদি প্রাণে বাঁচি, হুজুরে হাজির হইব। নতুবা এই শেষ দেখা—শেষ বিদায়। আমরা চলিলাম। এই কথা বলিয়াই লাঠীয়ালেরা ঢাল, সড়কী ফেলিয়া তখনি চলিয়া গেল। কাছারী আঙ্গিনায় দারগার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল।

কার্য্যকারক মহাশয় কি করিবেন, কোথাকার খুন কোথায় আসিয়া পড়িল। কাহার ঘাড়ে চাপিল। যাহারা খুন করিল তাহারা ত চম্পট। তাহাদের বাড়ী কোথা? কি নাম কাহারও জানা নাই। সকলেই অচেনা।

মাহাম্মদ বক্‌সের শরীর সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া চাপাই গাছি বিলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রকাণ্ড বিল—কোথায় কোন্ মাছ বা কচ্ছপের উদরে গিয়া পড়িল, কে বলিতে পারে? কা'ল মাহাম্মদ বক্‌স পাবনা—আজ মৎস্য কচ্ছপের উদরে!!

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুঠিতে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রার কোলে অচেতন হন নাই। ভাবটা অচেতনের। মনে মনে নানা চিন্তা, মাহাম্মদ বক্‌সের পরিণাম দশা—পরাধীনতার প্রত্যক্ষ প্রতিফল! চাকুরীর দায়ে প্রাণ বিয়োগ—কি উপায়ে অপরাধীগণকে ধৃত করিয়া শাস্তি দিবেন, বোধ হয় এই সকল চিন্তাই চক্ষু বুজিয়া করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতি সঙ্গীয় লোকজন আসিয়া জুটিল।—সাহেব সংবাদ পাইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। এবং জমাদারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "মাহাম্মদ বক্‌সের লাস কি হইল?"

জমাদার উত্তর করিল—ধর্ম্মাবতার! লাস শূন্যে শূন্যে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারি নাই। নিজের প্রাণ লইয়াই পালাইয়াছি। লাসের শেষ অবস্থা কিছুই জানিতে পারি নাই।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চিন্তা করিয়া কুঠির হেফাজতে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতিকে মতাইন রাখিয়া, তখনি জিলায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। না—তখনই চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

হাত বাক্‌স

যাহার জন্য চিন্তা—দিন রাত চিন্তা, কত কৌশল, কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অধিকন্তু আরও শ্রম চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা আর কিছুই করিতে হইল না। নিষ্কণ্টকে, সমুদায় দলীল দস্তাবেজ সা গোলামের হস্তগত হইল। খুসীর সীমা নাই। অছিয়াতনামা

যে বাক্‌সে ছিল, সে বাক্সটীও চুরি করিয়াছেন। কিন্তু সুযোগ ও সময়াভাবে বাক্সটি খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। এখন কি প্রকারে যথার্ত্ত অছিয়তনামার লিখিত সর্ত্ত ও নির্দ্দিষ্ট অংশ বদলাইয়া জাল অছিয়তনামা প্রস্তুত করিবেন, এই চিন্তাই সা গোলামের মাথা ঘুরিতে লাগিল। রাত্রে দেবীপ্রসাদের বাটিতে যাইবেন। অছিয়তনামার বাক্‌সটীও সঙ্গে করিয়া লইয়া দেবীপ্রসাদের সম্মুখে খুলিয়া অছিয়তনামা হইতে কোন্ কোন্ কথা পরিবর্তন করিয়া কি কি কথা বসাইতে হইবে তাহার পরামর্শ যুক্তি অদ্যই করিবেন। অছিয়তনামা দুরস্ত না হওয়া পর্যন্ত যেভাবে আছেন সেই ভাবেই থাকিবেন। কার্য্য সিদ্ধি হইলে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, ইহাও মনে মনে স্থির করিয়াছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা—ক্রমেই ঘোর অন্ধকার—রজনী সমাগতা। কাহাকে হাঁসাইতে কাহাকে কান্দাইতে রজনী সমাগতা। সংসারী মাত্রই সংসারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম, আরাম, ঈশ্বরে মননিবেস করিলেন। মীর সাহেবও সেতার, তবলা এবং প্রিয় মসাহেব বসীরুদ্দীনকে লইয়া গান বাদ্য, হাসিতামাসায় মন দিলেন। সা গোলাম আহার করিয়া সকালে সকালেই নিদ্রার ভান করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। বাড়ীর অন্যলোক ক্রমে আহারাদী করিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানে চলিয়া গেলে—সা গোলাম উঠিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, "আমি বিশেষ আবশ্যক জন্য বাহিরে যাইতেছি। আসিতে বিলম্ব হইবে।"

সা গোলামের স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই স্বামীর চরিত্র বিশেষরূপে জানিতেন। কোন উত্তর করিলেন না।

সা গোলাম বিশেষ গোপনে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। চুরি করা হাত বাক্সটীও সঙ্গে লইলেন। বাটীর বাহির হইতেই হাঁচি টিকটিকি সকলি পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি সেদিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। মাথায় চাদর জড়াইয়া, বাক্স বগলে দাবিয়া দেবীপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

দেবীপ্রসাদের চরিত্র ভাল ছিল না। সে সময় কেন অতি বৃদ্ধাবস্থাতেও নিশাচরের ন্যায় বাহির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সময়ে অনেক স্থানে "প্রহারেণ ধনন্‌জয়" সহ্য করিতে হইয়াছিল, তত্রাচ স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। দেবী—দিব্বি সাজগোজ করিয়া বাহির হইতেছেন, এমন সময় সা গোলামকে দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। এবং মায়া জানাইয়া ভালবাসা দেখাইয়া বলিলেন—"আপনি কি পাগল হইয়াছেন? একা একা এত রাত্রে বাটীর বাহির হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই? আপনার পায় পায় শত্রু, সর্বদা সাবধান সতর্ক থাকা চাই। রাত দুপুর সময় একা, কি আশ্চর্য্য।"

সা গোলাম বলিলেন—"কি করি, যে বোঝা মাথায় করিয়াছি, ভালয় ভালয় না নামাইতে পারিলে হয়। কিছুতেই মনের শান্তি নাই।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"নূতন আর কি কথা আছে যে, এত রাত্রে?"

"না থাকিলে কি আসিয়াছি? এই দেখুন সেই অছিয়তনামার বাক্স। যদি খুলিতে পারি

খুলিব না হয় ভাঙ্গিব। অছিয়তনামা দেখিয়া কোথায় কি পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা আজ রাত্রেই আপনাকে বলিতে হইবে।"

..."এ বাক্স কাহার? এত মীর সাহেবের বাক্স নয়।"

"বলেন কি? সেই বাক্স। আমি বহু পরিশ্রমে এই বাক্স হাতে পাইয়াছি।"

"তা যাই হউক, না খুলিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। এই দেখুন না ইহার নীচে রুই ধরা। মীর সাহেব এই বাক্সে অছিয়তনামা রাখিয়াছেন, আমার ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

"এখনি দেখিবেন। এখনি সন্দেহ দূর হইবে। এই দেখুন আমি আপনার সম্মুখেই খুলিতেছি।"

এক গোচ্ছা চাবি বাহির করিয়া সা গোলাম কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। এসকল চাবি অনেকবার লাগাইয়া দেখিয়াছেন। তত্রাচ দেবীপ্রসাদের সম্মুখে এক এক করিয়া লাগাইয়া দেখিলেন। একটীও লাগিল না। বাক্সও খুলিল না। শেষে বাক্স ভাঙ্গাই স্থির হইল। দেবীপ্রসাদ একখানি "দা" আনিয়া দিলেন। সা গোলাম অতি কষ্টে বাক্সটী ভাঙ্গিয়া যাহা দেখিলেন, এবং যাহা পাইলেন, তাহাতে আর মুখে কথা সরিল না। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেবীপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সাহেব। দেখিলেন! বাক্সে কি আছে। "কাগজপত্রের নামও নাই। একদলা রুইর মাটি। বোধ হয় বহুকালের পুরাতন কোন কাগজপত্র রুইতে খাইয়া একেবারে মাটি করিয়াছে। বাক্সের তলা উল্টাইয়া মাটির দলা ফেলিয়া দিলেন। তলাতেও স্থানে স্থানে ছিদ্র। সা গোলামের মুখের ভাব এবং আকৃতিতে বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি এ জগতে নাই দেহটা যেন অকারণে পড়িয়া আছে। এক প্রকার সংজ্ঞাহীন—কত কষ্ট, কত পরিশ্রমে, যে চুরি করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। এমন সাংঘাতিক বেদনা তাঁহার জীবনে অনুভব করেন নাই।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"আর চিন্তা করিয়া কি করিবেন এবারেও ঠকিয়াছেন। সন্ধানী যথার্থ সন্ধান দিতে পারেন নাই।"

"কিসে যে কি হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? যে এই বাক্সের সন্ধান দিয়াছিল, সে মিছে বলিবার লোক নয়।"

"সন্ধানীর দোষ না হইতে পারে, আপনিই আন্ধারে ভুল করিয়াছেন। সোণা ধরিতে ছাই ধরিয়াছেন।

সা গোলাম অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক হইল। বোধ হয় আমিই ভুল করিয়াছি। যাহা হউক রাত্রও অধিক হইয়াছে, আজকার মত বিদায় হই।

এই বলিয়া সা গোলাম যতনের ধন বাক্সটী বগলে করিয়া উঠিলেন। দেবীপ্রসাদও রক্ষা পাইলেন। তাঁহার প্রাণে ভরসার জল গড়াইতে লাগিল। সা গোলামের প্রস্থান তাঁহার গমন—

সা গোলাম ভাবিতেভাবিতে যাইতেছেন। সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিকটেই গৌরীনদী, গৌরীর স্রোত অবিরত বেগে কুমারখালির দিকে যাইতেছে। নদীতটে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বাক্সটী গোপনে লইয়া আসিয়াছি—আবার এ ভাঙ্গা বাক্স ফিরাইয়া লইয়া কি করিব। এই বলিয়া বাক্সটী গৌরী গর্ভে ফেলিয়া দিলেন এবং ভাবিতে ভাবিতে বাটী আসিয়া বিছানায় পড়িলেন। বালিসে মাথা দিলেন।

মীর সাহেবের আমোদ তখনও শেষ হয় নাই। বসীরুদ্দীন মাথায় পাগ বাঁধিয়া হাতে চামর ধরিয়া জারী আরম্ভ করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ
মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রা

টি, আই, কেনী মাগুরা হইতে আসিয়া কুঠীর অবস্থা সমুদায় শুনিলেন। দারগার লাস পাওয়া যায় নাই, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বুদ্ধিকে শত শত ধিক্কার দিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন—দারগার লাস ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। মোকদ্দমাটা মাটি হইয়াছে। যাহা হউক কিছু দিনের জন্য প্যারীসুন্দরী মাথা নোয়াইয়া থাকিবেন। কুঠী লুটের মোকদ্দমা এ পর্যন্ত শেষ হয় নাই। তাহার পর আবার এই ঘটনা। এ মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণের তত আবশ্যক হইবে না। স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী। প্যারীসুন্দরীকে জব্দ করিতে আর বেশী চেষ্টা করিতে হইবে না। কোম্পানী বাহাদুরই এখন বাদী। দারগা খুন, কম কথা নয়। মোকদ্দমার খোঁজ খবর রাখা তদন্ত করা, আসামীগণকে ধরিয়া থানাদারের হাওয়ালা করাই এখন আমাদের কার্য্য। নাএব, দেওয়ান যাহাকে যাহা বলা আবশ্যক মনে করিলেন বলিয়া "প্রাইভেট রুমে" গুপ্ত কক্ষে যাইয়া বার দিলেন। মামলা মোকদ্দমা বিষয়াদী এবং নীল, রেশমের অধিক আবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা ও মনে মনে বাদানুবাদ করিয়া যাহা স্থির করিলেন মনেই রাখিলেন। এসকল চিন্তার পর একটী বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্কের পর সাব্যস্ত হইল। মিসেস কেনীকে আপাততঃ বিলাত পাঠান কর্ত্তব্য। মেম সাহেবকে স্থানান্তর করিলে প্রধান একটী চিন্তা হইতে অবসর হওয়া যাইবে। বিশেষ—অন্য আর একটী চিন্তারও সুবিধা হইবে।

কেনী মনে মনে "মনের কথা" সুস্থির করিয়া মেম সাহেব নিকট বলিলেন। "প্যারীসুন্দরীর টাকা অনেক, জমিদারীও আমার অপেক্ষা অনেক বেশী, বুদ্ধিও বেশী, সাহসও বেশী। জমিদারের মেয়ে জমিদার, তাহার কথাই স্বতন্ত্র। সে যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। দুবার তিনবার ঠকিলে কি ফেল করিলে, পারিয়া না উঠিলে যে, কখনই পারিবে না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।"

সেখানে অন্য লোক আর কেহই ছিল না। তত্রাচ কেনী, মিসেস কেনীর সহিত অতি মৃদু মৃদু স্বরে অনেক কথা বলিলেন। মাঝে মাঝে মেম সাহেবের চেহারায় আনন্দ আভা চমকিতে লাগিল মুখেও ফুটিল "হোম"—

"হোম" যে কি জিনিস, "হোম" কথাটী যে কত মিষ্টী তাহা বিলাতী অন্তর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধ্য নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের হোম্‌কে আমরা কেবল পদতলেই দলিল করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে হয় তাহা জানি না। এই হোমেই যে, স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়, তাহাও স্বীকার করি না। এই ঝাড়, জঙ্গল, জলে ডোবা, সেঁত্‌সেঁতে, কুঁড়েঘর শোভিত হোমই যে, পবিত্র স্বর্গ হইতে গরিয়সী, তাহাই বা কয়জনে মনে করি। সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতিরও "হোম" মায়া আছে। হোমের প্রতি যত্ন আছে, আদরও আছে। বিলাতি হৃদয়ে থাকিবারই ত কথা। আমরা নিমকহারাম, আমরা কৃতঘ্ন, তাহাতেই এই দশা। আমরা বাঙ্গালী প্রায়ই মা বাপের মর্য্যাদা বুঝি না। সুপুত্র বলিয়াই হোমের কুচ্ছা, হোমের গ্লানী, হোমটা একটা "নেষ্টী প্লেস, বাঙ্গলাদেশ পায়খানার সামিল" অধঃপাতে যাক—আমরা স্বাধীন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ যথেচ্ছারূপ ব্যবহার করিতে পারি, আমরা স্বাধীন। আমাদের মন স্বাধীন। হোমের আবার নির্দ্দিষ্ট কি? জগৎময় হোম। সমুদয় জগৎ আমাদের হোম। কনষ্টান্টিনোপল কি আমাদের নহে? সেন্টপিটার্সবর্গ কি আমাদের হোম নহে? হোম কি আমাদের হোম নহে? যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম্‌।

এতে লাক্‌ কথার এক কথা, একথার উত্তর নাই। আমি উদাসীন পথিক। মনের কথা বলিতেছি।—এ জগতে আমার কেহই নাই, সে কথা আগেই বলিয়াছি। ধরিবার লক্ষ্য নাই, পা রাখিবার স্থান নাই। ইহার পরেও সময় সময় অনেকের নিকট পাগল সাব্যস্ত হইতে হয়। এ অবস্থাতেও পাঠক! হোমের জন্য পথিকের প্রাণ কাঁদে।

অনেক বাজে কথা বলা হইল। মিসেস কেনী হোমের নামেই গলিয়া পড়িলেন। তবে এখানেও অনেক সুখ, সেখানেও অনেক সুখ। বেশীর ভাগ জন্মভূমি।

হোমের আলাপেই মিসেস কেনী গলিয়া পড়িলেন। প্রাণ খুলিয়া স্বামীমুখ চুম্বন করিলেন। বিশেষ আদরে প্রতিদানও পাইলেন। বিলাত যাওয়া স্থির হইল। মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রার কথা পাকা হইয়া দাঁড়াইল।

প্রভাতে সকলেই শুনিল মেম সাহেব বিলাত যাইতেছেন। বজরার দাঁড়ী, মাঝি, সাজ সরঞ্জামসকল সংগ্রহ হইল। পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল। মিসেস কেনী বেলা ১২ টার সময় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতা যাইয়া বজরা বিদায় দিবেন জাহাজে চাপিবেন।

মেম সাহেব বিলাত যাত্রা করিলেন টি. আই. কেনী তিন দিবস শয়ন গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন না। কোন কাজ কর্ম্মও দেখিলেন না।

মামলা মোকদ্দমার কথাও কিছু শুনিলেন না। সন্ধান নিলেই জানা যায় যে, সাহেব

"সোয়ার কামরায়।" কার্য্যকারকগণ অনেক তর্ক বিতর্কের পর সাব্যস্ত করিলেন, মেম সাহেব বিলাত গিয়াছেন, তাহাতেই সাহেবের মন ভাল নাই।—কাজ কামের দিকে তত মন নাই।

সাহেবের মন ভালই থাক আর যাহাই থাক, তিন দিন তিন রাত্রের পর কেনী সংসারিক কার্যে হাত দিলেন। কুঠীর লোকে দেখিল সাহেব নীচে নামিয়া ফুলবাগানদিক যাইয়া পাচারী করিয়া বেড়াইতেছেন। "পাইপ" চলিতেছে।

কেনী শুধু পাচারী করিতেছেন না। মনের কথা মনেই তুলিতেছেন, মনেই আলোচনা, মনে মনেই মীমাংসা করিতেছেন।

প্যারীসুন্দরীর সহিত মোকদ্দমা চলিল। মোকদ্দমার ফলাফল দেখিয়া পরে অন্য কথা। পাংশার ভৈরব বাবু, নলডাঙ্গার রাজা, নড়ালের রতন রায়, এই তিনটীই এখন দেখিতেছি। কিন্তু ইহাদের সহিত লাঠালাঠী, মারামারী নাই। আইন আদালতের মার পেঁচে আমাকে জব্দ করিবেন, তারই জোগাড় হইয়াছে। চলুক—কিন্তু মারামারী, লাঠালাঠী না হইলে মনে স্ফূর্ত্তি হয় না। আমি প্রস্তুত, কিন্তু তাহারা কেহই ওপথে যাইতে চাহে না।

ভৈরব বাবু ভারী চতুর! কিছুতেই দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভেড়ে না। বাবুকে বশে আনার জন্য এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। নিকটে নয় কি করি। আচ্ছা এবারে একহাত বাবুর সহিত খেলাইতে হইবে।

কেনী পাচারী করিতেছেন। একবার দক্ষিণমুখী হইতেছেন, আবার ফিরিয়া উত্তর দিকে যাইতেছেন। একবার দেখিলেন, হরনাথ কতকগুলি কাগজপত্র হস্তে করিয়া বাগানের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সাহেবের নজর পড়িতেই হরনাথ প্রায় মাটি পর্য্যন্ত মাথা নোওয়াইয়া সেলাম বাজাইলেন। কেনী ইঙ্গিতে হরনাথকে ডাকিলেন। হরনাথ বাগানের মধ্যে আসিয়া পুনরায় দস্তুরমত সেলাম বাজাইয়া খাড়া হইলেন। কথা চলিল—

মোকদ্দমার কথা—খুনী মোকদ্দমার কথা, লুটের মোকদ্দমার কথা, রাজার কথা, নড়াইলের কথা, নানা কথা চলিতে লাগিল। হরনাথ সাহেবের পিছে পিছে হাঁটিতে লাগিলেন। তাহার হাওয়া খাওয়া—ইহার প্রাণে মরা। পাঠক! আমরা নিৰ্জ্জীব বাঙ্গালী, হাওয়া খাইতে ভালবাসি না। ঘরে বসিয়া কেবল বাতাস খাইতে বড়ই ভালবাসি। হরনাথের গা দিয়া ঘাম ছুটিল। কেনী একটী কথায় রাগিয়া দাঁড়াইলেন। হরনাথ রক্ষা পাইল।

কেনী বলিতে লাগিলেন—"আমি ভয় করি না—আমি তোমার বাঙ্গালার সকল ভেদ বুঝিয়াছি। বাঙ্গালার—সাহস, বল, বিক্রম সকলি জানিয়াছি। বাবুকে একবার দেখা চাই। তোমরা আমাকে এইমাত্র খবর দিবে যে, অমুক তারিখে ভৈরব বাবুর জমিদারীর সদর খাজনা অমুক পথে যশোহর রওয়ানা হইল। আর আমি কিছুই চাই না। এই খবরটী চাই মাত্র।"

হরনাথ যে আজ্ঞা, যে হুকুম হুজুরের, আবার সেলাম বাজাইয়া বাগানের বাহির হইলেন। সাহেবও শয়ন কক্ষে ঢুকিলেন।

পাঠক বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। এ কথার বান্ধুনী, মিল গরমিলের দিকে আদৌ লক্ষ্যই নাই। মনের কথা, তায় আবার কানে শোনা। সে শোনাও সেই ছোট বেলায়। অসংলগ্ন, ভুল ভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব। যেখানে সন্দেহ, যেখানে গরমিল বোধ করেন, দয়া করিয়া নিজগুণে সংশোধন ও সংলগ্ন করিয়া লইবেন। মনে হয়?—পোষা পাখীর কথা মনে হয়? জকি গাড়ওয়ানের পোষা পাখী। বুলি ধরিয়াছে, বেশ কথা কয়—মনে হয়? কেনী যে কথাটা শেষে বলিয়াছিলেন মনে আছে? "উচিৎ মূল্য দিয়া আনিবে, সকের জিনিস জবরানে লইব না।"

পাখীটার কি হইল? জকি সম্মত হইয়া দিল—কি জবরানে আনা হইল, সে কথা এ পর্যন্ত মুখে আনি নাই। কিছু আভাষ প্রথম তরঙ্গে দিয়াছি। মার্জ্জনা করিবেন, সময় পাই নাই।

ডাকে খবর আসিল—মিসেস কেনী নির্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়া জাহাজে উঠিয়াছেন। কেনী একদিকে নিশ্চিন্ত হইলেন। মেম সাহেব ফিরিয়া আসিতে আসিতে এদিকে প্যারীসুন্দরী টিকিবেন কি না? তাহাতেই সন্দেহ। ইহাতে কার বালা কে পরায়? আর কার শাড়ী কে কে পরে?

টি. আই. কেনী নিয়মিতরূপে বিষয়াদির কার্য করেন, এবং প্রায় সকল সময়েই কুঠীতে থাকেন। ডিহি দেখিতে আর—কুঠীর বাহির হন না। আপীস দালানে বসিয়া মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ করিতে করিতে, বিষয়াদির কার্য দেখিতে দেখিতে হঠাৎ উঠিয়া জান। কিছুক্ষণ শয়ন ঘরে থাকিয়া আবার আপীস ঘরে আইসেন। দশ পোনের মিনিট অতীত না হইতেই পুনরায় শয়ন কক্ষের দিকে ছুটিয়া যান। কেন জান? তিনিই জানেন। কেন তাহার মন এত উতালা তিনিই জানেন।

অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? প্রভুর অনুগ্রহ পাত্র হইলে, তাহার অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? জকি গাড়ী চালাইত, কুলি, মজুরের সঙ্গে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটিত এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে। জকি এখন আর গাড়ওয়ান নাই, এক ময়নাই জকির সকল দুঃখ ঘুচাইয়াছে।

মিসেস কেনী কুঠীতে থাকিতে জকিকে কেহ কুঠির হাতায় দেখে নাই সেই গাড়ীর আড্ডায়।

এখন দিন দিন জকির উন্নতি—কপালের জোরে ক্রমে ক্রমে সাহেবের ঘরের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সকলেই শুনিল, জানিল এবং দেখিল, সাহেব জকিকে বড়ই ভালবাসেন। সাহেবের ইস্তক রন্ধনশালা, লাগাএদ শয়ন কক্ষ, সকল স্থানেই জকির সমান অধিকার। সোনাউল্লী যে এত বিশ্বাসী খানসামা ও পুরাতন চাকর, সময়ে সময়ে জকি তাহাকেও কটু কথা কহিতে ক্রটি করে না। সাহেবের পেয়ারা চাকর বলিয়া সোনাউল্লা কিছুই বলে

না। ক্রমে জকির নাম জাঁকিয়া গেল। যে জকিকে কুঠীর আমীন, তাগাদগীর, প্যাদা, পাইক যাইচ্ছা তাই বলিয়াছে, এখন বড় বড় আমলা—বড় বড় লোক জকির নামে চম্‌কিয়া উঠেন। যে দেখে, জকির সহিত যাহার দেখা হয়, সেই আদর করে, ভালবাসে।—কেমন আছ জিজ্ঞাসা করে—মায়া দেখায়, মমতা জানায়। সময় সময় কার্য্য উদ্ধারের জন্য জকিকে কেহ কেহ সেলামীও দেয়।

জকি সাহেবের নিকট বলিতে পারুক বা না পারুক, সাহেবের অনুগ্রহও ভালবাসা সকলেরই বিশ্বাস যে, জকি যাহা বলে, সাহেব তাহাই শুনেন। অল্প দিনের মধ্যে জকির কপাল একেবারে ফিরিয়া গেল। জকি যাহা বলিত প্রায়ই তাহা হইত। জকি বলিল, উহার চাকুরী যাইবে, রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে সাহেবের অর্ডার পাশ হইল। নির্দ্দোষী বেচারীর চাকরী গেল। জকি বলিল আজ ঐ আমীন বেটার পীঠের চামড়া উঠাইব, সূর্য্য ডুবিতে না ডুবিতে আমীন মহাশয়ের পীঠে চাবুক পড়িল, চামড়াও উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জকির নামে অনেকেই কাঁপিতে লাগিলেন। এখন যা করে জকি।—আমীন, তাগাদগিরী, খালাসী, পাইক, বরকন্দাজ, প্যাদা, বাবরচি, খানসামা, খেদমতগার জকির জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল। জকি অনেক সময় প্রধান কার্য্যকারকদিগের প্রতিও হুকুম চালাইত। তাঁহারা মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়া জকির হুকুম তামিল করিতেন।

দিন দিন জকির অবস্থা পরিবর্তন হইতে লাগিল। বাটীতে বড় বড় ঘর উঠিল। বাঁশের খুঁটী উঠিয়া শাল কাঠের খুঁটী হইল। ভাল ভাল গরু ও ভেড়াতে গোশালা পরিপূর্ণ হইল। প্রতিবাসীরা শেষে গ্রামস্থ লোকেরা সকলেই জকিকে ভালবাসিতে লাগিল। সদাসর্ব্বদা জকির বাটীতে লোকের গতিবিধি আমোদ আহ্লাদ, লেনা দেনা, কথাবার্তা, পরামর্শ চলিতে লাগিল। যে জকি এক কাঠা ধানের জন্য মহাজন বাড়ীতে ছালা পাতিয়াছে। আজ মনিবের ভালবাসায়, গোলা ভরা ধান, বাক্স ভরা টাকা। কত লোককে ধান কর্জ্জ দেয়, টাকা কর্জ্জ দেয়। জকি এখন মহাজন। ইচ্ছাধীন চাকুরী। পরিবার মধ্যে এক স্ত্রী। যে কারণেই হউক জকি আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল।

জকির ময়না বেশ কথা কয়। মানুষের মত কথা কয়—কান পাতিয়া কথা শুনে। কথার উত্তর করে। এ বিবাহের কথা শুনিয়া কিছুই বলিল না।

জকির বিবাহের সম্পূর্ণ ব্যয় সাহেব দিবেন। সাহেবই ভালবাসিয়া আবার বিবাহ দিতেছেন, কুঠীর লোকে এই বলিতে লাগিল। এক বলিতে দশজনে রাজি হইল। সতীনের ঘর বলিয়া কেহই কোন আপত্তি করিল না। সপ্তাহ মধ্যে বাজি বাজনায়, জকির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের খাওয়া দাওয়া বিদায়, ইত্যাদি গোলযোগ মিটিয়া গেল। একদিন টি. আই. কেনী জকিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যে আজ হইতে তোমার অন্য কাজ আর কিছুই করিতে হইবে না। কেবল আমার হাতি, ঘোড়া, গরু ইত্যাদির তদারক করিবে, আর ইহাদের দানার বন্দবস্ত তোমার হাতে থাকিবে। সুবিধা মত প্রতিদিন কোন সময়ে একবার কুঠীতে আসিয়া হিসাব মত দানা বাহির করিয়া মাহুত ও সইসের জেম্বা করিয়া

দিয়া যাইবে। আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না। সেই হইতে জকি দুই এক দিন পর কি সপ্তাহে একদিন কুঠীতে যাইয়া দানা বাহির করিয়া দিয়া আসিত। আর কোন সময় কুঠীতে যাইত কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না। একদিন জকি কুঠী হইতে আসিতেছে, বাটীর নিকটেই জকির খুড়ত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল, তাহার নাম কি আমরা জানিতে পারি নাই, পূর্ব্বে এক বাড়ীতেই ছিল, এক্ষণে সুন্দরপুর প্যারীসুন্দরীর এলাকায় বাড়ী করিয়াছে। জকি বহুদিনের পর ভাইকে পাইয়া খুব খুশী হইল। বাটীতে লইয়া গিয়া হাত, পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। ভাল একটি মাদুর ও পরিষ্কার একখানি কাঁথা ও একটি বালিশ আনিয়া বাহির বাটীর ঘরে বিছানা করিয়া দিল। জকির বাটীতে ডাবাহুকার অভাব ছিল না। তামাক সাজিয়া একটা নিজে খাইতে খাইতে আসিল, আর একটি ভাইয়ের হাতে দিয়া দুই ভাইতে কথাবার্তা চলিল। অন্যান্য কৃষক হইতে জকির অবস্থার উন্নতির সহিত খাদ্যাখাদ্যেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। ঘরে খাদ্য সামগ্রীর অভাব নাই—সকল সময় খাজা, বাতাসা, চিড়ে, মুড়খী, গুড়, দুধ সকলি থাকিত। ঐ সকল জিনিসে ভাইকে জল খাওয়াইয়া সন্ধ্যার পরেই ভাতের জোগাড় করা হইল। দুই ভাই একত্রে আহার করিয়া অনেক কথাবার্তার পর, আগন্তুক ভ্রাতা প্রত্যুষেই বাড়ী যাইবে বলিয়া বিদায় হইয়া রহিল।

দুইদিন পর জকি ছোট স্ত্রীকে বাটীর কাজকর্মের কথা বলিয়া শেষে বলিল যে, আমি ভাইয়ের বাড়ীতে সুন্দরপুর যাইতেছি। বাড়ীর কাজকর্ম্ম দেখিয়া করিও। ভাইয়ের বাড়ী আজ যাইতেছি, ২/১ দিন বিলম্ব হইতে পারে। এই কথা—ছাতা, লাঠী লইয়া, রঙ্গান গামছাখানা কাঁধে করিয়া বাটীর বাহির হইল। দুই দিন চলিয়া যায়, জকির খোঁজ খবর নাই! কুঠীর ঘোড়া গরুর দানা বন্ধ। কারণ জকির হাতেই দানার ঘরের চাবি। জকির বাটী পর্যন্ত খোঁজ করা হইয়াছে। জকির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুঠীর লোকে জকির বাহির বাটী হইতেই জিজ্ঞাসা করে। কেহ বাটীর মধ্যে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হয় না। সর্দ্দার, পাইক, মৃধা, বরকন্দাজ, প্রভৃতিরা অন্যান্য বাজে চাকরের বাটীর উপর জোর জবরানে চলাফেরা করে—জকির বাটীর উপর গিয়া বড় করিয়া কথা কহিতে কাহারও সাহস হয় না। জকি বাটীতে নাই এ স্থির করিয়া শেষে সাহেব পর্যন্ত খবর হইল যে, জকি বাড়ীতে নাই। কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। দুই দিন যায় কোন খবর নাই। গুদাম বন্ধ, দানা বাহির করার কোন উপায় নাই। ঘোড়া গরু মারা পড়িল।

টি, আই, কেনী বলিলেন—জকি যেখানে গিয়াছে আমি জানি, গুদামের চাবি বোধ হয় তাহার বাড়ীতেই রাখিয়া গিয়াছে। চাবি আনিয়া গুদাম খুলিয়া দেও। জকিকে জব্দ করিবার আশায় যাহারা সাহেব পর্যন্ত এতলা দিয়াছিল তাহারা বড়ই অপ্রস্তুত হইল।

পরদিন জকি বাটী আসিয়া বাটীর কাজ কাম দেখিয়া কুঠীতে যাইয়া আপন কর্তব্য কার্য্য করিয়া আসিল। জকির বিরুদ্ধে সাহেব নিকট কোন কথা কহিতে কেহই আর কোনদিন সাহসী হইল না।

জকি তিন চারদিন বাটীতে থাকিয়া কোথায় চলিয়া যায়। সুন্দরপুর হইতে কুটুম্ব স্বজনও

প্রায়ই আসা যাওয়া করে। গোপনে গোপনে অনেক পরামর্শও হয়। এই সকল দেখিয়া ময়না ভারি চটিয়াছে। লোকজন চলিয়া গেলে মিষ্টি মিষ্টি রাগের সহিত বলিতে লাগিল। "এত ঘন ঘন ভায়ের বাড়ীতে যাওয়া ভাল হইতেছে না। মারা পড়িবে।" তাহাতে জকি যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া ময়না মাথা হেট করিয়া রহিল।

একাদশ তরঙ্গ*

ভয়ানক ব্যাধি

রাত্র জাগরণেই হউক কি অন্য কোন অনিয়মেই হউক মীর সাহেব পীড়িত হইলেন। পীড়ার কএক দিন পূর্ব্বে রাত্রে দুগ্ধ পান করিতে দুগ্ধের স্বাদ বিস্বাদ বোধে সে দুগ্ধ পান না করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই হইতে শরীর অসুস্থ, ক্রমে জ্বর, ভয়ানক জ্বর—একেবারে চৈতন্যরহিত। মীরসাহেব বাহির দালানের কুঠরীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন। মাঙ্গন, বিনোদ বিশ্বাসী চাকর, তাহারা নিকটে আসেন না। একমাত্র গরিবুল্লা। যথাসাধ্য মনিবের সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। বাড়ী পোরা লোকজন, কেহই তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। কি মনে করিয়া যে, মনিবের পীড়ার সময় সেবা শুশ্রূষা করিতে নারাজ, তাহা তাহারাই জানে। একা গরিবুল্লা কি করিবে? বাটীর অন্যান্য লোকজন স্বচ্ছন্দে "খানাপিনা" করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। বাড়ীতে যে একটি পিড়ীত[১] লোক আছে—সে কথা কাহারও মনে আছে ভাবে এরূপও বোধ হয় না। কেবল বসিরদ্দীন সদা সর্ব্বদা দেখাশুনা করে। সাগোলাম বসিরুদ্দীনকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। বসিরদ্দীন দিকে নজর পড়িলেই মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে ঘুরিয়া বসেন। বাটীর কর্ত্তা ব্যক্তির কুদৃষ্টি হইলে কয়দিন কে টিকিতে পারে? বিশেষ বসিরদ্দীন যাঁহার বলে সাগোলামকে গ্রাহ্য করিতেন না, সে দাঁত কিচিমিচির ভয় করিতেন না, তিনি শয্যাগত পিড়ীত। উঠিবার শক্তি নাই, বসিবার শক্তি নাই, কথা বলিবার শক্তি নাই, তাঁর কথা কে শুনে। বিশেষ নূতন আমল প'লে, পুরাতনে প্রায়ই লোকের ঘৃণা হয়। কোন দোষ না থাকিলেও, একটু বেশী পরিমাণ আদর পাবার লোভে, সাচা, মিছা, হক, নাহক সাত কথা বলিয়া মন হইতে তফাত করিতে চেষ্টা করে। এ গুণটা প্রায়ই মোপ্তা খোড়া জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং বাড়ীর চাকর চাকরাণী ও দাস দাসীর হইয়া থাকে।

দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি, কষ্টের একশেষ। রোগীর পথ্য, সেবা শুশ্রূষার প্রতি কাহারও

---

* মূলগ্রন্থে পঞ্চদশ তরঙ্গের পর আবার একাদশ তরঙ্গ থেকে তরঙ্গ গণনা করা হয়েছে। এটি সম্ভবত ছাপার ভুলের জন্যই ঘটেছে।

১। পীড়িত

দৃষ্টি নাই। কে প্রস্তুত করে, কে চেষ্টা করে, কেইবা যত্ন করে, কেইবা কার কথা শুনে? সাগোলাম মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু রোগীর আপাদমস্তক এক ধ্যানে চক্ষু পাতিয়া দেখিতেন। নাড়ী জ্ঞান ছিল কিনা জানি না। সাগোলাম মনের ব্যাগ্রতায় কোন কোন দিন শ্বশুরের হাত ধরিয়া নাড়ীর গতি দেখিতেন।

টি, আই, কেনীও শুনিতে পাইলেন যে, মীর সাহেব অত্যন্ত পীড়িত। হাতীতে চাপিয়া, মীর সাহেবকে তখনই দেখিতে আসিলেন। সেদিন মীর সাহেব একটু ভাল। কেনী আসিয়া দেখিলেন, সাগোলাম একজন কবিরাজের ঔষধ মীর সাহেবকে খাওয়াইতে জিদ করিতেছে—মীর সাহেব খাইবেন না, কবিরাজের ঔষধ খাইবেন না বলিয়া ঔষধ খাইতে অস্বীকার হইতেছেন। সাগোলাম কত অনুনয় বিনয় করিতেছেন। মীর সাহেবের পীড়া শীঘ্র শীঘ্র আরাম হওয়ার জন্য সাগোলাম বড়ই ব্যস্ত। টি, আই, কেনী চিকিৎসা শাস্ত্র ভালই জানিতেন। নানা প্রকারের ঔষধ তাঁহার কুঠীতে থাকিত। কোন পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ চাহিলে বিনা মূল্যে দান করিতেন। কেনী মীর সাহেবের হাব ভাব, চক্ষু দেখিয়া কি পীড়া, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পীড়ার প্রথম অবস্থা এবং এ পর্য্যন্ত কি কি ঘটিয়াছে কি প্রকার চিকিৎসা হইতেছে, সমুদয় বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত শুনিলেন। কেনীর মুখের ভাব দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বুঝিল যে, মীর সাহেবের পীড়ার ভালরূপ চিকিৎসা হইতেছে না। ইহা ভিন্ন মানুষে আর কি বুঝিবে। কেনী অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাগোলামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে মীর সাহেবকে বলিলেন—আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার ঔষধ করিব। কুঠীতে গিয়াই আপনার ঔষধ পাঠাইব। আমি জ্বরের কথা শুনিয়া কএকটী ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি আপনার এ জ্বর ভয়ানক জ্বর, বিষাক্ত জ্বর, আর ভয় নাই। আরাম পাইবেন। আজ যে ঔষধ পাঠাইব, তাহা খাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার ঔষধে আরাম পাইবেন কি না। আমি আপনাকে বার বার নিষেধ করিতেছি, কাহারও ঔষধ খাইবেন না। আমি এখনি ঔষধ পাঠাইয়া দিব। যে যে নিয়মে পান করিতে হইবে, তাহাও পত্রে লিখিয়া পাঠাইব। টি, আই, কেনী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সাগোলামের মনের আশা পূর্ণ হইল না। যে নূতন চাল চালিয়াছিলেন, তাহাতে কিস্তি মাত হইল না। কেনীর ঔষধ ভিন্ন মীর সাহেব আর কাহারও ঔষধ খাইবেন না। সাগোলাম স্বয়ং কমল কবিরাজের বাড়ীতে গিয়া যে যে ঔষধের জোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজের পুটুলীতেই রহিয়া গেল। প্রাণ বাঁচিল, টাকাও থাকিল। উপস্থিত ঘটনায় সাগোলাম মনে মনে হাসিলেন কি কান্দিলেন, তাহা তাঁহারই মনে জানে। প্রকাশ্যে সকলের নিকটেই বলিলেন—ঔষধ না খাইলে আর আমি কি করিব! কমল কবিরাজের মত কবিরাজ বোধহয় এদেশে আর নাই। তারই ঔষধে যখন তাঁর ঘৃণা, তখন আর ভরসা নাই। সাহেবের ঔষধ যত ভাল হয় দেখতে পারবেন। সাগোলাম কমল কবিরাজকে অনেক কথা কহিয়া বিদায় করিলেন। একটী টাকা দর্শনী দিলে কবিরাজ মহাশয় আর দুটী কথা বলিতেন না।

সাগোলাম শ্বশুরের খাতিরে এক মুঠো টাকা কবিরাজের হাতে দিয়া, কবিরাজ বিদায় করিলেন। ব্যবস্থা লওয়া হইল না, ঔষধও গ্রহণ করা হইল না। এক মুঠো টাকা দিয়া কবিরাজ বিদায় করিলেন।

টি, আই, কেনীর প্রদত্ত ঔষধ বসিরদ্দীন মহা যত্নে মীর সাহেবকে সেবন করাইলেন। এত দিনের পর ঔষধ সেবন মাত্রই চক্ষে নিদ্রা আসিল, ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সাগোলাম এতদিন নিশ্চিন্ত রহেন নাই। মীর সাহেবের বাক্‌স, পেটারা ও সিন্দুক মাঙ্গন, বিনোদের সাহায্যে তন্ন তন্ন করিয়াছেন, কোন স্থানেই অছিয়তনামা প্রাপ্ত হন নাই। খুঁজিতে আর বাকী নাই। শেষে মীর সাহেবের পীড়ার কিঞ্চিত উপসম হইলে, সাগোলামের মনে হইল যে, হা! এত সুযোগ পাইয়াও তাঁহার হাত বাক্‌সটী খুঁজিলাম না কেন? যদিও বাক্‌সটী মীর সাহেবের নিকটেই থাকে, চেষ্টা করিলে অবশ্যই দেখিতে পারিতাম। তাহার মধ্যে কি আছে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারিতাম। এইক্ষণে সে উপায় আর নাই। ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন। হাত বাক্‌সের কাছে যায় কে? একটী কথা—সামান্য হাত বাক্‌স মধ্যে যে ঐ মহামূল্য দলীল রাখিয়াছেন, তাহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করি।

অছিয়তনামার চিন্তাই—সাগোলামের প্রধান চিন্তা। মীর সাহেব দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। চাকরেরাও কিছু কিছু করিয়া নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ মধ্যে একেবারে নিরোগ হইয়া কার্য্যক্ষম হইলেন। কেনী প্রতিদিন মীর সাহেবের খবর লইতেন। ক্রমেই ভাল কথা ভাল খবর, একেবারে নিরোগ হইয়াছেন শুনিয়া একদিন মীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মীর সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি প্রতিদিন খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবেন, ঠাণ্ডা জিনিস খাইবেন।

কেনী পীড়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া শেষ সাগোলামের কথা তুলিলেন।

মীর সাহেব বলিলেন, "দুলা মিয়া" আজ বাটীতে নাই, চাপড়ার বিলে পাখী শিকার করিতে গিয়াছেন।

কেনী বলিলেন, আপনার জামাতা বড় চতুর। বুদ্ধিও খুব পেঁচাও। যে মানুষের ভ্রূ সর্ব্বদাই কুঞ্চিত থাকে তাহার মন সরল নহে।

মীর সাহেব বলিলেন বুদ্ধি যে খুব পেঁচাও, তাহা জানিয়াই বিষয়াদির কাজ কর্ম্ম সমুদয় তাহার হাতে দিয়াছি। বিষয়াদির চিন্তায় আর আমাকে এখন চিন্তিত হইতে হয় না। কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন। আমাকে আর কিছুই দেখিতে হয় না। খুব চতুর ছেলে। বেস সুখে আছে।

কেনী একটু হাসিয়া বলিলেন। জামাই পরের ছেলে।

মীর সাহেব বলিলেন, না না, সে পরের ছেলের মত পর নহে। আমাকে বিশেষ ভক্তি করে, পিতার ন্যায় পূজা করে, মান্য করে। আমার পীড়ার সময় নিজে কবিরাজের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া কবিরাজ আনিয়াছিল। ঔষধ খাওয়াইতেও কত যত্ন করিয়াছিল। কত অনুনয়

বিনয় করিয়াছিল। কবিরাজের ঔষধে আমার ভক্তি নাই বলিয়া খাই নাই। তত্রাচ সাগোলাম কবিরাজকে টাকা দিতে কম করে নাই।

কেনী বলিলেন। ভাল হয় সে ভাল কথা। কিন্তু হঠাৎ হাত ছাড়া করিবেন না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য করিবেন।

মীর সাহেব কেনীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার মুখে কোন কথাই আসিল না। একটু পরে বলিলেন ভাল কথা—দারগা খুনের কি হইল?

"সে মোকদ্দমায় মহা হুলস্থূল বাধিয়াছে। শেষে সে কথা বলিব। বলুন ত পাংশার* ভৈরব বাবু সম্বন্ধে কি করি। তিনি আমার সহিত সময় সময় দেখা করেন বটে, কিন্তু আসল কাজে ভিড়িতেছেন না। লোকটা ভারী চতুর বটে। আমি বাঙ্গালা দেশের অনেক লোককে দেখিলাম। অনেকের সঙ্গে বিবাদ বিষম্বাদ করিলাম। স্ত্রীলোকের মধ্যে প্যারীসুন্দরী—নাম করিতেও ভয় হয়। আর পুরুষের মধ্যে ভৈরব বাবু। ভৈরব বাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা ফসাদে অগ্রসর হইতে চাহেন না। বিষয়াদি লিখিয়া দিতেও অস্বীকার হন না। অথচ এরূপভাবে লিখিত পড়িত করিতে চাহেন যে, আমি তাঁহার একটা তহশীলদার মাত্র থাকি। বিনা ব্যয়ে খাজনার টাকা মাস মাস পান। ইহাই তাঁহার আন্তরিক ভাব। নিজের লাভ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহেন না।

"ভৈরব বাবু বড় ঘরানার বুনিয়াদি বাবু। আমাদের সহিত এত নিকট সম্বন্ধ যে, হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন প্রকার হিংসার ভাব নাই। পুরুষানুক্রমে ভ্রাতৃভাব চলিয়া আসিতেছে। জাতির বিদ্যায় মহা পণ্ডিত, ফারসী, আরবীতেও মহাবিদ্যান, সঙ্গিত বিদ্যায় এদেশে অমন গুণী লোক আর দ্বিতীয় কেহ নাই। যাহাই করুন তাঁহাকে সম্মত করিয়া করিবেন। এইটী আমার বিশেষ অনুরোধ।

তাঁহার অসম্মতিতে আমি কিছুই করিব না। কিন্তু তিনি কেমন ভৈরব বাবু আমি একবার পরীক্ষা করিব। তিনি বাঙ্গালা দেশের বুদ্ধিমান, চতুর। আমিও বিলাতী "শয়তান" দেখি তাঁহার বাঙ্গালী বুদ্ধির দৌড় কত? আমি তাঁহার সহিত বিবাদ করিব না, কেবল বুদ্ধির দৌড় দেখিব। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বুঝিব।

মীর সাহেব বলিলেন—আচ্ছা তা দেখ্‌বেন—প্যারীসুন্দরীর কি হইল?

কেনী বলিলেন হাঁ হাঁ সে কথাটা বলিতে ভুলিয়াছি। জানেন—আমরা বিলাতের লোক যতগুলি এই দেশে বাস করিতেছি, আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া মনের কথা বলিতেছি, কিন্তু আমাদের মনের নিগূঢ় তত্ত্ব—গুপ্ত কথা কখনই পাইবেন না। আপনি দেখিবেন, কালে প্যারীসুন্দরীর যথাসর্ব্বস্ব যাইবে। খুঁচি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। এ ঘটনা শীঘ্র ঘটিতেছে না। কারণ এখনও টাকার অভাব হয় নাই। ঘটিতে বিলম্ব আছে। কুঠী লুটের মোকদ্দমায় হাজিরা আসামীগণ সাতটী বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছে। দারগা খুনের মোকদ্দমায়

---

* পাংশা গ্রামের নাম।

স্বয়ং কোম্পানী বাদী। শীঘ্রই দেখিবেন সুন্দরপুরের জমিদারী খাস হইয়া কোম্পানীর হস্তগত হইয়াছে আর অধিক কি বলিব।

"আমিও একবার সৌলি* যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার এই গোলযোগে সেবারে যাইতে পারি নাই। তাহার পরই জ্বর,—জ্বর নয় বিষম জ্বর, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

"আরও কএকদিন বিলম্বে যাইবেন। শরীরটা ভাল করে সুধ্‌রে যাক, তার পর যাইবেন। আর একটী কথা—বিরক্ত হইবেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটু সাবধান সতর্কে দেখিয়া শুনিয়া খাইবেন।

এ পর্য্যন্ত বলিয়াই কেনী উঠিলেন। মীর সাহেব কেনীর সঙ্গে সঙ্গে দালানের সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিলেন। কেনী সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া অশ্বে চাপিলেন। সইস, বরকন্দাজ প্রভৃতি কেনীর সঙ্গের লোকজন মীর সাহেবকে ভক্তির সহিত সেলাম করিয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল।

দ্বাদশ তরঙ্গ

অনন্ত আকাশে ময়নাপাখী

আশাই জীবনের আশ্রয়, আশাই সংসারের মূল—আশাই মানবহৃদয়ের একমাত্র ভরসা। ভাবিতে গেলে—আশাতেই সংসার। কে না জানে মরিতে হইবে। তথাচ মরিতে অনিচ্ছা হয় কেন? মরিবার নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে কেন? আজ যদি কেহ বলে যে, কাল তোমাকে মরিতে হইবে,—আর তাহা যদি নিশ্চয় হয়, তবে কাল কেন? যখন মৃত্যুর কথা কানে প্রবেশ করে, তখনই যেন মরিয়াছি বলিয়াই বোধ হয়। মরণে ভয় করিয়াও আশার কুহকে পড়িয়া মরণ কথাটি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে করিয়াছি, জগৎ চিরস্থায়ী,—আমিও চিরস্থায়ী। এত ভ্রম হইবার কারণ কি? আর কিছুই নাই, কেবল একমাত্র আশা। আশা আমাদিগকে মাতাইয়াছে,—মজাইয়াছে। আশাই আমাদিগকে ভুলাইয়াছে।

জকির আশা কি? সে কি আশায় সুন্দরপুর গ্রামে ভ্রাতার বাড়ী যাওয়া আসা করিতেছে। গরু, লাঙ্গল, জমী, বাড়ী, ঘর, ধান, টাকা যাহা জকির আশা ছিল, সকলইত একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর কি আশা? এ ভাইত পূর্বেও ছিল। আগে এত যাওয়া আসা হয় নাই। এখন এত ঘন ঘন আসা কেন? আর একদিন ছাতী, লাঠী হাতে করিয়া জকি ভ্রাতার বাড়ী যাইতে উদ্যত হইলেই ময়না বলিল—"দেখ কুটুম্ব বাড়ীতে এত যাওয়া আসা ভাল নয়।"

জকি দাঁড়াইয়া লাঠী দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল—"একটা কথা ছিল তাহাতেই"—

"কথা থাকুক সুন্দরপুর যাওয়া আসার কথা সাহেবের কানে গেলে কি ঘটিবে? তুমি

---

* গ্রামের নাম, মীর সাহেবের ভগ্নীর বাটী—সিরাজগন্‌জের অধীন।

সাহেবের প্যারা চাকর, তুমি সাহেবের শক্রর এলাকায় কুটুম্বিতা করিতে যাও। নিশ্চয়ই জেন, সাহেবের কানে গেলে তিনি হাড়ে হাড়ে চটে যাবেন। জল, জঙ্গল, মনিব কোন কালেই আপন নহে। আবার প্যারী সুন্দরীও সাহেবের প্যারা চাকর—মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

"প্যারীসুন্দরী আমাকে কিছুই বলিবেন না। তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন।"

ময়না আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "তিনি তোমাকে ভালবাসেন? তার মানে কি! তুমি কি তাহার বাটিতে যাও নাকি?"

জকি চুপে চুপে কএকটি কথা ময়নার কানের নিকট কহিয়া আপন শয়ন গৃহ মধ্যস্থিত হাতচাঙ্গির উপর হইতে ধুতি চাদর বাহির করিয়া আনিয়া ময়নাকে দেখাইল। আর যাহা পাইয়াছিল, তাহা আর দেখাইতে সাহসী হইল না। কাবণ সে পাঁচ শত টাকার একটী তোড়া— টাকার তোড়া ধানের ডোলের মধ্যে থাকিল। তাহা বাহির করিয়া ময়নাকে দেখাইতে কিছুতেই জকির সাহস হইল না। ময়না ধুতি চাদর দেখিয়া বলিল, "দেখ এ কাপড় তুমি কখনই পরিও না। লোকে দেখিলেই সন্দেহ করিবে। তুমি যে কথা বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিবে তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। যে যেমন, তাহার আশাও তেমন। চক্ষুও তেমন—পসন্দও তেমন। নিশ্চয় লোকে একথা বলিবে যে, তুমি এ কাপড় চুরি করিয়া আনিয়াছ। না হয় তোমাকে কোন বড় লোক দিয়াছে। এ ধুতি চাদর কালী গঙ্গায় ফেলিয়া দেও। নয় পোড়াইয়া ফেল। আর ঘরে রাখিও না। আমার কথা শুন।—"

জকি বড়ই দুঃখিত হইল। মনে করিয়াছিল, ময়না তাহার কার্য্যে যোগ দিবে—কত প্রশংসা করিবে। ধুতি চাদর দেখিয়াই এই কথা—পাঁচ শত টাকার কথা শুনিলে ত আজই আগুন জ্বালাইয়া দিয়া ছারখার করিয়া দিবে। টাকার কথা না বলিয়াই ভাল করিয়াছি। জকি মনে মনে এই কথা কহিয়া ময়নার সম্মুখ হইতে ধুতি চাদর উঠাইয়া লইয়া গেল। একটুকু পরে আসিয়া বলিল যে, আর সুন্দরপুর যাইব না।

"কুটুম্ব স্বজনের বাড়ী যাওয়া আসায় দোষ কি? তবে ঘন ঘন যাওয়াটা ভাল দেখায় না—আদরও থাকে না। মুখে কিছু না বলুক, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হয়। আমি যাইতে বারণ করি না, মাসেক ছমাস পরে কুটুম্ব বাড়ী যাওয়াই ভাল।"

"না আমি সে বাড়ীতেই আর যাইব না। সুন্দরপুর গ্রামেই আর যাইব না। সেখানে আমার কোনই কাজ নাই।"

ময়না কাতর স্বরে বলিতে লাগিল। "দেখ আমার পেটের বেদনা আজ বড়ই বেশী হইয়াছে। সাহেবের নিকট হইতে যদি একটু ঔষধ চাহিয়া আনিয়া দিতে তাহা হইলে বাঁচিতাম, কত লোককে তিনি ঔষধ দেন। তুমি চাহিলেই ঔষধ দেবেন।"

জকি সুন্দরপুর না যাইয়া কুঠীতে চলিয়া গেল। ময়না মাটিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনা কি? স্বামীর সহিত সময় সময় দেখা হয়, কিন্তু বিবাদ, বিসম্বাদ, বিচ্ছেদ, মিলন কিছুই নাই। স্বপত্নী আছে, তাহার সহিতও মনবাদ নাই। ময়নাই

ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে বিবাহ দিয়াছে। স্বপত্নী ঘরে আনিয়াছে। একদিনের জন্যও স্বপত্নী সহিত বাদ বিবাদ হয় নাই। অন্ন বস্ত্রে ময়নার কোন বিষয়ে কষ্ট নাই। তাহার আচরণে, কথাবার্ত্তায় প্রতিবাসী গ্রামস্থ লোক সকলে এক মুখে ভাল বলে। এবং ভালবাসে। প্রতিবাসিনীর মধ্যে একজন বয়োধিকা স্ত্রীর সহিত ময়নার বিশেষ আলাপ ছিল। সে সর্বদাই ময়নার নিকট কথাবার্তা কহিত, হাসি তামাসাও করিত। ময়নার পীড়ার কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়া বলিল।—

"কি হয়েছে দিন দিন যে একেবারেই সারা হইতেছ? আগে ত ভালই ছিলে,—৫/৬ মাসের মধ্যে তোমার ভাব অনেক বদল্ হইয়াছে। আবার আজ কএকদিন হইতে ত একেবারেই যাচ্ছেতাই দেখিতেছি। ক্রমেই যে সারা হলে? কথাটা কি বলত?"

ময়না কোন উত্তর করিল না। কিন্তু চক্ষু দুটী জলে পরিপূর্ণ হইল। চক্ষু জল সম্বরণ করিতে ক্ষমতা হইল না। দুই এক ফোঁটা মাটিতে পড়িল। অবলা নিঃস্বহায়ার চক্ষুর জল মাটিতে পড়িয়া মাটি ভিজাইল। পরে বলিল "আমার কিছু হয় নাই। কোন পীড়াই আমার শরীরে নাই। তবে বলবে এ ভাব কেন? সতীনের জ্বালায় জ্বলিতেছি—তাহাও নহে। সে সতীন ত আমিই আনিয়াছি—এ সংসারে আমিই কর্তা, আমার হাতেই সকল, কিছুতেই আমার দুঃখ নাই। অথচ এ জগতে আমার আর সুখ নাই। আমার মনের কথা মনেই রহিল।"

"বোন! অনেক দিন হতে ইচ্ছা একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু সময় পাই নাই। তোমার সম্মুখে কেহ বলে না। ভেঙ্গে চুরে খোলাসা করেও কেহ বলিতে সাহসী হয় না। আকার ইঙ্গিতে অনেকেই অনেক অনেক কথা বলে। ভাই জকির সহিত তুমি কথা বল না। সে তোমার ঘরে আসে না। একথাটা প্রকাশ্যই সকলে বলে।—পুরুষ বাঁজা হইলে দশটী বিয়ে করিলেও ছেলে পেলে হয় না। এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে। কিন্তু তোমার মুখের ভাব, শরীরের অবস্থা দেখে অনেকেই অনেক কথা বলে। কিন্তু মুখ ফুটে কেহই কিছু বলিতে সাহস পায় না। একটু ঘাৎ রাখিয়া দেয় যে, হলেই দেখা যাইবে!"

ময়না নীরব—কিন্তু চক্ষের জলে মাটি ভিজিতেছে।

প্রতিবাসিনী পুনরায় বলিল, কান্দ কেন? সকলই কপালের লেখা। ময়না অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, বোন্ আমি সকলকেই চিনিয়াছি। বিশেষ করিয়া স্বামীকে চিনিয়াছি। স্বামী আপন স্বামী—হায়!

জকি ঔষধের শিশি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, সাহেব ঔষধ দিয়াছেন।

প্রতিবাসিনী বলিল—কিসের ঔষধ?

ময়না বলিল—বেদনার ঔষধ।

জকি শিশি রাখিয়া ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইল। সাহেব বলিয়াছেন তোমার স্ত্রীর হাতে ঔষধ দিও। তুমি খাওয়াইও না। এ কথাটা বলিতে তখন জকির সাহস হইল না। কারণ সম্মুখে পাড়ার একটী স্ত্রীলোক। কিসে ঔষধ খাওয়াইবে, এই কথাই বার বার বলিতে লাগিল।

ময়না বলিল ঔষধ দেও খাই! ব্যস্ত হইতেছ কেন?

জকি বলিল—না না ব্যস্ত কি! তা—না—ঔষধ খাও। এখনই বেদনা সারিয়া যাইবে।

ময়না বলিল—"দেও তুমিই হাতে করিয়া দেও খাইতেছি।"

জকি—তা আচ্ছা দেই, খাও বলিয়া শিশির সমুদায় ঔষধ ময়নার মুখে ঢালিয়া দিয়া জকি নিস্তার পাইল। ঔষধ গলাধ করিতে ময়নার মহা কষ্ট হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না।

জকি ঔষধ খাওয়াইয়া বলিল যে, সাহেব জল দিয়া মিশাইয়া খাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাত হইল না। সে কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তাড়াতাড়ি ঘটি আনিয়া ময়নার সম্মুখে রাখিয়া দিল। ময়না জল পান করিল না। জকি শিশিটী লইয়া বার বার দেখিতে লাগিল, এবং শিশির গলায় সূতা বাঁধিয়া ঘরের বেড়ায় ঝুলাইয়া রাখিল। এবং তামাক খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হুঁকা কল্‌কে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। প্রতিবাসিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল বোন্! কিসের বেদনা?

ময়না একটু স্থির হইয়া বলিল—বেদনা আমার মাথা আর মুণ্ডু। জকি কলিকায় তামাক সাজিতে সাজিতে বলিতে লাগিল—সাহেব বলিয়া দিয়াছেন যে, ঔষধ খাওয়াইলে কিছুক্ষণ পর কি ভাব হয়, বেদনা কমে কি বাড়ে, আসিয়া বলিও।

প্রতিবাসিনী বলিল—বোন্ আমি এক্ষণে যাই, বাড়ীর কাজ কাম অনেক বাকী আছে। আবার আসিয়া দেখিয়া যাইব। প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। ময়না যেখানে ঔষধ খাইল সেইখানেই বসিয়া রহিল। ক্রমে পেট মধ্যে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল। কয়েকবার উঠিয়া ঘরের কাণাচি গিয়া শেষে একেবারে অচল হইয়া পড়িল। সপত্নী ব্রজ বাড়ীর অনেক কথাই জানিত। ময়নাকে ধরিয়া কয়েকবার কাণাচি লইয়া গেল। শেষে ময়না অস্থির হইয়া পড়িল। কাপড় অসামাল হইল। জকি সাহেবের নিকট সংবাদ দিতে দৌড়িয়া ছুটিল। বাঁচিবার ভরসা নাই, চক্ষু ঘোর হইয়া আসিতে লাগিল, সপত্নী ব্রজের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল— "বোন্! আমি যে, ঔষধ খাইয়াছি কেন, তাহা তুমি বোধহয় জান? যে জন্য ঔষধ খাওয়া তাহা অপেক্ষা মরণ ভাল। আমার স্বামী বর্ত্তমান। ঐ ঔষধের পরিমাণের বেশী আমি খাইয়াছি। যিনি ঔষধ দিয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, বড় ভয়ানক ঔষধ। যাহা দিব তাহার চারি ভাগের এক ভাগ চারিগুণ জলে মিশাইয়া খাইবে। যদি তাহাতে না হয়, তবে সেদিন আর খাইবে না। তারপর দিন আবার ঐ পরিমাণ ঔষধ আট গুণ জলে মিশাইয়া খাইও। এই ছিল ঔষধের ব্যবস্থা। সেই ঔষধের ব্যবহার নিয়ম জানিয়াও যে অকাতরে শিশির সমুদয় ঔষধ বিনা জলে পেটে ঢালিলাম কেন? মরিব বলিয়া। আমার বাঁচিবার সাধ নাই। আমি অনেক দিন হইতে মরিয়া রহিয়াছি।

বোন্ তুমি তোমার স্বামীকে চিনিতে পার নাই, আমি অনেক দিন হইতে চিনিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককে চিনিতে পারিয়াছি। ইহার বিচার অবশ্যই একদিন হইবে। যিনি সকলের বিচারের মালিক, তাঁহার হাতে একদিন পড়িতেই হইবে। কথা অনেক কিন্তু

বলিবার সাধ্য নাই। বোন্ একটী কথা বলি—তোমার স্বামীকে তুমি কখনই বিশ্বাস করিও না। তিনি না করিতে পারেন, এমন কোন কার্য্য দুনিয়ায়ই নাই। মানুষে যাহা কখনই করিতে পারে না, তিনি তাহা টাকার লোভে অনায়াসে করিতে পারেন। পারেন ত পরের কথা—করিয়াছেন। আর কি বল্‌বো বোন্। আর কি বল্‌বো! ঐ যে ধুতি চাদর দেখিয়াছ, নিশ্চয়ই জানিও ঐ ধুতি চাদরেই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ঐ কাপড়েই তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব যাইবে। প্রাণ যাইতেও বড় আশ্চর্য্য নাই। আগেই বলিয়াছি, তোমার স্বামী টাকা পেলে না পারে, দুনিয়ায় এমন কোন কুকাজই নাই। ১ম লোভ ধুতি চাদর তার পর যে লোভ আছে সে লোভ তোমার স্বামী—কখনই সামলাইতে পারিবে না।

আমি ত চলিলাম, তুমি যদি বাঁচিয়া থাক তবে দেখিবে তোমার স্বামীর কি দুর্দ্দশা ঘটে। বোন্ "তোমার স্বামী" বলিলাম বলিয়া মনে কোন দুঃখ করিও না। মনের কথা চিরকাল মনেই রাখিয়াছি। এখন আর কেন? ইচ্ছা করিয়াই শিশির সমুদয় ঔষধ খাইয়াছি। খাইলাম কেন? আপন প্রাণ আপন হাতে বাহির করিলাম। তাহা বলিব না। ময়নার মন জানে, আর সেই পাক পরওয়ারদেগার জানেন।

একদিক স্বামী, অন্যদিকে দুরন্ত বাঘ! বাঘ হাঁ করিয়া ধরিতে আসিল, স্বামী রক্ষা না করিয়া, আরও বাঘের মুখে ধরিয়া দিল। আর বাঁচি কি করিয়া, যাই কোথা—কে রক্ষা করে? খোদায় আছেন জানি, তিনি সকলের রক্ষক তাও লোকের মুখেই শুনি! সেও হতভাগিনীকে ত রক্ষা করিলেন না!—আর শক্তি নাই—কথা কহিবার আর শক্তি নাই। উহু! স্বামীর এই কার্য্য! জকির মুখ আর দেখিব না বলিয়া ময়নার দুটী চক্ষু একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ব্রজ এই তিনটী অস্ফুট কথা শুনিল মাত্র। নির্দ্দয় স্বামী! নির্দ্দয় ইংরেজ!—মুখের কথা মুখেই রহিল। ময়নার প্রাণবায়ু কোন্ পথে কোথায় চলিয়া গেল ব্রজ তাহার কিছুই দেখিতে পারিল না। নিরবে কান্দা ভিন্ন ব্রজের আর কি ক্ষমতা আছে?—কান্দিতে লাগিল।

জকি সাহেব নিকট পীড়ার অবস্থা জানাইতে গিয়াছিল, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সাহেব কত দুঃখ করিতেছেন। আমাকে মারিতে তাড়া দিয়াছেন। আর পাছা থাবড়াইয়া বলিতেছেন "ও ম্যান—তুম ক্যা কিয়া'—। ঔষধে জল দেই নাই, আর সমুদয় ঔষধ খাওয়াইয়াছি শুনিয়া কেনী আঙ্গুল দাঁতে কাটিতেছেন। সাহেব মহা ব্যস্ত হইয়াছেন।

এখন কেমন? ময়নার নাকে মুখে হাত দিয়া দেখিয়া জকি মাথায় ঘা মারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ব্রজের কান্না তখন একটু বাড়িল। প্রতিবাসীরা যে যেখানে ছিল ছুটাছুটী করিয়া ব্রজের কান্নার সহিত যোগ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের জলে নাকের জলে একাকার করিয়া ফেলিল। জকি প্রতিবাসীদের সাহায্যে ময়নার অন্ত্যেষ্টি ক্রীয়ার জোগাড় করিয়া তাড়াতাড়ী ময়নার ঘরের জিনিসপত্র বাক্‌স পেটারায় বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ
জন্মভূমি

জন্মভূমি কাহার না আদরের? উপমা রহিত কাহার না ভাল বাসাস্থান? জন্মভূমির জন্য কেনা লালায়িত? বহুদিন পরে প্রবাসী দেশে আসিলে তার মনে কতই সুখ! আনন্দ! মিসেস্ কেনীর মন কিরূপ তাহা জানিনা। বাঙ্গলার কাল মুখের ভাব এবং খোলা বুকের ভিতরের খবর বুঝিয়া উঠাই দুঃসাধ্য। তাহাতে সেই ধবধবে সাদা মুখের হাব ভাব, সাদা চোখের চাউনির আভাষে, এবং আটা সাটা সাত প্রকার কাপড়ে ঢাকা—সাদা চর্ম সাদা অস্থি জড়িত— সাদা কি কালো ঈশ্বর জানেন—কমল কি কঠিন ভগবান জানেন, সে মনের ভাব বুঝিয়া ব্যক্ত করা উদাসীন পথিকের সাধ্য নহে। জন্মভূমি পশুরাও ভালবাসে, পক্ষীরাও ভাল চেনে, কীট পতঙ্গ ক্ষুদ্র প্রাণীরাও বোধ হয় হঠাৎ ভুলিয়া যায় না। আপন আপন বাসস্থান, বাসা, কোটর, গর্ত, অগাধ জলে অনায়াসে চিনিয়া যাওয়া আসা করে। সীমা বিশিষ্ট জ্ঞানের ভালবাসাই চেনা, এবং আপন আপন স্থানে সময় মত চিনিয়া যাওয়া।

মিসেস্ কেনী জন্মভূমিতে পা রাখিয়াই যেন বিরক্ত হইয়াছেন। কেহ দুহাত তুলিয়া, ঘাড় নোওয়াইয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া দস্তর মত সেলাম বাজায় না। সরিয়াও দাঁড়ায় না। গা ঘেঁসিয়াই যাতায়াত করে। মান মর্য্যাদার নাম নাই। খানসামা নাই, বেরা নাই, বাবুরচি নাই, সর্দ্দার বেরা নাই, বয় (boy) নাই। সমুদয় কাজ নিজে করিতে হয়। ইস্তক রন্ধন লাগাএদ শয্যা, তাহার পরেও ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা। নিজের মলমূত্র নিজেই পরিষ্কার—চিঠিখানা দিতে হলেও ডাক ঘরে নিজে যাইতে হয়। হুকুমের তাবে কেহই খাটে না। একে বলিতে দশজন আসিয়া উপস্থিত হয় না। অন্যায় হুকুম কেহই শুনে না। ভদ্রতা ব্যবহারে কার্য্য করিতে হয়, কথা বলিতে হয়। সকলের সহিত নম্রতা, এবং ভদ্রতা ব্যবহার না করিলে বড়ই অপদস্ত হইতে হয়। চক্ষু রাঙ্গাইয়া, সাদা মুখ বাঁকা করিয়া কার্য্য লওয়া দুরে থাকুক, প্রতি কার্য্যে ধন্যবাদ না দিলে, অসভ্য জঙ্গলী বলিয়া বেতনভোগী কার্য্যকারকেরাও উপেক্ষা করে। নির্দ্ধারিত এবং নিয়মিত কার্য্য সময়েই একটু নরম বোধ হয়। তাহার পরেই যেন অন্য ভাব। খাওয়া দাওয়াতেও অসুখের এক শেষ। মুরগী মেলে না। আণ্ডা পাওয়া যায় না। তরকারীও তথৈবচ। পাওয়া যে না যায় তাহা নহে। দাম কত? সে দামের কথা হঠাৎ শুনিলে, সোনার ভারতের কথা মনে পড়ে। এই প্রকারে মিসেস্ কেনী আর বলিতেছেন,—এমন প্রভুভক্ত দেশ কোথাও নাই, আমার বোধ হয় জগতে নাই। চাকরে মনিবে কি সম্বন্ধ, রাজা প্রজায় কি সম্বন্ধ, তাহা ভারতবাসীরাই জানে।

সে কথা আরকি বলিব। আমাদিগকে দেব দেবীর ন্যায় পূজা করে। রাস্তা ঘাটে দেখিলে সেলাম বাজাইয়া পঞ্চাশ হাত সরিয়া যায়। দিবারাত্রি খাটুনি—চাকর হইলেই যেন সে চিরকালের জন্য বাধা পড়িল। সর্ব্বদা প্রস্তুত, সর্ব্বদা জোরহাত। মার কাট কথাটী মুখে নাই। যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লও কিছুই বলিবে না। যেমন অবোধ তেমনই সরল। আর কত বঁলিব। যাহা ইচ্ছা তাহা কর, সৌভাগ্য জ্ঞানে সহ্য করিবে, কত সাহেব শীকার করিতে যাইয়া, মানুষ শীকার করিয়া বসেন, কিছুই হয় না। ক্রোধবসে এড়ির গুতোয় পিলে ফাটাইয়া দেন, চুঁ শব্দটি মুখে আনে না। টাকা লইতে ইচ্ছা হইল, হুকুম জারি করিয়া দাও অমনি আদায়। আমাদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, রূপা বলিয়া দস্তা হাতে দেও, মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে। এমনই ভক্তি যে আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়া আমাদিগকেই কায়মনে পূজা করে, মনের সহিত সেবা করে। তাহারা পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করে, এ দেশের ছাইভষ্ম জিনিস দেখিয়া—ভুলিয়া সকলই আমাদিগকে দেয়। এই আমি যে খণ্ডে বাস করি, সমুদয় ক্ষমতা আমার হস্তে—আমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি। পরিশ্রম তাহাদের, ভোগ আমাদের। এমনই সরল, এমনই সাধু যে, সর্বস্ব দিয়াও আমাদের খাতির রাখে, মন যোগায়। হায়! হায়! অমন সোনার দেশ কি আছে? আমার এত কষ্ট হইতেছে যে এক মুখে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। খাওয়া দাওয়ার সুখই বা কত! দান দাতব্যের ঘটাই বা কত! আদর অভ্যর্থনার ধুমই বা কত! সকলেরই বাড়ী ঘর দোর আছে, খাইবার সংস্থা আছে। সাত পুরুষ দূরে থাকুক এক জীবনের মধ্যে ৬০ দিনও কেহ গাছতলায় বাস করে না। ভাঁড়া দিয়াও পরের ঘরে নিদ্রা যায় না। যেমনই হোক থাকিবার শুইবার ঘর সকলেরই আছে। ছল, চাতুরী, জুয়াচুরী জানে না। মিথ্যা ভান করিয়া কাহারও সম্পত্তি হরণের কেহ চেষ্টা করে না। তবে যাহারা পাওনাদার, তাহারাই দাবী করে, মামলা মকদ্দমাও হয়। সে বিচারও আমরাই করিয়া থাকি। বিচার দরুন নজর সেলামী টাকা লই। তাহাদেরই দেশ, তাহাদেরই টাকা, তাহাদেরই সম্পত্তি,—মজা করি আমরা। এমন সুখ কি আর কোথাও আছে?

আহা সে দেশের স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা লাগে। তাহারা যেন বন্দিনী! চিরবন্দিনী! ঘাটে মাঠে বাহির হয় না। সর্ব্বদা মাথা মুখ ঢাকিয়া থাকে। অপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা কহা দূরে থাক্ হঠাৎ নজর পড়িলেই ঘরের মধ্যে লুকায়। একটু বেশী বয়স হইলে জন্মদাতা পিতার সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধ করে। এক পরিবারস্থ এক বাড়ীর আপন আত্মীয় স্বজন—এমন কি পিতার সম্মুখেও আহার করে না। স্বামীসহ সর্ব্বদা একত্র উঠা বসা করিতে মাথা কাটিয়া ফেলিলেও স্বীকার হয় না। অন্যের কথা কে বলে। পুরুষেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা পুরুষেরাই তাহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা একরূপ বিধাতা। স্বামী মুখে কত কথা শুনিতেছে, কত বকুনী খাইতেছে সময় সময় অনেকে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতেছে, প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে। নালিশ নাই, ফরিয়াদ নাই, পুরুষে সকলই পারে। স্ত্রীলোকেরা কেবলই সহ্য করে। এত কষ্ট, এত অসুখ, এত যন্ত্রণা, তবু পিতামাতায় ভক্তি,

ভ্রাতা ভগ্নীতে ভালবাসা, স্বামী স্ত্রীতে একাত্মা একপ্রাণ কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য দেশের কথা কোথায়ও শুনি নাই। কেতাবে স্বর্গের কথা শুনিয়াছি, মিথ্যা বলিতেছি না, আমরা সেই স্বর্গের রাজ্যে বাস করিতেছি। এই কতক দিনে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। ক্ষণকালও আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আজই মিষ্টার কেনীকে পত্র লিখিব, এবং এই সপ্তাহেই দেশের মুখে চুন কালী দিয়া সোনার ভারতে যাত্রা করিব। বাপরে! এমন বে আদব বে তমিজ দেশে ভদ্রলোকে বাস করে? সকলই সমান। কেহ কাহারও খাতির রাখে না—গ্রাহ্য করে না—মান্যও করে না। দুদণ্ড বসিয়া খোস গল্পেও সময় অতিবাহিত করে না। চাকর বেতনভোগী। চাকর মনিবের কত প্রশংসা করিবে, কত প্রকার যশঃগান গাইবে। সে কথার আভাষ কাহারও মুখে নাই। নির্ধারিত বেতন, নিয়মিত কার্য্য! আর সকলেই যেন ব্যস্ত, আপন আপন কার্য্যে সকলেই ব্যস্ত। ইস্তক লক্ষ্যপতি ধনী, লাগাএদ মুটে মজুর, সকলেই আপন আপন কার্য্যে সমান ব্যস্ত। কার্য্যের মূল্যে অবশ্যই ন্যূনাধিক আছে। কিন্তু ব্যস্ত ও যত্নের মূল্য সকলেরই সমান। এমন কড়া দেশে আর আমার বাস করা সাজে না। আমি শীঘ্রই এদেশ পরিত্যাগ করিব। এ জীবন থাকিতে আর জন্মভূমির নাম করিব না।

মিসেস কেনী সেই দিবসই শালঘর মধুয়ায় কেনীর নিকট পত্র লিখিয়া নিজে ডাকঘরে দিয়া আসিলেন। পত্রের ভাবার্থ এই যে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বড়ই কষ্টকর! নাথ! আর আমার সহ্য হয় না! বিরহ বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়াছি। প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। এরূপ ঘটিবে আগে জানিলে, বিরহে এত যাতনা আগে বুঝিলে, নাথ! আমি কখনই শালঘর মধুয়া পরিত্যাগ করিতাম না। ক্ষণকালের জন্যও ছাড়িয়া আসিতাম না। খুব শিক্ষা হইল! আর না কখনই আর এরূপ হইবে না। আমি শীঘ্রই পৌঁছিতেছি। এই সপ্তাহেই জাহাজে উঠিব। অদ্যই টিকিট খরিদ করিব— .

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ
প্যারীসুন্দরীর পরিণাম

কুঠী লুটের মোকদ্দমায়, হাজিরা আসামীগণের ফাটক হইয়াছে। দারগা খুনের মোকদ্দমায় আসামী হাজির হয় নাই,—গ্রেপ্তারও হয় নাই। কিছুই সন্ধান হইতেছে না। সরকার বাহাদুর প্যারীসুন্দরীর সমুদয় জমিদারী ক্রোক করিয়া অছি সরবরাহকার নিযুক্ত করিয়াছেন। বরিশালের নিকট সাএস্তাবাদ নিবাসী সৈয়দ আবি আবদুল্যা অছি সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া আসিয়া সমুদয় জমিদারী সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে ক্রোক করিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। প্যারীসুন্দরী সদর দেওয়ানীতে আপীল করিয়াছেন। বহু তদবির, বহু যত্ন, বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয়ে জমিদারী খালাস করিলেন।

নিরপরাধী কয়েকজন আমলা এবং বাজে চাকর, বিনা অপরাধে সাক্ষীর দোষে, দোষী সাব্যস্ত—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল। অনুদায়ে চাকুরীতে মজিয়া, একেবারে প্রাণেই সারা পাইল। রামলোচন খালাশ পাইলেন। 'আহম্মদ' মনিবের আদেশ, বিশেষ কর্তব্য কার্য্য করিতে গিয়া বিঘোরে প্রাণ হারাইল। কাসুর মাতার চিরকান্না সার হইল। বাঁশীর স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। প্যারীসুন্দরী জমিদারীর কতক অংশ পত্তনী ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঋণ দায় হইতে মুক্তি হইলেন। আয়ের শ্রেষ্ঠ অংশই প্রায় কমিয়া গেল। পাঠক। প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইয়া অন্য কথা আরম্ভ হইল।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

মীর সাহেবের নৌকাযাত্রা

পূর্ব কথা অনুসারে মীর সাহেব এক্ষণে সিরাজগঞ্জের অধীন সৌলী গ্রামে ভগ্নীর বাটীতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নিকটেই গৌরী নদী হইয়া ধুমাকলের নৌকা (ষ্টিমার) প্রায়ই উজান ভাটি যাতায়াত করে। কিন্তু কোথায় যায়, কোথা হইতে আইসে তাহার খোঁজ খবর কেহই রাখেন না। সকলের মনেই বিশ্বাস যে, সাহেব লোক না হইলে, ধুমাকলের নৌকায় দেশী লোকের চড়িবার অধিকার নাই। সাহস করিয়া সে সময় ষ্টিমারে চড়িতেও কেহ ইচ্ছা করে নাই।

নদীগর্ভে দপ দপ শব্দ হইলে, এবং আকাশে ধোয়া দেখিলেই তীরস্থ গ্রামবাসীরা আপন আপন কর্ম ফেলিয়া নদী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং চলতি ষ্টিমার দেখিয়াই চক্ষু জুড়াইত। নদীতীরে যে যে স্থানে পাথুরিয়া কয়লার আড্ডা, সেই সেই স্থানে ষ্টিমার আগাইয়া কয়লা লইয়াই চলিয়া যাইত। কোন আরোহী কি বাঙ্গালীর মালামাল লইত না। কেহ মাল দিতেও প্রস্তুত হইত না। কোম্পানীর কার্য্যই করিত, মালামাল যাহা কিছু আমদানী রপ্তানী হইত সে কুঠীয়াল নীল করের একচাটিয়া।

মীর সাহেব নৌকা যোগে সিরাজগঞ্জ যাইতেছেন। বিছানা বালিশ, খাদ্যসামগ্রীর ভার, ভারে ভারে দাঁড়ী মাঝিরা এবং কুলী মজুরেরা নৌকায় তুলিতেছে। বাবরচিখানা নৌকোয়—জ্বালানী কাষ্ঠ, বাউলী, বটি, হাতা, তামার পাতিল ঝাঁকা বোঝাই করিয়া উঠাইতেছে। বসীরউদ্দীন নিজের কাপড়ের গাঁঠরী, সেতার, তবলা ইত্যাদি বাহকের মাথায় দিয়া নৌকায় উঠাইতেছেন, পাশা খেলার কোট, গুটী আপন হাতে রাখিয়াছেন।

সাগোলাম, দেবীপ্রসাদ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী, দুই চারিজন প্রতিবাসী মীর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে নদী তীরে নৌকা পর্য্যন্ত যাইতেছেন। সাগোলামের মুখে কথা নাই। বড়ই দুঃখিত, বড়ই চিন্তিত! এত চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না, অছিয়তনামা হাতে আসিল না। কি হইল? শেষে কি হইবে? এই চিন্তাতেই একবারে সারা হইতেছেন। আহার বিহারে

সাংসারিক কার্য্যে কিছুতেই মন নাই—কিছুতেই আরাম নাই, বড়ই উদ্বিগ্ন—চিন্তার সহিত উদ্বিগ্ন!

অছিয়তনামা নিশ্চয়ই মীর সাহেবের হাত বাক্সে আছে, এইটী তার ধ্রুব বিশ্বাস। এইত হাতছাড়া হইল। এইত চলিয়া গেল। আর কি হইবে সকল আশায় ছাই পড়িল। ঐত এখনি হাতবাক্স হাতছাড়া হইয়া চলিল। উপায় কি? মনের আশা মনেই মিটিয়া গেল। মধ্যখানে কতগুলি কথা দেবীপ্রসাদের কানে গেল। একবার মনে করিলেন, হাতবাক্সটা চাকরের হাত হইতে কাড়িয়া লই। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। আবার ভাবিলেন যদি এ বাক্সেও না থাকে, তবে আরও বিপদ। এতকালের পরিশ্রম, চিন্তা সকলই মাটি। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বড়ই দুঃখিতভাবে সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে লাগিলেন।

মীর সাহেব গৌরী তটে যাইয়া নৌকায় না উঠিয়া জলের কিনারায় দাঁড়াইলেন। সঙ্গীরাও দাঁড়াইল। সাগোলামকে দুঃখিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—বাপু। চিন্তা কি? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আমি ত আর চিরকালের জন্য যাইতেছি না যে, এত দুঃখিত হইয়াছ। বিষয়াদি, বাড়ী, ঘর পরিবার সকলই থাকিল। আপন কাজ কর্ম্ম দেখিয়া করিবে। ঈশ্বর ইচ্ছায় কোন বিষয়ে ভাবনা চিন্তার কারণ থাকিল না। মধ্যে মধ্যে কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করিও। কোন গুরুতর কার্য উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি যেরূপ উপদেশ দেন, সেইরূপ করিবে। সাবধান! কেনীর সহিত কোন বিষয় গোলযোগ না হয়। সাবধান! লোকের কথায় তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইও না। এই প্রকার নানা কথা বলিয়া, সাগোলামের মাথায় মুখে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মীর সাহেব বিদায় হইলেন। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সালাম বাজাইল। নৌকার সিঁড়ির উপর উঠিতেই কি কথা মনে হইয়া হাতবাক্স আনিতে অনুমতি করিলেন। বাক্স খুলিয়া একখান জড়ান কাগজ বাহির করিয়া, সাগোলামকে বলিলেন—আমি নৌকাপথে যাইতেছি। পদ্মা, যমুনা হইয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। এই দলীলখানিই মূল। ইহাই আমাদের সর্ব্বস্ব ধন! আমার পিতা কৃত "অছিয়তনামা" এই দলীলখানি বড় দরকারী এবং আবশ্যকীয় দলীল—হারাইলেই সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে। কারণ এ সম্পত্তির শত্রু অনেক। আর যত দলীল আপনাকে দিয়াছি, সকলের অপেক্ষা এখানি অধিক সাবধানে ও যত্নের সহিত রাখিতে হইবে। জলের উপর যাওয়া, এ সকল দলীল বাটীতে সাবধানে থাকাই ভাল। বাপু, সাবধানের মার নাই। আমি বহু যত্নে দলীলখানি সর্ব্বদা আপন কাছে রাখিতাম, তুমিও যত্নেই রাখিবে। বিশেষ সাবধানে রাখিবে, বলিয়া অছিয়তনামা সাগোলামের হাতে দিলেন।

সাগোলাম অছিয়তনামা হাতে পাইয়া একবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন। যা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই ঘটিল। যাহার জন্য এত চক্র, যে দলীল হস্তগত করিবার জন্য দুগ্ধে বিষদান, কবিরাজের সহিত ষড়যন্ত্র, কত চক্র, কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, আজ তাঁহার ভাগ্যে লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকেই বিশ্বাসী পাত্র করিয়া মীর সাহেবের সর্বনাশ ঘটাইতে মীর সাহেব হস্তেই অছিয়তনামা সাগোলামের হস্তগত হইল। কি আশ্চর্য! ঘটনাস্রোত

নিবারণ করে সাধ্য কার! বিধির নির্ব্বন্ধ ঘুচাইতে ক্ষমতা কার। আত্মবিস্মৃতে শ্বশুরকে প্রণাম করিতেও সাগোলামের মনে হইল না। মীর সাহেব নৌকায় উঠিলেন। মাঝিরা লগি উঠাইয়া "দরিয়া গাজী পাঁচ পীর বদর বদর" বলিতে বলিতে নৌকা জলে ভাসাইয়া দিল। সুবাতাস পাইয়া দাঁড়ীরা আর গুণ টানিতে নামিল না। পাইল খাটাইয়া মনের আনন্দে যাইতে লাগিল। নৌকা গৌরীর জলে, গা ভাসাইয়া বায়ুসহযোগে স্রোত অতিক্রম করিয়া উজান ছুটিয়া চলিল। মীর সাহেব জলে ভাসিলেন। চিরকালের মত জলে ভাসিলেন।

ষোড়শ তরঙ্গ
গারদের কএদী

ছয় মাস যার পেটে অন্ন নাই, তবে বাঁচে কিসে? প্রাতে প্রতিজন একসের ধান পায়। সেই ধান হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাল বাহির করে। সেই চাল আর সন্ধ্যার সময় এক ঘটী জল ইহাই মালখানার কএদীর আহারের ব্যবস্থা। কেনীর গারদ বড়ই কঠিন স্থান। যাহার ভাগ্যে সে গারদবাসের অবসর হয় তাহার জীবনে সংশয়। পাঁড়ে, দোবে, চোবের অত্যাচারে, অর্থপিশাচদিগের অমানুষিক ব্যবহারে প্রাণ আর বাঁচে না। তবে যাহার আত্মীয় স্বজন আছে, দুটাকা সেলামী—গারদ সেলামী দিবার সাধ্য আছে, তাহার পক্ষে দুই এক দিন একটু নরমে যায়। তাহার পরেই হাড় ভাজা ভাজা হয়। প্রাণ যাই যাই করে। মানুষের কঠিন প্রাণ—বিশেষ বিপদগ্রস্ত, বিপদাপন্ন ব্যক্তির কষ্টের জীবন। সহজে প্রাণ বাহির হয় না। তাহাতেই কেনীর গারদের কএদী,—কাজী সমসের আলী এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রাণ আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া সংসার চক্রের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পায় নাই। হায়! কি দুঃখের কথা! বিনাপরাধে কএদ। পৈত্রিক সম্পত্তি লিখিয়া দেয় নাই, তাহাতেই এই বিপদ—গারদে আবদ্ধ। দ্বারে দ্বারে খাড়া পাহারা। হায়! কেমন করিয়া লিখিয়া দিবে? কোন্ হাতে, কোন কলমে, কোন্ কালীতে, কোন কাগজে লিখিয়া দিবে? পৈতৃক সম্পত্তি, যাহার আয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া কত জনার প্রাণ বাঁচিতেছে। কত বিধবার, জাতি, ধর্ম রক্ষা পাইতেছে। কত পিতৃহীন বালকের এক মুঠো ডাল ভাতের সংস্থান রহিয়াছে। কত পুত্রহীনা বৃদ্ধার জীবনোপায়ের উপায় রহিয়াছে। কোন প্রাণে বিনা পণে লিখিয়া দিবে? আবার প্রাণেও আর সহ্য হয় না। কষ্টের দিন শীঘ্র যায় না। সে রজনী শীঘ্র প্রভাত হয় না। এ সকল সহিয়াও সমসের আলী ভ্রাতুষ্পুত্রগণসহ আজ ছয় মাস বন্দী। সেই যে বসন পরিয়া শয়ন করিয়াছিল, সেই যে বিছানা হইতে হাত পা রাখিয়া, নিশীযোগে ডাকাতের ন্যায় কেনীর লাঠীয়াল সমসের আলীর বাড়ীতে পড়িয়া, শয়নঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া কুঠীতে আনিয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বৃদ্ধ খুড়ার উদ্ধার হেতু কুঠীতে ইচ্ছা পূর্ব্বক আসিয়া ধরা পড়িয়াছে, ফাঁদে আটকিয়াছে, গারদখানায় নীত হইয়া বৃদ্ধ খুড়ার সহিত যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতেছে। ক্ষৌরী কার্য্য

নাই। চুল বাড়িয়াছে, হাত পায়ের নখ বাড়িয়া সেই এক বিশ্রী ভাব ধারণ করিয়াছে। চিন্তায়, ভাবনায়, পেটের জ্বালায় অস্থিচর্মসার হইয়াছে। যাহাদের বীরত্ব কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সেই সকল বীরবাহুগণ বীরশ্রেষ্ঠ বীরগণ অন্নাভাবে ক্ষীণকায় এবং হীনবল হইয়া জ্বরাগ্রস্ত চিররোগীর ন্যায় গারদের মধ্যে পড়িয়া জীয়ন্ত মৃত্যুযাতনায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতেছে। কে দেখে? কে জিজ্ঞাসা করে? সূর্য্য অস্ত না হইলে আর দ্বার খোলা হয় না। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞেস করে না। কাছে আসে না, একঘটী জল এগিয়ে দেয় না। খুড়—ভাইপোয়ে অতি ক্ষীণস্বরে কথাবার্তা হইয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আর কত কাল এভাবে থাকিব। সাহেব যে প্রকারে লিখা পড়া করিতে চাহে, দিয়া চল অন্য দেশে গিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করি। পরিবার প্রতিপালন করি। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। এ যন্ত্রণা আর প্রাণে সয় না। সম্পত্তির জন্যই যখন এত কষ্ট তখন আর সে সম্পত্তিতে লাভ কি? বিপদসাগরের একমাত্র কাণ্ডারীই নগদ অর্থ বা ভূসম্পত্তি। ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই সম্পত্তিই আমাদের কাল হইয়াছিল। সম্পত্তি ছিল বলিয়াই এত কষ্ট। পৈতৃক বিষয় বিভব ছিল বলিয়াই আজ আমরা কেনীর গারদে। সন্ধ্যার পর দরজা খুলিবেই, একঘটী করিয়া জল দেওয়া,—ওটা একটা ভাণমাত্র। দুবেলা দুবার দরজা খোলার কারণই এই যে, আমরা কোন কৌশলে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করি, কি গারদে কএদী অবস্থাতেই থাকি, কি নূতন কোনরূপ ঘটনার মন্ত্রণা কি চেষ্টা করি। অবশ্যই দরজা খুলিবে সেই সময় বলিয়া দিব যে, আমাদের বিষয়াদি বাড়ীঘর সমুদয় লিখিয়া দিতে রাজী আছি। আমাদিগকে কয়েদখানা হইতে বাহির কর। প্রাণ বাঁচাও।

সময় মত জীবন দাতার নিকটে মনের কথা জানাইলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। অবশ্যই সে তাহার কর্তব্যকার্য্য করিয়াছে। প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্রের নিকট বলিয়াছে। কোনই ফল হইল না। হরনাথ মিশ্র সম্ভু সান্যাল প্রভৃতি কার্য্যকারকগণ মহা অস্থির!—সপ্তাহকাল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না। কেনী শয়নকক্ষ হইতে আর নীচে নামিয়া আইসেন না, উপরেই থাকেন। কি ভাবে থাকেন, তাহা কাহারও জানিবার ক্ষমতা হয় না। যে কেনী সাংসারিক কার্য্যে সর্বদা ব্যস্ত, সর্বদা প্রস্তুত। মুহূর্তের জন্যও সংসার ভুলে না। আজ সপ্তাহকাল একবার নিরব। আরদালী, চাপরাসী দ্বারা খবর পাঠান হইয়াছে, কোন উত্তর আইসে নাই। কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেনীর হুকুম "আমার বিনাদেশে আমার নিকট কেহ না আইসে।" সে আদেশ টালিয়া কার সাধ্য সেদিকে পা ধরে। কাযেই সকলে মহাব্যস্ত। পাংশার ভৈরব বাবুকে লইয়াই এখন চলিতেছে। কত মার পেঁচ, পেঁচাও বুদ্ধির পাক নাএব মশায়ের মাথায় ঘুরিতেছে। কত মিথ্যা প্রবঞ্চনার বৃহৎ কনা সকল নীলকরের চাকরের মরুভূমিসদৃশ মনক্ষেত্রে চাকচক্য দেখাইয়া মনিবের মনভারের কারণ অব্যক্ত অজ্ঞাত হেতু চিন্তা বায়ুর ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া কোথায় পড়িতেছে, তাহার কিছুই ঠিকানা হইতেছে না। কূল কিনারা পাইতেছে না। এতদিন কএদের পর সমসের আলী পৈতৃক সম্পত্তি ষোল আনা বিনা পণে লিখিয়া দিতে রাজি হইয়াছে। সে কথাও জানাইতে

পারিতেছেন না। একবারে নিষেধ। কেহ কোন কথা লইয়া তাঁহার বিনানুমতিতে কে তাহার সম্মুখে যায়।

মেম সাহেবের আসিবার দিনও অতি নিকট হইয়া আসিতেছে। প্রথম বিলাতের পত্র, তাহার পর কলিকাতার পত্র পাওয়া গিয়াছে। সেও প্রায় দশ বার দিন। বাতাসের জোর নাই বলিয়া, বজরা নৌকা আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে। সকলেরই অনুমান এই যে, অদ্য লাগাদ সন্ধ্যা অবশ্যই বজরা ঘাটে লাগিবে। নিতান্ত পক্ষে না আসিলে, কাল আর কিছুতেই পথে থাকা সম্ভব নহে।

টি, আই, কেনী আজ সপ্তাহকাল নির্জ্জনে বাস করিতেছেন। বিষয় বিভবের কথা ভুলিয়াছেন, মামলা মোকদ্দমার কথা ভুলিয়াছেন। শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া কি কারণে তিনিই জানেন। যাঁহার স্ত্রীর মনের ভাব বুঝিয়া পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিতে উদাসীন পথিকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, সে স্ত্রীর স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিবার পথিকের ক্ষমতাই নাই। কেনী কয়েকদিন হইতেই বিষাধিত, চিন্তিত, ভাবিত। সময় সময় সাদা চক্ষু সাদা জলে পরিপূরিত। কারণ কি? সে সুদীর্ঘ গোঁপ এবং গালপাট্টা সংযুক্ত ধবল মুখ এত মলিন হওয়ার কারণ কি? সে নিটোল নিরেট বিলাতী মজ্জাপূর্ণ বৃহদাকার মস্তক সর্ব্বদা বালিশের আশ্রয়ে থাকিবার কারণ? সে রক্তরাগ পরিপূর্ণ হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা জাগে কি? সাধ্য নাই—বুঝিবার সাধ্য নাই!! উদাসীন পথিকের বুঝিবার সাধ্য নাই। সহস্র অবলার অঙ্গাবরণ হরণকালে যে হৃদয় একটুও নড়ে নাই, শত সহস্র প্রজার ঘরের চালের আগুন দেখিয়া যে হৃদয়ে ব্যথা লাগে নাই—জ্বালাও লাগাও লুটিয়া লও, এই সকল হুকুম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বঙ্গের নিরীহ প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, কুলবধূর বস্ত্র হরণ ইত্যাদি মহাপাপ কার্য্য দেখিয়া যে বিলাতী হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই, যে চক্ষু ঐ সকল মহামারী ঘটনা দেখিয়া একটু নীচে নামে নাই, সে চক্ষে জল! গণ্ডস্থল ভাসিয়া বালিশ ভিজিতেছে। পালঙ্গের গদি ভিজিতেছে, ইহার মর্ম্ম কে বুঝিবে? তবে কি যে কারণে মহাবিদ্যান অপদস্থ, বুদ্ধিমান নিরস্থ, পুণ্যবান অধস্থ, ধনবান বিপদগ্রস্ত, বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পরাস্ত, সেই কারণেই কি এই কারণ?—যাক যাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম, আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মনের কথা কে জানে? যে জানে, সে জানে, যে বুঝে তাহার গোপন করাই কর্ত্তব্য। উভয়েই বন্দী, কেহ ইচ্ছায় কেহ অনিচ্ছায়।

সপ্তদশ তরঙ্গ

মিলন

অনুমান মিথ্যা হইল। মিসেস কেনী সেদিন আসিয়া পঁহুছিলেন না। প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণের দ্বিতীয় একটী চিন্তার কারণ হইল। আজিকার দিনও যায় যায়। কিন্তু

কুঠীর আমলা, চাকর, নেগাহবানগণ সকলেই দেখিল যে, কেনী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিয়া শয়নগৃহের সম্মুখস্থ ফুল বাগানে ধীরে ধীরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। বাগানের সংলগ্ন কালীগঙ্গা, দুই একবার ফিরিয়া ঘুরিয়া কালীগঙ্গার তীরে যাইয়া দক্ষিণমুখী হইয়া দূরবীন দ্বারা কি যেন দেখিতেছেন। হরনাথ মিশ্র সময় বুঝিয়া বন্দী মীর সমসের আলীকে লইয়া বাগানের গেটের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। কেনী দ্বিতীয়বার ঘুরিয়া আসিতেই হরনাথের উপর নজর পড়িল। একটু ত্রস্ত পদে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি? কাজী সাহেব এবেশে কোথা হইতে আসিলেন।

হরনাথের মুখে কথা ফুটিতে না ফুটিতেই কাজী সমসের আলী বলিতে লাগিলেন সাহেব! তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় লিখিয়া লও। আর আমরা বাঁচি না। আর প্রাণে সহ্য হয় না।

কেনী একটু মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন।—কি হইয়াছে? আপনি এত দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই কেন? এত দিন কোথায় ছিলেন? ভাল আছেন ত? লোকে আগে বুঝে না, শেষে পায় ধরিয়া কান্দিতে থাকে। আচ্ছা আর আমার কোন আপত্তি নাই। সকলই মিটিয়া যাইবে—লিখা পড়া কল্যই হইবে। আর আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

কাজী সাহেব বলিলেন।—ব্যস্ত আমরাই এখন বেশী হইয়াছি। প্রাণের মায়া বড় মায়া। আর অধিক কি বলিব! পৈতৃক তালুক, জোত ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু আছে, সমুদয় লিখিয়া লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন। আর বাঁচি না। দোহাই আপনার। প্রাণ গেল—আর বাঁচি না।

কেনী "বাঁচি না বাঁচি না" করিতেছেন, আগে বুঝেন নাই কেন? আচ্ছা, আজ কোন কথা হইবে না। বোধ হয় মেম সাহেব এখনই আসিয়া পৌঁছিবেন। আমি তাঁহার বজরার মাস্তুল দেখিতে পাইয়াছি। বোধ হয় কুঠীর বজরাই আসিতেছে! আপনি এখন আপনার বাসস্থানে গমন করুন। কাল লিখা পড়া হইবে—আজ দিব্বি আহার করিয়া শয়ন করুন গে।

কাজী সাহেব মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিলেন—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। বরাতে যাহা আছে তাহাই আহার করিব। কোন্ পাপে ইহা ঘটিল—খোদায় মালুম। আর আপনাকে কি বলিব। চলিলাম, আপনার গুদাম ঘরেই চলিলাম।

কেনী মুচকি হাসির আভা দেখাইয়া আবার নদীর তীরে যাইয়া দূরবীন চক্ষে ধরিলেন। দেখিলেন, এবারে স্পষ্ট দেখিলেন। সেই বজরা—সেই তাঁহারই কুঠীর বজরা। যে বজরায় মেম সাহেব কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুবাতাস পাইয়া পাইলভরে জল কাটিয়া স্রোত ঠেলিয়া যেন উড়িয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে বজরা নিকটবর্ত্তী হইল, পাইল পড়িয়া গেল সকলেই দেখিল মেম সাহেব ছাতের উপর ইজী চেয়ারে বসিয়া কুঠীর দিকে তাকাইয়া আছেন। মুহূর্ত মধ্যে বজরা ঘাটে লাগিল। লাগিবামাত্র সিঁড়ী পড়িল। টি, আই, কেনী

ত্রস্তপদে যাইয়া প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিলেন। কমলমুখীর কমলদলসদৃশ মুখমণ্ডলের সুখবোধ স্থানে বার বার চুম্বন করিলেন। এবং প্রাণ প্রতীমার দক্ষীণ হস্ত বাম বগলে চাপিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ী দিয়া নামিয়া ফুলবাগানে প্রবেশ করিলেন। মেম সাহেবের আসবাব লওয়াজিমা ঘরে উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী জগৎ অস্বীকার করিয়া লোকের চক্ষুজ্যোতি হরণ করিলেন। বিরামদায়িনী নিশা সমাগতা হইয়া পুরাতন দম্পতির বিচ্ছেদের পর মিলন সুখের সুযোগ করিয়া দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে তারাদল ফুটিতে ফুটিতে সময় সময় মিটি মিটি ভাবে চাহিতে চাহিতে বিমান রাজ্যে বিহার করিতে করিতে ক্রমে রজনীর সোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পুরাতন দম্পতি বিশ্রাম গৃহে, মখমল মণ্ডিত কৌচে উপবেশন করিয়া হাসিমুখে নানা প্রকার কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

সোনাউল্লার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সর্দ্দার বেহারার ছুটা ছুটীর অন্ত পায় কে? দেয়ালগীর, ল্যাম্প, লণ্ঠন, হাত বাতী যেখানে যাহা প্রয়োজন মনের আনন্দে জ্বালিয়া দিয়া মেম সাহেবের শয্যার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

নিয়মিত সময় সাহেব, মেমসাহেব আহারাদি সমাপন করিয়া আপন আপন শয্যায় গমন করিলেন। মিসেস কয়েক মাস পরে কুঠীতে আসিয়াছেন। পরিবর্তনশীলা জগতে পরিবর্তন কথা নূতন নহে। মিসেস কেনী রাত্রিবাস পরিধেয়ে অঙ্গ ঢাকিয়া পালঙ্গে বসিয়াছেন। মনে নানা কথা উদয় হইয়াছে। স্বামীর হাব, ভাব, চাকরদের মুখভাব দেখিয়া তাঁহার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিতকালে, বিশেষ কোন ঘটনা যেন ঘটিয়া গিয়াছে। কি ঘটিল? কি হইল? এমন ঘটনা কি? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তা করিলেন, কত কিছুই স্থির হইল না। স্বভাবতঃই হউক কি চিত্তের বিকারেই হউক, কি দশ বার দিন নৌকায় থাকা গতিকে মাথার দোষেই হউক, স্থির করিলেন, একটী স্থির করিতে দশটীর প্রমাণ পাইলেন। প্রথম বজরায় স্বামীর করস্পর্শ—সে পরশে যেন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চ হয় নাই, সে অপূর্ব্ব বিজলী ছটা শরীরের নানা স্থানে খেলা করিয়া যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। সে অপূর্ব্ব রসময় প্রেম চুম্বনে প্রেমানুরাগ যেন বৃদ্ধি করে নাই। বজরার সিঁড়ী হইতে নামিবার সময়, হরিহরআত্মা হইয়া নামিয়াও প্রেম উল্লাসে মন গলিয়া যায় নাই। কারণ কি? তাইত একত্র একাসান বসিয়াও হৃদয়কমল, অনুরাগ প্রতিভায় যেন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। গায়ে গায়ে মিশিয়া একত্র আহারেও যেন পূর্ব্বের ন্যায় সুখ বোধ হয় নাই।—তৃপ্তি জন্মে নাই। সুমধুর স্যাম্পিনের গ্লাস স্বামী হস্তে গ্রহণ করিয়াও যেন মন খোলে নাই। কারণ কি অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক কথা মনে তুলিলেন, কিছুতেই মন বুঝিল না। শান্তি সুখে মন ডুবিল না—মজিল না। কেন এমন হইল? দোষ কাহার? লজ্জিত হইলেন। নিকটস্থ বৃহৎ দর্পণে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। উপস্থিত চিন্তার সমালোচনার ফল প্রকাশ হইতে বাকি রহিল না। সে মনোবেগ আমাতে

প্রবেশ করিবে, আমার মনোবেগ তাঁহাতে যাইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইল দোষ তাঁহার? তাঁহারই মনে যেন কি বসিয়াছে। স্বামী হৃদয়েই যেন কি পশিয়াছে। পুরুষের হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করিতে কতক্ষণের কাজ। চিন্তা কি? আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, বুঝিতেই পারিবে। কয়দিন গোপন থাকিবে? রাত্রও অধিক হইয়াছে। কয়েক দিন জলের উপর থাকিয়া এখনও যেন মাথা দুলিতেছে। একটু ঘুমাই।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

অধঃপাতের সূত্রপাত

ময়নার মৃত্যুর পর জকি প্রায়ই সুন্দরপুর যাইত। দুই তিন দিন থাকিয়া আবার আসিত! জকীর প্রতি টি, আই, কেনীর বিশেষ অনুগ্রহ। ময়নার মৃত্যুর পর জকীর ইচ্ছাধীন চাকুরী হইয়াছে। জকী অভাবে কোন কাজকর্ম্ম আর বদ্ধ থাকে না। গুদামের চাবি, দানার গোলার চাবি, জমাদারের হস্তে গিয়াছে। জকীর ছোট স্ত্রী মাখ্‌না সপত্নীর নিকট যে কয়েকটী কথা শুনিয়াছিল, তাহা তাহার প্রতিবর্ণ অন্তরে বসিয়া গিয়াছে। জকীকে দেখিলেই মাখ্‌নার শরীরে আগুন জ্বলিয়া উঠে। মাখ্‌না ভ্রূকুঞ্চিত করে, চক্ষু পাকল করে, ভার ভার মুখখানি আরও ভারি করিয়া সরিয়া যায়। জকীর মুখ দেখিতেই একবারে নারাজ। কি করে, উপায় নাই। আর কি করিতে পারে?

ভারতে স্ত্রীর নিকট স্বামীর বড়ই মান ও আদর। বড় করিয়া কথা কহিতেও ভয় করে। স্বামী দেবতা, স্বামী অনুদাতা, স্বামী বিধাতা, স্বামী ত্রাণ কর্তা,—স্বামীই বুদ্ধি, স্বামীই বল, স্বামীই সকল, স্বামী পদসেবা করাই কুলস্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম। জকী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সুন্দরপুরের কোন লোক আজ আসিয়াছিল? মাখ্‌না বলিল—"একটি লোক আসিয়াছিল। তোমার নাম করিয়া ভাই! ভাই! বলিয়া, কয়েকবার ডাকিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। বাটীতে কেহই ছিল না আমি কোন কথার উত্তর দেই নাই।"

জকী রোষ ভরে বলিল—"এমন হতভাগিনী ত আর দেখি নাই যে, আমি বাটীতে নাই বলিয়া কি আর কাহার সহিত কথা কহিতে নাই? তোদের ত বুদ্ধি নাই। তোরা মানুষও নহিস্। বনের পশুও নহিস্। একটি কাজ নষ্ট হইয়া গেল।" মাখনা বলিল—"আমি কি জানি, তোমার সহিত তাহার কি কাজ। ভাই ভাই করিয়া ডাকিল, আমি বেড়ার আড়ালে থাকিয়া দেখিলাম, সে একা নহে। তাহার সঙ্গে আরও একটি লোক আছে। আর সেই লোকটির বগলে কাপড়ে জড়ান একটা ভারী কি জিনিস আছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া বগল হইতে কাপড়ের পুঁটলী মাটিতে ফেলিতেই বোধ হইল যেন কতকগুলি পয়সা কি টাকাই একত্রে বান্ধা।'

জকী শুনিয়াই অস্থির। প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল—"তোদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই!

আমি সাহেবের কুঠীতে থাকিয়া দেখিতেছি, নূতন কোন সাহেব আসিলে, মেম সাহেব নিজে যাইয়া আগু বাড়াইয়া আনেন। দুইজনে চুমা খাওয়া হয়, গলায় গলায় মিশিয়া হাত ধরাধরি হয়। তোরা কোন কার্য্যের নহিস্। কেবল ঘোমটা—তোদের কেবলই ঘোমটা।"

"আমি গরীব দুঃখী বাঙালীয় মেয়ে, বাঙ্গালা আমাদের দেশ। আমার দেশের চাল চলন যাহা আছে, তাহাই করিব! সাহেব বড়লোক, দেশের রাজা। তাঁহারা যাহা করেন, আবার সে সকল দেখিয়া দরকার কি? আমি গরীব মানুষ, মেম সাহেবের মতো ব্যবহার করিতে আমার ক্ষমতা নাই। হইবেও না।"

"আমি জানি, যে আমার ঘরের লক্ষ্মী ছিল সে চলিয়া গিয়াছে।"

"সে চলিয়া গিয়াছে না বাঁচিয়াছে। তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি টাকার লোভে তাহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাকে যে পথে চালাইয়াছ, যে প্রকারে বাঘের মুখে,—মানুষ বাঘের মুখে ধরিয়া দিয়াছ, তাহা সকলি শুনিয়াছি। তুমি টাকা হাতে পাইলে না পার এমন কোন কুকাজ দুনিয়া জাহানে নাই। সে কি করিবে? তোমার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। নিজের প্রাণ নিজে দিতেও কত দিন সে প্রস্তুত হইয়াছে, পারে নাই। নিরূপায় হইয়া তোমার অত্যাচার সহিয়াছে। স্বামী হইয়া যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ। সে পাপের ভোগ তোমাকে কোন দিন ভোগ করিতেই হইবে। তা যা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। আমি তোমার দুখানি পায় ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার বাপ মায়ের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইয়া দেও। আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। অনেক দিন হইতে মাকে দেখি না—বাবাও আর এখানে আসেন না। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই উচাটন হইয়াছে। আমি খোদার নাম করিয়া বলিতেছি, এখানকার কোন কথা আমি কাহার নিকট বলিব না। আমাকে শীঘ্রই পাঠাইয়া দেও। কিছুদিন পরে আমি আবার আসিব। তুমি না পাঠাও, তাহাদিগকে খবর দিলে তাহারা আমাকে লইয়া যাইবে।"

জকীর মুখে কথা নাই। যে কথা কেউ জানে না—মনের অগোচর, স্বপ্নের অগোচর, সেই কথা তুলিয়া এত কথা বলিল। জকীর গা দিয়া ঘাম ছুটিল। রোষ ভাব বহু দূর সরিয়া গিয়া লজ্জায় মাথা নীচু হইল। কালমুখ আর কাল হইয়া গেল। এই সময় বাহির বাটী হইতে, কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, ভাই জকী বাড়িতে আছে?

জকী গলার আওয়াজেই চিনিতে পারিয়া ভাঙাস্বরে উত্তর করিল—ভাই! বাড়ীর ভিতরে আইস। আমার ঘরের লক্ষ্মী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন এক অলক্ষ্মীর হাতে পড়িয়াছি—আর আমার ভালাই নাই।

আগন্তুক বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত। জকী আদর করিয়া একখানি পিঁড়ী আনিয়া দিল, আগন্তুক ভ্রাতা ছাতি লাঠি সম্মুখে রাখিয়া পিঁড়ী পাতিয়া বসিল। তখনই তামাক, তখনই হাত পা ধুইবার জল, তখনই জলযোগের (নাস্তার) খই, বাতাসা·ভাইয়ের সম্মুখে দিয়া ময়নার মরণ কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া নানা প্রকার দুঃখ করিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল—"ভাই। দুঃখ করিয়া আর কি লাভ হইবে। সেকি আর ফিরিয়া

আসিবে? যে ভাল হয় সে থাকে না। এখন কথা শুন। আমি আবার এখনই যাইব। বড় জরুরি কাজ।"

"কথাত শুনিয়াইছি, আমিও প্রস্তুত আছি। তবে কথাটা কি জান? আশা অনেকেই দেয়, কার্য্য উদ্ধারের জন্য অনেকেই কথা বলিয়া থাকে। কার্য্য শেষ হইলে বুঝিতেই পার—তুমি বা কে আমি বা কে?"

"সে কি কথা! তুমি কি আমাকেও অবিশ্বাস কর?"

জকী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে লাগিল "না—না তাও কি হয়! তোমায় অবিশ্বাস করিব? তাও কি হয়?"

তবে আর আপত্তি কি? আর দেখ তোমাকেইত আগে বিশ্বাস করিয়াছে। কিছুই হয় নাই। কাজের কিছুই হয় নাই। আগেই তোমার হাতে একটি নয়, দুইটি নয়, দশটি নয়, পাঁচ শত দিয়াছে। আর চাই কি? অর্দ্ধেকতো হাতেই আসিয়াছে। আবার আমিও কিছু আনিয়াছি। এরপর যাহা বাকি থাকিবে, তুমি আমার নিকট হইতে লইও। তুমি জানিও, এদিকের চন্দ্র ওদিকে গেলেও সে ঘরের কথা, একটুও এদিক ওদিক হইবে না। এখন তুমি পারিলে হয়। আর আমি বেশীক্ষণ তোমার বাটীতে থাকিব না। এই টাকা আর এই সেই জিনিস নেও, যত শীঘ্র হয় করিবে। আমি চলিলাম।"

জকী টাকার তোড়া এবং কাঠের ছোট একটি কৌটা ত্রস্তে ভাই সাহেবের হস্ত হইতে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ভাই সাহেবও ত্রস্তপদে বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

জকী ঘর হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীকে বলিল,—"তুমি প্রস্তুত হও, আমি বেহারাবাড়ী চলিলাম আজই তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

জকী বাড়ীর বাহির হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এ বালাইকে আর এখানে রাখিব না। আ'জ আমাকে বলিল, কা'ল আর একজনকে বলিবে, ক্রমেই কথা প্রকাশ হইবে। ভাল হইল, কিছুদিন বাপ মার বাড়ী গিয়া থাকুক।

ঊনবিংশ তরঙ্গ

বিষ

জকী স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া কুঠীতে হাজিরা দিতে আসিয়াছে। সে দিন নাই, সে কাল নাই, সে আদর নাই, জকীর সে খাতির নাই। জকীর নামে কাহার ভয়ও নাই। প্রতি দিন হাজিরা দিতে হয়। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে, মেম সাহেবের বকুনি খাইতে হয়। কিন্তু মেম সাহেবের কামরা ব্যতীত জকীর সকল স্থানেই যাওয়ার অধিকার আছে। সেটা এখনও বারণ হয় নাই।

অন্য কক্ষে সাহেব, মেম উভয়ে ব্রাণ্ডিপানীর স্বাদ লইতেছেন। মিসেস কেনী পূর্ব্বে ব্রাণ্ডির নাম শুনিতে পারিতেন না—এবার বিলাত হইতে আসিয়া, খুব চালাইতেছেন। সকল সময় হাসি খুশী বাজনায় গানে সময় কাটাইতেছেন।

জকী মেম সাহেব নিকট হাজীরা দিয়া সেলাম বাজাইয়া দিয়া বিদায় হইল। কিন্তু বাড়ীতে আসিল না। একবার নীচে একবার উপরে, একবার বাবরচি খানায় একবার সাহেবের লিখিবার ঘরে, এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জকী যেন মনে মনে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কোন জিনিস খুঁজিবার ভাব নহে। সময় খুঁজিতেছে। সুযোগের সন্ধান করিতেছে।

খানসামা সর্দ্দার বেহারা সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া নানা প্রকারের গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছে। জকী পুনরায় উপরে আসিল। খানার মেজ সাজান। সাহেব মেম অন্য কামরায়। খুব হাসিতামাসার রগড় চলিতেছে। জকী ক্রমে ক্রমে খানার কামরায় উপস্থিত। চারদিকে তাকাইয়া অগ্রসর, আবার তাকাইয়া আরও অগ্রসর—চারদিক দেখিয়া দাঁড়াইল। কমরের খুঁট হইতে একটা কৌটা বাহির করিল। কৌটার পরিচয় আর বিশেষ করিয়া কি দিব। সেই কৌটা ভায়ের দত্ত কৌটা। কৌটা হইতে কি যেন উঠাইয়া চাদানীর মধ্যে ফেলিয়ে দিল। চাদানীর সরপোষ দিয়া পূর্ব্বমত ঢাকিতেই ভয়ে হাত কাঁপিয়া উঠিল! সরপোষের প্রতিঘাতে একটু শব্দ হইল! ঠিক ভাবে পূর্ব্বমত সরপোষ বসিল না। ভাল করিয়া পূর্ব্বমত ঢাকিতেও আর সাহস লইল না। তাড়া তাড়ী অন্য দরজা দিয়া নীচে নামিয়া গেল। সোনাউল্লা, সর্দ্দার বেহারার খোশ গল্পে মন মাতাইয়া বসিয়াছিল। খানার কামরা মধ্যে হঠাৎ একটি শব্দ হইয়া তাহার কানে গিয়াছিল! কিন্তু উঠিয়া আসিয়া দেখা, কি, কি কারণে শব্দ তাহার কারণ অনুসন্ধান করা তত আবশ্যক মনে করিল না। কারণ মুখ ফিরাতেই দেখিল যে, জকী সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিতেছে। আর কোনরূপ সন্দেহের কারণই হইবার কথা নহে। জকী ঘরের চাকর, সাহেবের বিশ্বাসী ও ভালবাসা। অন্য লোক হইলে তখনই উঠিত। কি কারণে শব্দ হইল তাহার অনুসন্ধান করিত। জকীকে চিনিয়া আর উঠিল না। কান পাতিয়া রেঙ্গুনের গল্প শুনিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই মেম সাহেবের হাত ধরিয়া কেনী খানার কামরায় আসিলেন। সোনাউল্লা বেহারা প্রভৃতি চাকরেরা হাজির। খানার বাসনের সরপোষ উন্মোচন হইল। ছুরী কাঁটা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে স্যাম্পিনের কাক ফুটিতে আরম্ভ হইল। প্লেট বদল হইতেছে। ছুরী চলিতেছে। গ্লাস উড়িতেছে। একটীর পর একটী খাদ্য উদরে ঢুকিতেছে। পরস্পর কথাবার্তাও হইতেছে, উচ্চহাসি মৃদু হাসি উভয়ের মুখেই দেখা দিতেছে। পাকা এক ঘণ্টার পর আহার শেষ হইল। এখন 'চা' খাওয়ার পালা। সোনাউল্লা চা দানীর নিকট গিয়া দেখে যে, চা দানীর সরপোষ নিয়ম মত বসান নাই। কোন অজানা লোক সরপোষটী চাদানীর উপর রাখিয়া গিয়াছে সন্দেহ হইল। সোনাউল্লার মনে সন্দেহ হইল। হঠাৎ সেই শব্দের কথা মনে পড়িল। সোনাউল্লা অনেক বিবেচনা করিয়া, সাহেবের নিকট জোড় হাতে বলিতে

লাগিল—"হুজুর,! এই চা দানীর সরপোষ আমি যে ভাবে রাখিয়াছিলাম, ঠিক সে ভাবে নাই। আর একটি কথা—আমি বাহিরে বসিয়া ঘরের মাঝে একটী শব্দও শুনিতে পাইয়াছিলাম। সেই সময় জকী এই ঘর হইতে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিল। তাহাও দেখিয়াছি। আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। যেই হউক চাদানীর সরপোষ উঠাইয়াছে!"

সাহেব চাদানীর নিকট যাইয়া বলিলেন—"জকী খানার কামরায় আসিয়া চাদানী নাড়িবে কেন?"

সোনাউল্লা বলিল—"সেত চিরকালক খানার কামরায় আসিয়া থাকে।"

মিসেস কেনী বলিলেন—"খানার ঘরে তাহার কাজ কি? সে এখানে কেন আসিবে? তোমরা এ ঘরে তাহাকে আসিতে দাও কেন? শুনিয়াছি যে, সে ঘরের কাজের চাকর। তার যে কি কাজ, তাহা আমি দেখি নাই। অথচ সে ঘরের চাকর—কি অন্যায় কথা।

মেম সাহেব চাদানী হইতে, প্যালায় চা ঢালিয়া কেনীকে দেখাইলেন—চার আসল রঙ্গ নাই। একটু ময়লা ময়লা রঙ্গ! বেশী কড়া হইলেও এরূপ হয় না। টি, আই, কেনীর মনে সন্দেহ হইল। প্যালার চার মধ্যে এক টুকরা রুটি ভিজাইয়া মেম সাহেবের কুকুরকে খাইতে দিলেন। টরী লেজ নাড়িতে নাড়িতে চপর চপর শব্দে বিষাক্ত রুটি উদরস্থ করিল। কেনী ঘড়ী ধরিয়া খানার কামরাতেই বসিয়া রহিলেন। ত্রিশ মিনিট অতীত হইতে, টরী ভারী অস্থির হইল। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, একখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। গড়াগড়ী দেয়! অস্বাভাবিক স্বরে খেউ খেউ করে। খানসামা, খেদমতগার, বাবরচির মুখ শুখাইয়া গেল। এক ঘণ্টা পূর্ণ না হইতে টরী মাটিতে হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। গড়াগড়ী পড়িয়া হাউ মাউ শব্দ করিতে করিতে একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া গেল। সোয়াঘণ্টার মধ্যে কুকুরের চেতনা রহিত, মৃত্যু।

কেনী ক্রোধে অধির হইয়া জমাদারকে ডাকিয়া বলিলেন—"যত সর্দ্দার, বরকন্দাজ, লাঠীয়াল আমার চাকর আছে, এই মুহূর্তে যাইয়া জকীকে বান্ধিয়া আমাব সম্মুখে উপস্থিত কর।"

জমাদার সেলাম বাজাইয়া, তখনই লাঠী ঘাড়ে করিয়া ছুটিল। জকীর প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। অনেকে পূর্ব্ব দাদ তুলিতে সর্দ্দারের সঙ্গি হইয়া জকীকে ধরিয়া আনিতে চলিল। কেনী—সোনাউল্লা, সর্দ্দার, বেহারা, বাবরচি, মশালচি, পাখাওয়ালা সমুদয় চাকরকে আটক করিয়া রাখিলেন।

জমাদারদিগকে জকীর বাড়ী পর্যন্ত যাইতে হইল না। জকী কুঠীতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সাহেবের খানা খাওয়া হইলে ছট্‌ফটী দেখিয়া সুন্দরপুর যাইবে, মনস্থ করিয়াছিল। তাহা আর ঘটিল না। ঈশ্বর টি,আই, কেনীকে রক্ষা করিলেন। এক জনের চক্ষে পড়িতে পড়িতে জকী দশ জনার চোখে পড়িয়া ধৃত হইল। বন্ধন অবস্থায় সাহেবের নিকট আনীত হইল, সাহেব দালানের খাম্বার সহিতে বান্ধিতে আদেশ করিয়া, শ্যামচাঁদ বাহির করিয়া আনিতেই

জকী বলিতে লাগিল—হুজুর! আমাকে প্রাণে মারিবেন না। আমি যখন ধরা পড়িয়াছি আমার জীবন শেষ হইয়াছে। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

টি, আই, কেনী কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চার ঘা মারিতেই জকী বলিতে লাগিল—আমি বিষ দিয়াছি। ধর্ম্মবতার! আমি চার মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়াছি। বিষের কৌটা এখনও আমার কোমরেই আছে। সাহেব প্রহার ক্ষান্ত দিয়া কোমরের কাপড় খুলিতে খুলিতে কৌটা পড়িয়া গেল, আর জকীকে প্রহার করিলেন না। বন্ধন অবস্থায় একটি কক্ষে তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন! আরও আদেশ করিলেন যে, এই রাত্রেই জকীর বাড়ী, ঘর, দ্বার ভাঙ্গিয়া কালীগঙ্গায় ভাসাইয়া দেও। মালামাল, টাকা কড়ী যাহা থাকে, সমুদয় কুঠীতে লইয়া আইস।

আদেশমাত্র রামইয়াদ, ধনইয়াদ, লছমীপৎ সিং, রামলাল তেওয়ারী, কুড়ান, জুড়ান, নবীন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সর্দ্দার, দেশওয়ালী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কুঠীর বাজে চাকর যাহারা চিরকাল জকীর নামে হাড়ে চটা তাহারাও লাঠীয়ালদিগের সঙ্গে যাইয়া জকীর বাড়ী লুট আরম্ভ করিল।

জকীর স্ত্রী পূর্ব্বেই পিতার বাটীতে গিয়াছিল। বাটীতে কয়েকজন চাকরমাত্র ছিল। কে কোথায় পালাইল, তাহার আর সন্ধান হইল না।

টি, আই, কেনীর চক্ষে সে রাত্রে নিদ্রা নাই। কুকুরের দশা যাহা স্বচক্ষে দেখিলেন নিজের অবস্থাও তাহাই ঘটিত—এই সকল চিন্তা করিয়া আরও নানা প্রকার কথা মনে উঠিল। চিন্তিতভাবেই সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রত্যুষেই প্রধান কার্য্যকারক হরনাথকে ডাকিয়া জকীর অবস্থা বলিলেন। আর আদেশ করিলেন যে, তুমি নিজে যাইয়া দেখ, জকীর সমুদয় ঘর ভগ্ন হইয়াছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে—একবারে সমভূমি করিয়া কালী গঙ্গায় ফেলিয়া দিও। বাড়ীর নিশানমাত্র না থাকে। এবং ভিটায় চাষ দিয়া এখনই নীল বুনানী করিয়া আসিবে ইহার কোন বিষয়ে ক্রুটি না হয়।

হরনাথ সেলাম বাজাইয়া মনিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চাহিলেন। সাহেব পুনরায় ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। আর একটী কথা। মুসলমানেরা কবরকে বড় মান্য করে। কোন কবরের উপর যেন চাষ দেওয়া না হয়। সাবধান! আমি এখনই জকীকেও পাবনায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান করিব।

হরনাথ পুনরায় সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন। টি, আই, কেনী পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া জকীকে বন্ধন করিয়া পাবনায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরে জকীর স্বীকৃত জবাবে বিষ পরীক্ষার পর সেসনের বিচারে জকীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হইল। জকীর স্ত্রী পিতা মাতার বাড়ী থাকিয়া স্বামীর অবস্থা শুনিয়া কান্দিয়া নাকের নথ, হাতের চুরি সমুদায় খসাইয়া ফেলিল। জকীর প্রসঙ্গ, জকীর দ্বীপান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শেষ হইয়া গেল।

বিংশ তরঙ্গ

ভৈরব বাবু

পাংশা স্টেশনের নিকটেই ভৈরব বাবুর বাড়ী। ভৈরব বাবু বনিয়াদি বাবু। যে সময়ের কথা, সে সময় বাবুর সংখ্যা বড়ই কম ছিল। বাবু বলিতে ভৈরব বাবু। বিশেষ মান্য গণ্য, বনিয়াদি, ঘরানা, সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব সকলের প্রিয় যিনি, তিনিই বাবু নামে পরিচিত হইতেন। সুদু আলবার্ট কেতায় চুল কাটাইয়া সিঁথির বাহার উড়াইলে সে সময় বাবু হওয়া যাইত না। বাবুর বাজার বড়ই কড়া ছিল। ভৈরব বাবু যথার্থ বাবু। ভৈরব বাবুকে জব্দ করাই এখন কেনীর মতলব। মীর সাহেব ভৈরব বাবু সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। বাবুকে বিশেষ কোনরূপ বিপদগ্রস্ত না করিয়া তাঁহাকে একটু জব্দ করাই কেনীর নিতান্ত ইচ্ছা। সকলেই বলে ভৈরব বাবু ভারি চতুর, বুদ্ধিমান, সহজে ঠকিবার পাত্র নহেন। কেনীর তাহা সহ্য হয় না। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, বাঙ্গালী সুচতুর, বাঙ্গালী বিচক্ষণ একথা কেনীর সহ্য হয় না। ভৈরব বাবুকে আচ্ছা করিয়া জব্দ করিয়া সাধারণকে দেখাইবেন, বিলাতী চাল চালিয়া বাবুকে মাত করিবেন, এই আশাতেই বড় সাবধানে ব'ড়ে টিপিতেছেন। বাবুও কম নহেন, আত্মরক্ষায় খুব সাবধান হইয়াছেন। তিনিও তোখড় খেলওয়াড়, সহজে পড়িতেছেন না।

কেনীর প্রধান গোয়েন্দা ফটীক, আর হরিদাস। ফটীক প্রায়ই ফকীর বেশে, গোয়েন্দাগিরী করে। হরিদাস বৈরাগী সাজিয়া খমক বাজাইয়া মনিবের কার্য্যোদ্ধার জন্য গান করিয়া বেড়ায়। সময় সময় খন্‌জনীও বাজায়।—ভিক্ষাও করে।

ভৈরব বাবুর চাকরেরা সন্ধানে জানিয়াছে যে, এবারে লাটের কিস্তীর খাজনা যশোহরে যাইতেই, যে কৌশলে হউক পথ হইতে কেনী লুটপাট করিয়া লইবে।

বাবুও সেকথা শুনিয়াছেন।

খাজনা দাখিলের দিন নিকটে আসিল। আমলারা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, বাবু খাজনা পাঠানের কোন উপায় করিলেন না। পথে কেনী এবারে নিশ্চয়ই টাকা লুটিয়া লইবে। তাহার ইচ্ছা এই যে, টাকা লুটিয়া লইলে, যশোহরের খাজনা দাখিল হইবে না। মহাল লাটে উঠিবে। যত টাকাই হউক, নিলাম ডাকিয়া খরিদ করিবে। বাবু সে বিষয় কোনই জোগাড় করিতেছেন না। কেনী যে দুরন্ত লোক—সে যাহা মনে করিয়াছে, তাহা করিবেই করিবে। সম্পত্তি নিলামে উঠিলে কি আর রক্ষা আছে? কার সাধ্য কেনীর সম্মুখে নিলাম ডাকে? কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন, কথাটা এমন গুরুতর নহে। নোট খরিদ করিয়া ডাকে পাঠাইলেইত হইতে পারিত সে সময় নোটের চলতি এত ছিল না।

ডাক বিভাগের অবস্থাও এত ভাল ছিল না। মহকুমা ব্যতীত গ্রামে গ্রামে ডাকঘরও ছিল না। টাকারই কারবার। নগদ টাকারই বেশী চল্‌তি।

ভৈরব বাবুর বৈঠকখানা অতি পরিস্কার। ফরাসের চাদর, বড় বড় তাকিয়ার খোল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। বাবু বড় একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। সোনা বান্ধান, রূপা বান্ধান হুঁকগুলি ধুতরাফুলের কল্‌কি, ও রূপার সরপোষ মাথায় করিয়া বৈঠকের উপর বসিয়া আছে। গুড়গুরীও মজলিসে স্থান পাইয়াছে। শ্যামাদানে বাতি জ্বলিতেছে, দুই একটি দেয়ালগিরীও নারিকেল তেলে জ্বলিতেছে। ভৈরব বাবু বড় সৌখিন, সঙ্গীত বিদ্যায় মহা পণ্ডিত। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। অদ্যও হইতেছে। প্রধান শিষ্য মাধবচন্দ্র রায় তানপুরা লইয়া, সুরট, মল্লার, খেয়াল ধরিয়াছেন। বাবুর মধ্যম পুত্র দেব বাবু পাখওয়াজ বাজাইতেছেন। পিতার নিকটেই শিক্ষা, অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা পাখওয়াজ তবলায় দেব বাবুর হাত খুব খুলিয়াছে। চমৎকার বোল উৎরিয়াছে। অশ্লিলতা, শ্রুতি-দোষ, দোষভাবাপন্ন কোন প্রকার গান তাঁহার বৈঠকখানায় স্থান পাইবার অধিকার ছিল না।

প্রধান কার্য্যকারক মহাশয় সেলাম বাজাইয়া দণ্ডায়মান হইলে ফরাসের এক পার্শ্বে বসিতে অনুমতি পাইলেন। সে সময় আর খাজানা পাঠানের কথা কহিতে অবসর পাইলেন না। কেনীর চক্রান্তের কথাও বিশেষরূপে বাবুকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না। সেদিন বড় জাঁকাল মজলিস্‌। প্রাচীন নগর দিল্লী হইতে বিখ্যাত কালওয়াত খাজা খাঁ আসিয়াছেন। মাধব বাবু গান শেষ করিয়া তানপুরা রাখিলেন। খাজা খাঁ বৃহৎ এক তানপুরা লইয়া, সাত আটবার সেলাম বাজাইয়া তানপুরা ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

খাজা খাঁ দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় সাদা পাগড়ী, দাড়িগুলিও সম্পূর্ণ সাদা, —পাগড়ী, দাড়ি আর দন্ত এই তিনটি সাদা জিনিসেই সকলের দৃষ্টি পড়িতেছে। তানপুরার আড়াল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চেহারায় খাজার সাদা জিনিস কয়েকটি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না।

খাজা খাঁ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত গান করিলেন। দুশ বাহার পড়িতে লাগিল। খাজা খাঁও সেলাম বাজাইতে বাজাইতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কালওয়াতজির গান শেষ হইলে মাধব রায় পুনরায় গান ধরিলেন। রায়জি মাথা মুখ হাত নাড়িয়া গলাবাজী করিতে ত্রুটি করিলেন না। খাজা খাঁ পর্যন্ত রায়জিকে বাহবার বাতাসে খুব দোলাইয়া দিলেন। বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালাদেশে এই প্রথম তানলয় পরিশুদ্ধ গান আজ শ্রবণ করিলেন। রায়জির আনন্দের সীমা নাই। মজলিস্‌ ভাঙ্গিয়া গেল। তানপুরা খোলে পুরিয়া কালওয়াতজি বিশ পঁচিশবার সেলাম বাজাইয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজলিসের অধিকাংশ লোক বাহিরে আসিল। কার্য্যকারক মহাশয় বসিয়াই রহিলেন। তিনি আর উঠিলেন না।

ভৈরব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কথা আছে নাকি?

কার্য্যকারক মহাশয় বলিলেন—হুজুর! কেনীর কথাত ক্রমেই বেশি বেশি শুনিতেছি।

পথে পথে লোক রাখিয়াছে। গোয়েন্দা রাখিয়াছে। শুনিতেছি লাটের খাজানা যশোহরে লইয়া যাইতেই সুযোগ ও সুবিধা মত—দিনে হউক রাত্রে হউক, যে উপায়ে হউক লুটিয়া লইবে। সৰ্ব্বদা সন্ধানী লোক ঘুরিতেছে। কে কোন বেশে, কোন সুযোগে যে আমাদের কাজ কৰ্ম্মের সন্ধান লইতেছে, তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। অথচ আমরা এখানে যে দিন যে কার্য্য করিতেছি, তাহার খবর প্রতি মুহূর্তে সাহেবের নিকট যাইতেছে। আশ্চর্য্য! এমন লোক কে আমাদের এখানে আসা যাওয়া করে যে, তার কল্যাণে এখানকার কোন কথাই আর গোপন থাকে না—যে পরামর্শ, যে গুপ্ত মন্ত্রণা করা হয়, অমনই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এখন উপায় কি? লাটের দিন অতি নিকট, কোন্ পথে, কি উপায়ে টাকা পাঠাইব তাহার কোন উপায় করিতে পারিতেছি না। অন্য কিছু নয়, খাজানার টাকা। দেখুন কি আশ্চর্য্য কথা! যে পথে টাকা পাঠান সাব্যস্ত করি, অমনি সংবাদ আসিয়া পড়ে যে, সন্ধানীরা সে পথেও ঘুরাফিরা করিতেছে। সন্ধি পথে সাহেবের গুপ্ত লাঠীয়াল নিয়োজিত হইয়াছে। যে বেশেই হউক, যেভাবেই হউক তাহারা গম্য পথে বাধা দিবেই দিবে। টাকাও কাড়িয়া লইবে।

ভৈরব বাবু বলিলেন—আমিও সে বিষয় না ভাবিতেছি তাহা নহে। ঈশ্বর রক্ষা করিলে কিছুতেই মা'র নাই। সেই একমাত্র বল ভরসা। যাহা হউক আগামী পরশু দিবস নিশ্চয় টাকা রওয়ানা করিব। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে আর উপায় কি? আমাদের যেরূপ সংসার, আয় হইতে ব্যয়ের ভাগই অধিক। খাজনাগুলি মারা গেলে বিষয় রক্ষা করিবার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। লাটের খাজনা যদি সাহেবের হস্তগত হয় তবে বিপদের একশেষ দেখিতেছি। কোথা হইতে আবার টাকা সংগ্রহ করিব। কাজেই একবারে সৰ্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। সৰ্ব্বস্ব যাইবে। ঈশ্বর আছেন।

ভৈরব বাবু এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় দুই জন বাহক বড় বড় দুইটী ঝাঁকা পূর্ণ, নূতন হাঁড়ী মাথায় করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে উপস্থিত, ভৈরব বাবু তাহাদিগকে দেখিয়াই— উঠিলেন, এবং কার্য্যকারক মহাশয়কে বলিলেন রাত্রও অধিক হইয়াছে। খাজনা পাঠানোর সমুদয় বন্দোবস্ত কাল করিব। আপনি বিশ পঁচিশ জন ভাল ভাল লোকের জোগাড় করিয়া রাখিবেন। এই কথা বলিয়াই বাবু বাহকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ তরঙ্গ
খাজানার চালান

রাত্র প্রভাত হইবার বেশি বিলম্ব নাই। চোক্ গেল পাখী জগতের পাপতাপ সহিতে না পারিয়া চোক্ গেল চোক্ গেল করিয়া রব করিতেছে। কেনীর গোয়েন্দা ছদ্মবেশে তখনও

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান লইতেছে। গোয়েন্দা একজন ফকীর একজন বৈরাগী। যেখানে যাঁহার সহিত কেনীর শত্রুতা বিবাদ সেইখানেই গোয়েন্দা, সেইখানেই গুপ্তসন্ধানী। সেইখানেই তাহাদের গমন। ফকীরকেও লোকে ভক্তি করে, বৈরাগীকেও শ্রদ্ধা করে, ভিক্ষাও দেয়। ফকীর বৈষ্ণবের প্রতি কাহারও কোন প্রকারের সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষ গ্রাম্য জমিদার—তায় আবার বহুকালের কথা। সেকাল আর একাল অনেক প্রভেদ। দেউড়িতে নেগাহবান থাকিলেও প্রবেশ প্রস্থানে তত মনোযোগ নাই। বেশি কড়াকড়ী আঁটা আঁটী নিয়মও নাই। অনায়াসেই বাহির আঙ্গিনায়, পূজার প্রাঙ্গণে—ইচ্ছা করিলে অন্দর খণ্ডেও ফকীর বৈষ্ণব যাইতে পারে। কোন বাধা নাই।

গোয়েন্দা যে সংবাদ পায়, সুযোগ মত অনুচর, সহচর, সঙ্গীলোক দ্বারা সমুদায় খবর কুঠীতে পাঠায়। এখন ভৈরব বাবুর বাড়ীতে বৈরাগী বাবাজির আগমন। চারদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধান লইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকদিন বৈরাগী ঠাকুর, বাবুর বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা আনিয়াছেন। সুযোগ আর সময় পাইলে অন্দর মহলে গিয়াও দুই একটী গান শুনাইয়া পাড়ার ছেলেমেয়ে একত্র করিয়া ভিক্ষা করেন। আজ বৈরাগী শেষ নিশিতে উঠিয়া তিলক চন্দন, ফোঁটা কাটিয়াছেন, গায়ে হরিনামের মার্কা মারিয়াছেন। করতাল বাজাইয়া হরিনাম করিতে করিতে ভৈরব বাবুর বৈঠকখানার সম্মুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন।

দেখিলেন যে বাবু অন্দর মহল হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে ৭/৮ জন ভারী বাঁক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইল। বাঁকের দুই দিকে তোড়া বোঝাই। দেখিতে অল্প, কিন্তু খুব ভারী। বাঁকবাহকের ঘাড়ে দুলিয়া পড়িয়াছে। দেউড়ীর পরেই সদর দরজায় আসিলে আটজন দেশওয়ালী ঢাল তরবারী বান্ধা, গোঁপে তা দেওয়া বড় বড় পাগড়ী মাথায় বান্ধা—ভারীদিগকে মাঝে করিয়া ছাতি ফুলাইয়া আগে পীছে চলিল। বাড়ীর বাহির হইলেই ভৈরব বাবু বৈঠকখানায় আসিলেন। বৈরাগীও প্রভাতী গাইতে গাইতে অন্য আর এক বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সূর্য্যোদয় হইতে হইতে দেশওয়ালীরা ভারীসহ গ্রামের বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বৈরাগীও অন্য আর এক পথ দিয়া তাহাদের সঙ্গী হইল। দেশওয়ালীরা সকলেই বৈরাগীকে চিনিত। মনিব বাড়ীতে প্রায়ই দেখিয়াছে। বিশেষ আসিবার সময়েও প্রভাতে প্রভাতী গাইতে শুনিয়াছে।

রাম সিং জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! এদিকে কোথায় যাওয়া হইবে?"

বৈরাগী হাঁটিতে হাঁটিতে—উত্তর করিতে করিতে চলিল—"বাবাজি! একবার ঝিনদর দিকে ভিক্ষায় যাইব ইচ্ছা আছে।"

রাম সিং বলিল—"আচ্ছা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল। এ পথে একটু ঘুরা হইবে, তা হ'ক এক সঙ্গে সকলেই কথায় বার্ত্তায় যাইব।"

বৈরাগী বলিল—"বাবা! আমি ভিখারী, এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই।

তোমরা বাবা বড় লোকের চাকর, তোমাদের সঙ্গে যাওয়া আমার সাধ্য নাই। আমি যে কত দিনে যাইব তাহারও ঠিক নাই। ভগবান যে পথে লইয়া যাইবেন সেই পথেই যাইব।"

রাম সিং বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর আজিকার দিনত একত্রে যাই। নানা কথায় এবং কথার উত্তর প্রতুত্তর, অপর কথা, উড়তি কথা, বাজে আলাপ করিতে করিতে সকলেই যাইতে লাগিল। সকলেই একদম খুব হাঁটিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে রৌদ্রের উত্তাপে গলদঘর্ম্ম হইয়া রাস্তার পাশের একটী বটগাছ তলায় সকলেই দাঁড়াইলেন। হাঁফ ছাড়িলেন। ভারীগণ ভার নামাইয়া গামছার বাতাস খাইতে লাগিল। কেহ কেহ আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে গেল। রাম সিং প্রভৃতি নেগাহবান মাটিতে বসিয়া কান্দের ঝোলান বাটুয়া বাহির করিয়া খর্সান তামাকে চুণ মিসাইয়া হাতের তালুতে আঙ্গুলি দ্বারা টিপীতে লাগিল। কেহ গাঁজার ভাঁটা বাহির করিয়া কাটা ছেঁড়ায় মন দিল, বৈরাগী ভিক্ষার ঝুলি নামাইয়া গৌর নিতাই হরি বোল শব্দে শ্রান্তি দূর করিল।

রাম সিং বলিল—"বাবাজি ত্বরিতানন্দ সেবা হবে কি?"

বৈরাগী বলিল "না বাবা, আমি ও সকল আনন্দে আনন্দিত নই। পেটের ভাত জোটাইতে পারি না, তার উপর আবার আনন্দ করবো!"

"আচ্ছা বাবা! আনন্দ নাই কল্লে, একটী গান কর শুনি। বেশ ছায়ায় বসিয়াছি। বড় জোরে এই তিন কোস পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি, বড়ই মেহানত হইয়াছে। বাবাজি! একটী গান গাও শুনে মনটা স্থির করি।"

রাম সিং প্রভৃতিরা খুব দম্ কসিয়া ত্বরিতানন্দের সেবা করিল। চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। দুই একবার কলিকা ফেরা ঘোরার পরেই পুনরায় রাম সিং, বৈরাগীকে গান করিবার অনুমতি করিলে, বৈরাগী ঝোলা হইতে খন্‌জনী বাহির করিয়া চাটি দিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম সিং না বলিলেও বৈরাগী বাধ্য হইয়া গান ধরিত। সুযোগ পাইতে ছিল না বলিয়া ক্ষান্ত ছিল।

বৈরাগী খুব বড় সুরে গাইতে লাগিল—

"ওরে কল্লি কি বিশখা, একবার এনে দেখা,
মলেম মলেম প্রাণে না হেরিয়া বাঁকা।
আমরা ত জানিনা তোরাইত জানালি,
এমন সরল প্রেমে কেন গরল মাখালি,"—

ইত্যাদি—রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামেই বৈরাগীর গলার আওয়াজ প্রবেশ করিল। ছোট বড়, ছেলেমেয়ে কেহ অর্দ্ধবসন, কেহ শূন্যবসনে আসিয়া গাছতলায় যাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দশ বারজন লাল পাগড়ীওয়ালা ঢাল তরবার বান্ধা সেপাই দেখিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। একবারে গা ঘেঁষা হইয়া নিকটে আসিল না। দূরে দাঁড়াইয়া বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। একটী গান শেষ হইতে না হইতেই রাম সিং পাঁড়ে পুনঃ অনুরোধ করিল, বাবাজি! দোসরা আর একটী গান হউক। খুব ভাল গান।

বৈরাগীর অভিলাষ এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে গান এখনও তাহা সফল হয় নাই। মহাব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন। ক্রমে গ্রামের অনেকে বটতলায় আসিয়া গান শুনিতে লাগিল। বৈরাগীও চারিদিক তাকাইয়া গান গাইতেছেন। তিনি যে মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেন, সে মুখ দেখিতেছেন না। কাজে কাজে গানও থামিতেছে না। দেখিতে দেখিতে ঐ জনতার মধ্যে মনোমত রূপ দেখিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তাড়াতাড়ি সে গানটী সারিয়া নূতন তালে আর একটী নূতন গান ধরিলেন—

গান

"তোমরা যাও সবাই এখন ঘরে ফিরেরে।
আমি যাই রে, ওরে এসেছি এই ভবে একা, একা যেতে হল রে।"

—কেহই ফিরিয়া গেল না। একমনে বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। তবে একজন ফকীর ঐ গোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, সে তখনই চলিয়া গেল! আর দাঁড়াইল না। ত্রস্তপদে জনতা ভেদ করিয়া রাস্তার বামপার্শ্বে নামিয়া গ্রাম ধরিল। বৈরাগী দুই তিন বার গানটী আওড়াইয়া যখন দেখিল ফকীর সম্পূর্ণরূপে চক্ষের আড়াল হইল—গান ভঙ্গ দিয়া খন্‌জনী ঝোলায় বন্ধ করিলেন।

রাম সিং সঙ্গীদিগকে—বাহকদিগকে বলিতে লাগিল—"চল্ ভাই চল্ খুব ঠাণ্ডা হুয়া, আবার চল্ দেখি কত দুর যাইতে পারি।" ভারীরা ভার ঘাড়ে ঝুলাইল। দেশওয়ালীরাও পূর্ব্ব মত ভারীদিগের অগ্র পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বৈরাগী বাবাজিও জোরে জোরে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ
আশ্চর্য্য ডাকাতী

পাংশা গ্রাম হইতে যশোহর জেলা অন্যূন ৩৫ ক্রোশ ব্যবধান। পাংশা হইতে যে সময়ই কেন রওনা হউক না যশোহর যাইতে তাহাকে পথে এক রাত্রি প্রবাস থাকিতেই হইবে। ভৈরব বাবুর আর একটী কাছারী পাংশা হইতে ১৪/১৫ ক্রোশ ব্যবধান। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাম সিং পাঁড়ে প্রভৃতি টাকা লইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইল। কাছারীর কার্য্যকারক ভৈরব বাবুর উপদেশপূর্ণ পত্র পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। কেনী টাকা লুটিয়া লইবে তাহাও পত্রে লিখাছিল। কর্ম্মচারী টাকার তোড়াগুলি স্বহস্তে অতি সাবধানে কাছারীগৃহের মধ্যস্থ বড় একটী সিন্দুকে রাখিয়া তালা চাবি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। টাকার শব্দ না হয় বলিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত সিন্দুকে তোড়া বোঝাই করিলেন। এবং সকলেই বলিলেন, এক রাত্রি কষ্টে সৃষ্টে সকলকেই জাগিয়া থাকিতে হইবে। সাবধানের মার নাই, অসাবধানে শতবিঘ্ন। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে।

তোমরা সকালে সকালে আহারাদির জোগাড় করিয়া আহার শেষ করিয়া আইস। কাছারীর নেগাহবানগণকেও নাএব মহাশয় বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন যে, তোমরাও শীঘ্র শীঘ্র আহার করিয়া আসিবে। আজ রাত্রি বড় ভয়ানক রাত্রি। বড় সাবধানে—বড় সতর্কে থাকিতে হইবে। আর অতিরিক্ত যে কয়েকজন লোককে রাখা হইয়াছে তাহারাও মায় হাতিয়ার, সড়কি, লাঠী, সুলফী লইয়া সমস্ত রাত্রি বাঁধা কোমরে থাকিয়া পাহারা দিবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে জাগিয়া থাকিব। এই সকল বিলি বন্দবস্ত করিয়া নাএব মহাশয় দেশওয়ালী বরকন্দাজদিগের আহারের জোগাড় করিয়া দিলেন। রামসিংহের অনুগ্রহে বৈরাগী ঠাকুরও চাউল, দাউল, তরকারী ইত্যাদি আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন। সকলেরই আহারের সুব্যবস্থা নাএব মহাশয় করিয়া দিলেন। বৈরাগী আহার অন্তে নাএব মহাশয়ের নিকট আসিয়া পরিচিত হইলেন। নাএব মহাশয় স্বয়ং টাকার সিন্দুকের উপর শয্যা রচনা করিয়া হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিল। —বৈরাগী ঠাকুরকে সিন্দুকের নিকট বসাইয়া ধর্ম্ম কাহিনী শ্রবণ করিতে মন দিলেন। ধর্ম্ম কথার পর হরিগুণ গান শ্রবণে নাএব মহাশয়ের নিতান্তই ইচ্ছা হইল। বৈরাগীকে বলিলেন, বাবাজি আমি রাম সিংহের নিকট শুনিয়াছি আপনার শ্যামা বিষয় সংকীর্তনে বেশ ক্ষমতা আছে। যদি সত্য হয় তবে সুদু সুদু বসিয়া রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা আমোদে থাকা মন্দ কথা নয়। ঈশ্বরের নামও হইবে। পাহারার কার্য্যও চলিবে।

বৈরাগী বলিলেন—"বাবাজি কথাটা ভালই শুনালেন, কিন্তু বলি কি রাত্রি জাগরণটা বড় ভয়ানক কথা। আর এই সকল সিপাই বাবাজিরা সারাদিন হাঁটিয়া যে পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে, এখন কি আর জাগরণের সময়? যেই বিছানায় পড়িবে অমনি ঘুমাইবে।"

নাএব মহাশয় বালিশে ঠেস দিয়া তামাক টানিতেছেন আর বাবাজির সহিত আলাপ করিতেছেন। নাএব মহাশয়ের অনুরোধ বাবাজি ঠেলিতে পারিলেন না। খন্‌জনী বাহির করিয়া আরম্ভ করিলেন! খন্‌জনীর চাটায় শব্দ অনেকদূর যাইয়া ফকীরের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রের শব্দ দিন অপেক্ষা বহু দূরে যাইতে লাগিল। বৈরাগী অনেকক্ষণ খন্‌জনী বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল।

গান

"আয়মা সাধন সমরে।
দেখ্‌বো মা হারে কি পুত্র হারে॥
অশ্বারোহণ করিয়ে কালী সাধন রথে, তপ জপ দুটো অশ্ব যুতে তাতে,
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্ম বাণ বসেছি ধ'রে॥
মা দেখ্‌বো তোমার রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন—
তাতে রসনা ঝঙ্কারে, কালী নাম হুঙ্কারে,
কার সাধ্য আমার বলে রণ॥

বারে বারে বলে তুমি দৈত্য জয়ী, এই আমার বাণ এস ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিক চন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিন্‌বো তোমারে॥

গানটী শেষ হইলেই বাবাজি তামাক ইচ্ছা করিয়া নাএব মহাশয়ের হস্তে কলিকা দিলেন। রাম সিং প্রভৃতিরা শরীরের বেদনা তাড়াইতে কসে গাঁজায় দম দিয়া জাগিতে জাগিতে ঘোর নিদ্রায় নাক ডাকাইয়া পাহারা দিতে লাগিল। সর্দ্দারেরা লাঠীখানি বগলে করিয়া "একটু কাৎ হই" বলিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইল। জাগরণের মধ্যে কেবল নাএব মহাশয় আর বৈরাগী বাবাজী। বৈরাগীর মনেও নানা কথা, নাএব মহাশয়ের মনেও নানা কথা—এবারকার পূজার খরচটা উপরি টাকায় করিবেন মনে করেছিলেন। প্রজারা বাদী হওয়ায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিবাদী প্রজাগণকে কি কি কৌশলে জব্দ করিবেন সেও এক প্রধান চিন্তা। সে জমা খরচটা সদর কাছারীতে দাখিল করিয়াছেন, তাহার সমুদায় খরচ মজুরা পাইবেন কিনা, সেও এক প্রধান চিন্তা। তার নেয্য খরচ এক ভাগ, আর তিন ভাগই মিথ্যা। অনেক ফর্দ্দে ঠিক নামাইতে বেঠিক করিয়াছেন। কোন স্থানে শূন্য বেশী করিয়া দিয়া নামাইয়া রাখিয়াছেন। কিছু কিছু বাজেয়াপ্ত হইলেও আসলে মার নাই। সদরের আমলাগণকেও রীতিমত রূপচাঁদ সহায়ে সেলাম বাজাইয়া আসিয়াছেন। সময় সময় পাঁঠা, ঘৃত ইত্যাদি দিয়াও তাঁহাদের মন যোগাইয়াছেন। বাবুর চক্ষে পড়িলে ধরা পড়িবেন, এইটি মহাচিন্তা। তাহার পর কেনী সাহেব যে কাছারী লুট করিয়া খাজানা লুটিয়া লইয়া যাইবে, সে চিন্তাটাই বেশী চিন্তা। লুটিবে কথায় চিন্তিত হন নাই। লুটিলেও ভাল, না লুটিলেও ভাল। যদি লুটই হয়, তবে লুটের বাহানায় কিছু কিছু সরাইয়া আত্মসাৎ করিবেন। কোন কোন জিনিস এবং নগদ তহবিলের সমুদায় সরাইবেন কি কিছু রাখিবেন ও কাগজপত্রগুলো একেবারে পোড়াইয়া ফেলিবেন কি জলে ডুবাইবেন তাহাও স্থির করিতে পারেন নাই। লুট হইলেই ভাল। আরও কিছু লাভ না হয়, মোকদ্দমা খরচে বেশ এক হাত মারিতে পারিবেন।

পুনরায় বৈরাগী বাবাজিকে বলিলেন বাবাজি। গানটি বড় চমৎকার! আর একবার গানটি হক। গানটি বড় মিষ্টি।

যত রাত শেষ হইতেছে, ততই বৈরাগীর চিন্তা বাড়িতেছে। সহযোগী ফটীক (ফকীর) কুঠীতে গিয়া টাকা রওয়ানা সংবাদ সময় মত সাহেবকে দিতে পারিয়াছে কি না? এ কথাও তাঁহার চিন্তার এক কথা। পুনর্ব্বার খঞ্জনীতে ঘা দিয়া 'আয় মা সাধন সমরে" বলিয়া প্রথম ধুয়া ধরিতেই হো হো শব্দে লাঠীয়ালেরা মসাল জ্বালিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারী ঘরে আসিয়াই নাএব মহাশয়কে চক্ষের পলকে বাঁধিয়া ফেলিল।

বৈরাগী বাবাজি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল যে ঐ সিন্দুক। সঙ্কেত করিবা মাত্র কুঠারাঘাতে সিন্দুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সিন্দুকস্থ টাকার তোড়া লাঠীয়ালেরা বাহির করিয়া সঙ্গিয় বাহকগণের মাথায় দিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারী ঘরের বাহির হইয়া পঞ্চাশ জন

সর্দ্দার সঙ্গে দিয়া টাকা কুঠীতে পাঠাইয়া দিল। অবশিষ্ট দুই শত লাঠীয়াল কাছারীর অন্য অন্য ঘরের জিনিস পত্র লুট পাট করিয়া লইতে লাগিল। রাম সিং প্রভৃতি সর্দ্দারদিগকে লাঠীর আঘাত সড়কির গুঁতায় জাগাইয়া তুলিল। সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। গুঁতা খাইয়া থতমত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না। বাবাজি ঘরের সকল জিনিস জোরে জোরে বাহির করিয়া আনিয়া লাঠীয়ালদিগের সম্মুখে রাখিতে লাগিল। কাছারী লুট করিয়া লাঠীয়ালেরা দলবদ্ধ হইয়া কাছারীর সম্মুখ সীমায় মশাল জ্বালিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া ডাক ভাঙ্গিতে লাগিল। কাছারীর কোন লাঠীয়াল আর অগ্রসর হইল না। কে কোথায় পালাইয়াছে তাহার সন্ধান নাই। সাহেবের লাঠীয়ালেরা অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং গালী গালাজ দিয়া মশাল জ্বালিতে জ্বালিতে চলিয়া গেল। শেষ রাম সিং, হনুমান সীং বেত বোন হইতে বাহির হইয়া "ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া" করিয়া নাএব মহাশয়ের বন্ধন দশা মোচন করিল। আর আর সকলে যাহারা পলাইয়াছিল, কেহ লাঠী, কেহ সড়কি হস্তে আসিয়া মহা ধুমধাম আরম্ভ করিয়া দিল। কোথা গেল, সাহেবের লাঠীয়ালরা কৈ? এক চোটে ফওর করিব। কৈ কোথা গেল বলিয়া আপন আপন মর্দ্দামী দেখাইতে লাগিল।

নাএব মহাশয়ের মুখে কথাটী নাই। তাঁহার নিজের বাক্স, পেটরা, থালা, ঘটী, বাটী যাহা ছিল সকলি গিয়াছে। দেখিলেন বৈরাগীর ঝোলা, খঞ্জনী সকলি পড়িয়া আছে। নানা প্রকার মতলব পরামর্শ আঁটিতে আঁটিতে পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া প্রভাত বায়ু বহিতে লাগিল। ভৈরব বাবুর কাছারী লুট এই পর্যন্ত শেষ হইল।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ

টাকা নয়—খাপরা

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সাহেবের লাঠীয়ালেরা যে পথেই চলিল, সূর্য্যদেব সকলকেই দেখাইলেন যে, ভৈরব বাবুর কাছারী লুট করিয়া ১৪ তোড়া টাকা লইয়া ১৪ জন মুটীয়া এবং ঢাল সড়কি কমর বান্ধা লাঠীয়ালেরা ত্রস্তপদে মার মার কাট কাট শব্দে পথ জাঁকাইয়া চলিয়াছে। যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে যে, ভৈরব বাবুর সর্ব্বনাশ হইল।—লাটের খাজানা লুট! আর সর্বনাশের বাকি কি? হঠাৎ এত টাকা এই কদিন মধ্যে কোথা হইতে জোটাইয়া বিষয় রক্ষা করিবেন। লাটের দিন কি ভয়ানক দিন। রাজকর আদায়ের এমনি কড়া নিয়ম, যে সূর্য অস্ত হইলেই দফা রফা, কার্য্য শেষ। জমীদারী নিলাম—নিলাম ত সত্য সত্যই নিলাম। আর দেয় কে, আর পায় কে? কিস্তি মত টাকা দাখিল না হইলে কিছুতেই আর রক্ষা নাই।—হাজার হউক বেলাতী বুদ্ধি সে বুদ্ধির কাছে বাঙ্গালী বুদ্ধি কোনই কাজের নহে। ধন্য কেনী। কি কৌশলে কি সন্ধানে টাকাগুলি হস্তগত করিল। এমন কৌশলে ধন্য। ধন্য তোমার সাহস।

কেনী শোক, তাপ, বিরহ, বিচ্ছেদ নানা প্রকার মনকষ্ট ভোগ করিয়া শেষকালে বাঙ্গালীর উপর চটিয়া গিয়াছেন। হাড়ে চটিয়াছেন। বাঙ্গালীর নামেই জ্বলিয়া ওঠেন। চক্ষের শূল মনে করেন। লাঠীয়ালদিগকে ভাল না বাসিয়া পারেন না বলিয়া মুখে ভালবাসা জানান। কার্য্যেও দেখান যে, তোমরাই আমার সকল। বাঙ্গালীর কথায় কার্য্যে আর তাঁহার বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস তরুর মূলে তাঁহারই ভালবাসা জকি—বিষবারী সিঞ্চন করিয়া বিষময় ফল ফলাইয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত চটা। কেনীর অদৃষ্টচক্রের গতি ক্রমেই উর্দ্ধে। যে কার্য্যে হাত দিতেছেন, তাহাতেই প্রতুল হইতেছে। নীল, রেসমে বিস্তর আয় হইতেছে। জমিদারীতেও বেশ লাভ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দিন দিন উন্নতি—দিন দিন মজুদ টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি। চারিদিক হইতে টাকা—যখন টাকা আসিতে থাকে তখন চারদিক কেন, দশদিক হইতে বিশ প্রকারে টাকা আসিতে থাকে।

সন্ধ্যা নিকট। কেনী ফুলবাগানে মেম সাহেবের সঙ্গে বাগানের শোভা, কালীগঙ্গার শোভা, সায়ংকালীন সেই প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিতেছেন, আর উভয়ে—হাত ধরাধরি করিয়া পরচক্ষে প্রণয়ভাব গাঢ়রূপে দেখাইয়া মৃদুমন্দ ভাবে মনের আনন্দে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় ফকীর গোয়েন্দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সেলাম বাজাইয়া বলিল—"হুজুর! বক্‌শিশ চাই।"

সাহেব বলিলেন—"বক্‌শিশ পরে দিব, খবর কি?"

"হুজুর। বকশিশের হুকুম হউক, কাজ ফতে হইয়াছে। বাবুর ভুর ভাঙ্গিয়াছি। বাঙ্গালারাজ্যে এমন কোন লোক নাই যে, হুজুরকে ঠকায়। মামলা, মোকদ্দমা, লাঠীবাজী, এর একটীতেও হুজুরকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। বাবুর কাছারিতে ১৪ তোড়া পাওয়া গিয়াছে। আমাদের লাঠীয়াল সর্দ্দার নিকট বাবুর লোকজন মাথা তুলিয়া একটী কথা বলিতেও সাহসী হইল না। কে কোথায় পালাইল তাহার খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। ফকীরের কথা শেষ হইতে না হইতে লাঠীয়ালগণ শোরগোল করিতে করিতে পাঁয়তারা করিয়া লাঠী ভাঁজিতে ভাঁজিতে, ১৪ তোড়া টাকা সহ সেলাম বাজাইয়া বক্‌শিশের প্রার্থনায় সাহেবের সম্মুখে কাতার বান্ধিয়া দাঁড়াইল। সাহেব ৫০০ পাঁচশত টাকা বক্‌শিশের হুকুম দিলেন। আরও বলিলেন "দেখ ভৈরব বাবু বড় চতুর। ওসকল তোড়াগুলি এখনি জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে। টাকা আমার সম্মুখে ঢালিয়া তোড়াগুলি জ্বালাইয়া ফেল। আর এ টাকা খাজাঞ্চীখানায় লইয়া দেও।" আদেশ মাত্র তখনি রামইয়াদ পাঁড়ে গায়ের বড় চাদর মাটিতে বিছাইয়া টাকার তোড়া একে একে নামাইয়া মুখ খুলিতে লাগিল। সহজে খুলিতে পারিল না। বড়ই কৌশলে বাঁধা এবং লাবাতী দিয়া মুখ আঁটা। তোড়ার মুখের দড়ি কাটিয়া সাহেবের সম্মুখে ঢালিল। সাহেব দেখিয়া অবাক্। তাড়াতাড়ি অন্য একটী তোড়ার মুখ কাটিয়া খোলা হইল, তাহাতেও অবাক্! ক্রমে ১৪টী তোড়ার মুখ খুলিয়া টাকা ঢালা হইল। কাহার মুখে কথা নাই। চতুরের চাতুরী—আশ্চর্য বাটপাড়ী! একটী তোড়াতেও টাকা নহে। সমুদয় খাপরা। —আর এক দলা করিয়া সীসা। ভৈরব বাবুর চাতুরীতে কেনীর মাথা ঘুরিয়া গেল।

পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী ভিন্ন মুখে কাহারই কোন কথা নাই। লাঠীয়ালদিগের উৎসাহ—বক্‌শিশ সকলি খাপরায় পরিণত হইল। কেনী বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—ভৈরব বাবু বড় ঠকাইয়াছে। বাঙ্গালীর মাথায় এত বুদ্ধি, ইহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। সাহেব মাথা হেঁট করিয়া এক দুই পায়ে প্রিয়তমার হাত ধরিয়া কামরায় ঢুকিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, ছালাগুলি নদীতে ফেলিয়া দেও। রামইয়াদ পাঁড়ের চাদর পাতাই সার হইল। খাপরা সমেত তোড়া ১৪টা কালীগঙ্গায় বিসর্জ্জন করা হইল। তিন দিবসের মধ্যে সাহেব ঘর হইতে বাহির হইলেন না।

ভৈরব বাবু ছাড়িবার লোক নহেন। ইংরেজ দেখিয়া ভীত হইবার পাত্র নহেন। রীতিমত রাজদ্বারে কাছারী লুটের নালিশ উপস্থিত করিয়া দিলেন। প্রমাণের অভাব হইল না। কাছারী লুট, ১৪ তোড়া টাকা লুট,—একথার প্রমাণ সহজেই পাওয়া গেল। কেনীর পক্ষীয় কয়েকজন লোকের বিশেষ শাস্তি হইল। কিন্তু ভৈরব বাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। ১৪ হাজার টাকার দাবীতে আদালতে নালিস উপস্থিত করিয়া মায় খরচা সমুদয় দাবী ডিক্রী করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ তরঙ্গ
বাঙ্গালীর হৃদয়

কিছুদিন পরে যশোহরে সদরআলার এজলাসে ভৈরব বাবুর সহিত কেনীর দেখা হয়। যদিও কেনী বড় লোক। বিস্তর টাকা কিন্তু খাপরার পরিবর্ত্তে—১৪ হাজার টাকা নগদ দিতে কাহার না কষ্ট বোধ হয়? কেনীর ইচ্ছা যে আপোষে নিষ্পত্তি হয়। খরচাটা লইয়া বাবু দাবীর টাকা ছাড়িয়া দেন—এই কেনীর আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু কোন্ মুখে একথা বলিবেন। হাকিমের সম্মুখে, এজলাসের মধ্যে কেনী ভৈরব বাবুকে দেখিয়া বলিলেন।

"তুমি বাবু বড় জুয়াচোর। খাপরা দিয়া তোড়া পুরিয়া ১৪ হাজার টাকার দাবী করিয়া ডিক্রী করিয়াছ।"

ভৈরব বাবু বলিলেন—"আমি জুয়াচোর, তুমি গরু চোর।" কথা দুইটী পথিকের কল্পনা প্রসূত নহে। হাকিমের সম্মুখে ভৈরব বাবু ও কেনীর কথাপ্রসঙ্গ আজ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে সাধারণের মুখে চলিয়া আসিতেছে। ভৈরব বাবু কেনীকে সুদু গরু চোর বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। আরও বলিলেন—"দেখ তুমি আমাদের দেশের রাজা! দেশের লোকে তোমাকে ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, রাজার তুল্য মান্য করে। আমাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া কিছু টাকা উপার্জ্জন করিবে, এই ত তোমার ইচ্ছা। তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ। যাহা যাহা করিয়াছ, এদেশের লোকে তাহা কখনই করিতে পারে না। দয়া, মায়া, ধর্ম্ম, এবং হৃদয় হইতে তাহারা

বঞ্চিত নহে। তুমি দেশের গরু চুরি করিয়া কৃষিপ্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তোমার নিকটস্থ জমিদার, তালুকদারের যথাসর্ব্বস্ব লইয়াও তোমার উদর পরিপূরণ হয় নাই। এখন দূরস্থিত তালুকদার, জমিদারের সর্ব্বস্ব লইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবে ইহাই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা। তুমি এদেশে আসিয়া কত পাপের কার্য্য করিয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? কত সতীর সতীত্ব নাশ, কত শত প্রজার যথাসর্ব্বস্ব হরণ, ঘর জ্বালানী, দিনে রাত্রে ডাকাইতি, নিরপরাধে দণ্ড, এ সকল তোমার অঙ্গের ভূষণ। সকল ধর্ম্মে যে কার্য্য পাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহার একটীও তুমি বাকি রাখ নাই। তুমি ইংরেজ জাতির পাপ কণ্টক। তোমার মত ইংরেজকে শতধিক। আমি খোলা খাপরায় তোড়াবন্দী করিয়া টাকা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা স্বীকার করি। তুমি ভাবিয়াছিলে যে বাঙ্গালাদেশে লোক নাই, বাঙ্গালার মানুষ নাই। এ রত্নাগর্ভা ভারতভূমির বঙ্গখণ্ড কেন? যে খণ্ডে যাইয়া সন্ধান করিবে, তোমার পক্ষে কাল ভৈরব স্বরূপ—শত শত ভৈরব দেখিতে পাইবে। রাজশরীর, রাজমন, রাজচরিত্র, রাজনীতিজ্ঞ, রাজবুদ্ধি, রাজচক্ষু, রাজ বিবেচনা সংযুক্ত দেহেরই যে অভাব আছে,—তাহাও মনে করিও না। আর সকল মস্তকই যে বিকৃত তাহাও নহে। অনেক মস্তকেই প্রধান প্রধান মন্ত্রীর মস্তক সদৃশ মজ্জা আছে। মহাবীর মহাবলশালী যোদ্ধার ন্যায় বাহুবলও আছে। —সাহস আছে, হৃদয় আছে। ধরিতে গেলে কি না আছে? তবে সময় মন্দ হইলে কিছুতেই কিছু হয় না। আজ তোমার নামে গগন ফাটিয়া যাইতেছে। ভয়ে গর্ভিনীর গর্ভ পর্য্যন্ত পাত হইয়া যাইতেছে। খুঁজিলে তোমার মত নামজাদা লোকই যে এই পরাধীন রাজ্যে না পাওয়া যায় তাহাও নহে। সময় মন্দ, কৃপাল মন্দ, তাতেই এই দশা।

কেনী বলিলেন—বাবু! "তুমি আমাকে বড় ঠকাইয়াছ।"

বাবু বলিলেন—"আমি তোমাকে ঠকাই নাই। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলে, আমিও তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। এবং দেখাইলাম ডাল ভাতের গুণ কি? বাঙ্গালীর মাথায় আছে কি?—আমি টাকার প্রত্যাশী নহি। অধর্ম্ম করিয়া টাকা লইয়া আমার কয়দিন যাইবে। তুমি আমার কাছারী লুট করিয়াছ যথার্থ। আমি যদি ঐ কাছারীর পথে সত্য সত্যই খাজানার টাকা পাঠাইতাম, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? আমারই টাকা দিয়া আমারই বিষয় খরিদ করিতে—এই ত তোমার মনের কথা।"

কেনী বলিলেন—বাবু! আমি তোমার নিকট ঠকিয়াছি।

ভৈরব বাবু বলিলেন—বেশ তুমি ইংরেজ, তোমার মান্য কোথায় না আছে? আমি বাঙ্গালী, আমার নিকট পরাস্ত স্বীকার করিলে, আমি টাকা পাইলাম। দেখ বাঙ্গালীর হৃদয়ে সাহস আছে কি না। দেখ ভৈরবের হৃদয় আছে কি না! এই বলিয়া পকেট হইতে ডিক্রীখণ্ড বাহির করিয়া স্বহস্তে ছিঁড়িয়া, কেনীর হস্তে দিয়া বলিলেন—"যাও তোমায় ভিক্ষা দিলাম। ১৪ হাজার টাকার ডিক্রী হইতে তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম?" কেনী মহা লজ্জিতভাবে বিশেষ নম্র ও ভদ্রতার সহিত ভৈরব বাবুর হস্ত ধরিয়া কাছারী গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"বাবু! আমি জানিলাম তুমি যথার্থ বাবু! আমি আর কখনও তোমার সঙ্গে বিবাদ

বিসম্বাদ করিব না। তোমারে সহিত আর আমার কোনদিন কোন কারণে বিবাদ হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।”

পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় হইলেন। সকলে ভৈরব বাবুর সাহস উদারতা দেখিয়া অবাক হইল! কেনী সেই হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভৈরব বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ

সংসার

পাঠক! মীর সাহেবকে অনেক দিন হইল গৌরীনদীর গর্ভে সাঁওতার ঘাট হইতে নৌকায় ভাসাইয়া দিয়াছি। আজিও ভাসিলেন, কালিও ভাসিলেন বলিয়া বিদায় করিয়াছি। তিনি সময় মতো সেরাজগঞ্জ যাইয়া ভগ্নীর বাটীতে গিয়াছেন। বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ন করিতেছেন। এদিকে সাগোলাম “অছিয়তনামা” আপন মন মত পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। আর আর যাহা অবশিষ্ট ছিল, যে যে দলীল পরিবর্তন করিতে আবশ্যক হইয়াছিল, সুযোগ পাইয়া সমুদায় দলীল পরিবর্তন করিয়াছেন। সেরেস্তার অন্যান্য কাগজপত্র যাহার যেখানে দোষ ছিল, সমুদায় সারিয়াছেন। প্রধান প্রধান জালসাজদিগের আশ্রয়ে অর্থের সাহায্যে এ সকল সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাইয়া, আট ঘাট বান্ধিয়া দলীল দস্তাবেজ দুরস্ত করিয়া নিশ্চিতভাবে বসিয়া আছেন। চাকর চাকরাণীরা অনেক দিন হইতেই তাহার বাধ্য হইয়াছে। কাহাকে কৌশলে, কাহাকে অর্থে, কাহাকে তোষামোদে—যাহাকে যাহা দিয়া বাধ্য করিতে হয়, দিয়া আপন মন মত সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ঘরাও বিবাদে প্রতিবাসী এবং দেশের লোকের বড়ই আনন্দ। লক্ষ্মীশ্রী যাহার চক্ষে সহ্য হয় না, নির্ব্বিবাদে কোন পরিবার একত্র একজোটে থাকা যে নরাধম দেখিতে পারে না, আপন স্বার্থ জন্য তাহারাই সাগোলামের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। যে পিশাচ ঘরাও বিবাদ বাধাইয়া দিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আদর বাড়ায়, সেই সকল লোকেই সাগোলামের সাহায্যে দাঁড়াইয়াছে। যাহারা মীর সাহেবের নিকট কখনই স্থান পায় নাই তাহারাই এক্ষণে সাগোলামের পরামর্শদাতা। যে নীচ প্রকৃতির লোকেরা সাঁওতার বাটীর চতুঃসীমায় আসিতে থরহরি কম্পে কাঁপিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে সাগোলামের প্রধান সাহেব। যাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই, তাহারাও খোস গল্পের এক অঙ্গ মনে করিয়া সময় সময় আসিতেছেন যাইতেছেন। ঐ সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া কাল কাটাইতেছেন। কাহার সর্ব্বনাশ, কাহার পৌষ মাস। কেউ ধনে প্রাণে বিষয় সম্পত্তি হারা হইয়া পথের কাঙ্গাল হইতেছে। কেহ ঐ ঘটনা লইয়া কত কথায় কত আমোদ মনে করিয়া আমোদে মাতিয়াছে। কেহ ‘মামার জয়!” মতে মত প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ সাগোলামের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে মৌখিক মীর সাহেবের স্বপক্ষ হইয়া দুটি কথা বলিয়া অপর

পক্ষের উত্তরেই হার মানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সাগোলামের মনের মধ্যে যাইতে ঘুরিতেছে। সগোলাম নিজেই নাচিতে দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পর তোষামোদে কুকুরের পদ-সেবায় আনন্দে মাতিয়া সকল কথা ভুলিয়া, ঘর ভাঙ্গা লোকের কথায় কান দিয়া, আরও নাচিয়া উঠিয়াছেন। একথা ভাবিতেছেন না যে জগৎ কয় দিনের! মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া একজনকে ঠকাইলে তহার প্রতিফল আবশ্যই একদিন না একদিন ফলিবে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হইবেই হইবে। সে পাপ ভোগ একদিন ভুগিতেই হইবে। একপ্রকার গুপ্ত ডাকাতি করিয়া মীর সাহেবকে পথের ভিখারী করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা অপার! যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় করিয়া দিবেন। কথা চিরকাল থাকিবে। জগৎ যতদিন কথাও ততদিন! হায়রে সংসার!

দেবীপ্রসাদের মন্ত্রণায় জামাই বাবু সকল কার্য্য দৃঢ়রূপে পাকা করিয়া রাখিতেছেন। শেষ দিনের কথা এখন কিছুতেই মনে স্থান পাইতেছে না। রে মানুষ! রে সংসার! রে বিষয়! রে জমিদারী! রে লোভ! রে জামাই! তোর অসাধ্য কিছুই নাই।

মীর সাহেব ভগ্নীর বাটীতে কয়েক মাস থাকিয়া তাঁহার বিষয়াদির সুশৃংখলা করিয়া বাটী আসিতে মনস্থ করিলেন। ইহার মধ্যে ২/৩ খানি মাত্র পত্র জামাইকে লিখিয়াছেন, —একখানিরও উত্তর পান নাই। উড় উড়ভাবে কএকটি কথা তাঁহার কানে গিয়াছে—কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে ঘরাও বিবাদ বাধাইয়া দিতে দেশের কতকগুলি লোক বড়ই পটু। এই যুক্তিতেই—মনে কোনরূপ সন্দেহের কারণ হয় নাই! কার্য্য শেষ করিয়া বাটী আসাই মনস্থ করিলেন। ভগ্নীর নিকট সমুদায় ব্যক্ত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাটী আসাই স্থির করিলেন। নৌকার জোগাড় করিয়া মীর সাহেব সিরাজগঞ্জ অঞ্চল হইতে রওয়ানা হইলেন।

সাগোলাম শোলী পর্য্যন্ত লোক রাখিয়াছেন। সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া মীর সাহেবের গুপ্ত সন্ধান গোপনে লইয়া সাগোলামকে বলিতেছে। সংবাদ আসিল, মীর সাহেব বাটী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ৩/৪ দিবস পরেই দ্বিতীয় সন্ধানী আসিয়া বলিল, মীর সাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। বোধ হয় ২/৩ দিন পাবনায় বিলম্ব হইবে। সেখানে অনেক আলাপী লোক আছে! জেলায় বহুতর লোক। নানা দেশ বিদেশের লোকে পরিপূর্ণ। বিশেষ মুন্সী নাদের হোসেন পাবনা জেলার নাজীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব। ২/৩ দিবস পাবনায় না থাকিয়া আসিতে পারিবেন না।

সাগোলাম এদিকে ভাল রকমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মীর সাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। একথা গ্রামের লোক, চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের লোক, সকলেই শুনিয়াছে। বাটী আসিলে তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিবে তাহাও সকলে পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছে। অনেকেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় আছে। কিভাবে তিনি পৈতৃক বসতবাড়ী পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাড়িত হন, সকলেরই তাহা দেখিবার ইচ্ছা। এক দুই করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল। পাবনাতেও জামাই বাবুর সম্বন্ধে মীর সাহেব অনেক কথা অনেকের মুখেই—তাঁহার পূর্ব্ব

শোনা কথার ন্যায়—শুনিলেন। মনে কিছু সন্দেহ হইল। কথাটার মধ্যে কিছু সত্যাংশ না থাকিলে এত দূর ছড়াইবে কেন? সাধারণে শুনিবে কেন? সে কথা লইয়া আন্দোলনই বা হয় কেন? অবশ্যই কিছু হইয়াছে। অবশ্যই কোন কথা নূতন উঠিয়াছে। অবশ্যই কিছু না কিছু হইয়াছে। নানারূপ চিন্তায় মশগুল হইয়া পদ্মা পার হইলেন। নৌকা গৌরী স্রোতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মাঝিরা জোরে দাঁড় টানিতেছে। সন্ধানী লোকেরা প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদ দিতেছে যে, এই পর্য্যন্ত আসিলেন—অমুক স্থান হইতে নৌকা ছাড়িলেন।

মীর সাহেব লাহিনীপাড়া গ্রামের ঘাট ছাড়িয়া সাঁওতার ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, বহু সংখ্যক লোক ঘাটে দণ্ডায়মান। মনে মনে ভাবিলেন যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে নিশ্চয়ই সাগোলাম লোকজন সহকারে আমার অভ্যর্থনা জন্য ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা যত নিকটে আসিতে লাগিল, মীর সাহেব ততই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। দেখিলেন সাগোলাম আছে, দেবী প্রসাদ আছে, আরও অনেক লোক আছে। কিন্তু দৃশ্য ভিন্ন, এ দণ্ডায়মানের অর্থ ভিন্ন—ভাব ভিন্ন। লাঠী, সড়কি, ঢাল, তরবার, বাঁধাকোমর, রুদ্রভাব,—রোষের লক্ষণ। সকলেই দণ্ডায়মান। ডাঙ্গার নিকটে নৌকা ভিড়িতেই উচ্চৈঃস্বরে একজন বলিয়া উঠিল "যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, যদি মান রাখিতে চাও তবে আর এঘাটে নৌকা ভিড়াইও না। ভাসিয়া আসিতেছ ভাসিয়াই চলিয়া যাও। এঘাটে কোন প্রয়োজন নাই। নৌকা লাগাইবার কোন অধিকার নাই।"

স্রোতস্বতী গৌরীর স্রোতে নৌকা টানিয়া ধরিয়া নৌকার বেগ রক্ষা করিতে বা ফিরাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মুখের কথায় কেমন করিয়া কূল না ধরিয়ে কি প্রকারে অন্যদিকে যাইবে অথবা ফিরাইবে? স্রোতঃ ছড়াইয়া মন্দস্রোতে নৌকা পড়িতেই দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া লগী ধরিল। তখন দেবীপ্রসাদ পুনরায় বলিতে লাগিল—"এখানে নৌকা ভিড়াইতে পারিবেন না, কেন অপ্রস্তুত হইতেছেন।"

পাঠক! যে জামাই শত হস্ত ব্যবধান থাকিতে সেলামের উপর সেলাম বাজাইয়া শ্বশুরের নিকট ভক্তি প্রকাশ করিত, স্নেহ আকর্ষণের আকর্ষণী ফেলিয়া শ্বশুরের মনকে শতহস্ত দূর হইতে টানিয়া লইত, আজ সেই জামাই স্বয়ং তরবারী হস্তে বুক ফুলাইয়া চক্ষু উল্টাইয়া সজোরে দণ্ডায়মান। চাকরের হস্তে বন্দুক। সেলাম আলায়কুমের নামও মুখে নাই। ইহার পর দেবীপ্রসাদের ঐ কথা। জামাই বাবু এখন পর্য্যন্ত কিন্তু নীরব। আজ কে কাহার অভ্যর্থনা করে। আজ কে মীর সাহেবকে মান্য করে? সর্দ্দার, লাঠীয়াল, এবং অন্য অন্য আরও অনেক হাত সেখানে ছিল, কিন্তু মীর সাহেবকে সেলাম বাজাইতে আজ কোন হাতই উপরে উঠিল না।

মীর সাহেব বুঝিলেন যে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। দুধে গোচনা মিশিয়াছে। দেবীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকা ভিড়াইবে না কেন?"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"নৌকা লাগাইয়া কি হইবে? নৌকা লাগাইতে আমরা দিব না। আপনি দেখিতেছেন না?"

"কৈ আমি ত কিছুই দেখিতেছি না! তোমরা কি আমাকে আগু বাড়াইয়া লইতে আইস নাই?" তখন জামাই বাবুর মুখে কথা ফুটিল।

সাগোলাম কর্কশভাবে বলিলেন, "না, না, খাতির তওয়াজা করিয়া লইতে আসি নাই। একেবারে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে আসিয়াছি। এ মাটি তোমার নয়, এ ঘাট তোমার নয়, এ জমিদারী তোমার নয়, এ বাড়ীও তোমার নয়। বড় মীর সাহেব অভাবে সকলি তাঁহার কন্যার—তোমার ইহাতে কোন স্বত্ব নাই।"

মীর সাহেব হাসিয়া বলিলেন—বাপু। তুমি সুখে থাক। আমি চলিলাম।

জলের উপর থাকিয়াও জামাইয়ের কথায় মীর সাহেব যেন দশ হাত মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মাঝিদিগকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। কোন্ দিকে যাইবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই বলিলেন না। গৌরীস্রোতে নৌকা ভাসিয়া চলিল। সাঁওতার ঘাট ছাড়াইয়া ক্রমে চাপড়াগ্রামের সীমা ধরিল। তখন মীর সাহেব বলিলেন।—ওরে কোথায় যাই?

নৌকা লাগাইতে অনুমতি করিলেন।—আর বলিলেন এপারেই থাকিব না। পাড়ী দিয়া ওপারে যাও। মাঝিরাও নৌকার মুখ ফিরাইয়া দাঁড় ধরিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা অপর পারে গিয়া চরে ঠেকিল। মীর সাহেব পৈতৃক বাটী, জমিদারী ও জিনিসপত্র ইত্যাদি সমুদায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আজ সম্পূর্ণরূপে বেদখল হইলেন। তাঁহার চিরসাধের আশাতরী সোনার চাঁদ জামাই তরবারী হস্তে আজ গৌরীগর্ভে ভাসাইয়া দিয়া সুস্থির হইলেন। হাসিমুখে দলবলসহ বাটী আসিলেন আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু চিন্তার ভাগ কিছু বেশী বোধ হইল। অন্য অন্য সকলেই আজিকার এই ঘটনায় মহা দুঃখিত হইলেন। মীর সাহেব কাহারও নিকট এ দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সেই পূর্ব্ব সাহস, সেই পূর্ব্ব বল, সেই পূর্ব্ব আমোদ, পূর্ব্ব ভাব, সকলি সমভাবে রহিয়া গেল। তিনি প্রায় ছ মাস নৌকায় নৌকায় থাকিয়া নানা স্থান বেড়াইয়া নানা কারণে বাধ্য হইয়া সাঁওতার অতি সংলগ্ন লাহিনীপাড়া গ্রামে মুন্সী জিনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলতন্নেসাকে বিবাহ করিলেন। আবার সংসারী হইলেন।

ষড়বিংশ তরঙ্গ

দৌলতন্নেসা

মাননীয়া দৌলতন্নেসা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ভ্রূ, ললাট নিখুঁত। সে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য। অপরের সহিত তুলনা করিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম। মুসলমান রমণী মধ্যে অনেক খুঁজিলাম পাইলাম না। হয়ত এ কথায় পাঠক মাত্রেই উদাসীন পথিককে পাগল মনে করিতে পারেন। কি করিবে! পথিকের চক্ষে যদি জগতের কোন রমণীকেই দৌলতন্নেসার সহিত তুলনা করিয়া

দেখাইতে না পারে তবে সে কি করিবে? তবে কি উপমা রহিত? না তাহাও নহে। কিন্তু পথিকের চক্ষে বটে। এই সকল কথায় কোন পাঠক ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া যদি এই তরঙ্গ পাঠ না করেন, আক্ষেপ নাই। কারণ জগৎ পরাধীন, মন স্বাধীন।

পথিকের চিন্তাপথে কতকগুলি মুসলমান রমণী আসিয়া বিশুদ্ধভাবে দাঁড়াইলেন। ইহাদের মধ্যে রাজকন্যা, মহামাননীয় বংশের অতি পবিত্রা, সদচরিত্রা, দেবী সদৃশ্যা, রমণীকুলের শিরোমণি মহোদয়াগণও রহিয়াছেন। মহামতি লিখকগণ হস্তে যিনি যে অবস্থায় যে প্রকার কল্পনার চক্ষে পড়িয়াছেন উহার মধ্যে তাঁহারাও অনেক রহিয়াছেন। কিন্তু পথিকের চক্ষের দোষে, তাঁহাদিগকে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে। উপস্থিত রমণীগণ মধ্যে—অনেকেই পবিত্রা, অনেকেই স্বর্গীয়া রমণী সদৃশ্যা। অনেকেই রূপে গুণে ভুবন বিখ্যাত। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে সর্বাঙ্গিনী সুন্দরী বলিয়া বহু চেষ্টাতেও পথিক আপন মনকে সে কথা স্বীকার করাইতে পারিল না। সে মনে দৌলতন্‌নেসার রূপই যেন জগতের আরাধ্যা, পথিক চক্ষে ঐ রূপই যেন সকল রূপের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তুলনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে সক্ষম হইল না। তবে প্রাচীন কয়েকটি কথা শুনাইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকেই চটিতে পারেন। মহানিন্দুক মহাপাপী বলিয়া নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিতে পারেন—করুন পথিক তাহা সহ্য করিবে। কিন্তু কথা শুনাইতে ক্ষান্ত হইবে না। যাঁহার যেরূপ মনের গতি, এবং মাথার ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যথা—

প্রভু মহম্মদের স্ত্রী, ইহারা মহাপবিত্রা এবং পুণ্যবতী? দৌলতন্‌নেসা তাঁহাদের কিঙ্করীর কিঙ্করী! মুসলমান জগৎ চক্ষে তাঁহাদের দাসীর দাসী। কিন্তু সপত্নী বাদে, হিংসার আগুনে তিনি মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়াছেন কিনা তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন মানুষে কখনই জানিতে পারে নাই। আকার প্রকারে, হাবভাবেও কখন সে ভাব কেহ দেখে নাই। তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অক্ষরে পরে দেখাইব। আর একটি কথা।

প্রভু মহম্মদের কন্যা মহামান্য হাসেন হোসেনের জননী বিবি যিনি ইসলাম জগতে রমণীকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকলের মাননীয়া এবং আশ্রয়দাতৃ। তিনিও কিন্তু সপত্নীবাদ—মহানলকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে মহাযাতনাসম্ভূত মহাবিষ সে পবিত্র শরীরেও প্রবেশ করিয়াছিল। পয়গম্বরের দুহিতা, এমামের জননী, মহাবীরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াও (হিংসার কল্যাণে) সে মহাবেগ হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বিবি হনুফার নামে জ্বলিয়া উঠিতেন।

পথিকের পূজনীয়া দেবী, এক মুহূর্ত্তের জন্য শত্রু মুখে কখনও অপবাদগ্রস্ত হন নাই! সে মিথ্যাবাদে অতি অল্প কালের জন্যও স্বামীর মন হইতে সরিয়া যান নাই। ইহা কি কুলস্ত্রীর গৌরবের কথা নহে? —উদাসীন পথিকের কি গৌরবের কথা নহে?

বিবি আয়সা সিদ্দিকা হজরাত মহম্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী। শাস্ত্রে বলে হজরাত নূর নবী মহম্মদ, আয়সা সিদ্দিকার বক্ষে পবিত্র মস্তক রাখিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষ সীমায় ভালবাসার সম্পূর্ণ চিহ্ন জগতে ভাল করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সে সময়

আয়সা সিদ্দিকার বয়স সবে ১৮ বৎসর ছিল। এত অল্প বয়সে পতিপরায়ণা পতিগতপ্রাণা ছিলেন। বদরল আকবরির যুদ্ধের পর মদিনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছু দিনের জন্য সে পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্রিয়পাত্রি হইতে হইয়াছিল।

রমণীপ্রধানা বিবি খদিজা প্রভু মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী। কএক স্বামীর পর চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদের কার্য্যে ও বিশ্বাস গুণে বয়সের ন্যূনাধিক্য থাকা সত্ত্বেও যুবা মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিয়া ছিলেন। সে সময় প্রভুর বয়স ২৫ বৎসর। তখনও ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া আরব খণ্ডে পরিচিত হন নাই।

পথিকের পূজনীয়া দেবী আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামীপদ প্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাও পথিকের কম গৌরবের কথা নহে।

অন্যরূপ চিত্র দেখুন। আফ্রিকা খণ্ডে নীলনদ তীরে সুবিখ্যাত মিশর নগরের রাজমন্ত্রী আজিজ মেসেরের স্ত্রী, যাহার গুণের বর্ণনা পারসিক মহাকবি জামী মহোদয় সহস্র মুখে বর্ণনা করিয়াছেন। নাম "জলেখা' তিনিও ধর্ম্মের মাথায় কুঠার মারিয়া পবিত্র প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মহামতী ইউসুফের প্রেমে মজিয়া,—রূপে মোহিত হইয়া, রমণীকুলে কলঙ্করেখা পাতিয়া গিয়াছেন। ইউসুফের মন ভুলাইতে কত যত্ন, কত চেষ্টা, শেষে "হফ্‌তম খানা" (সপ্ততল বাসর) নির্ম্মাণ করিয়া নিজ মূর্ত্তিসহ মানসাঙ্কিত নাগরের প্রেমভাবপূর্ণ, কুরুচিসম্পন্ন, নানাবিধ চিত্র, বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়া ইউসুফের মন ভুলাইতে, প্রিয়দর্শনের হস্ত ধরিয়া চিত্রাগুলি দেখাইয়াছিলেন। মহা ঋষির মন ভুলাইয়া কুপথে আনিতে কত প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। যাহার রক্ষক ঈশ্বর, তাহার মতিগতি ফিরাইতে, সাধ্য কার? সে চিত্রে সে মন ভুলিল না। জলেখা মিথ্যা ভান করিয়া হৃদয়ের রত্ন—মহারত্ন ইউসুফকে অযথা অপরাধি করিয়া বন্দিখানায় পাঠাইতেও ক্রুটী করেন নাই। সুতরাং পথিক তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইল।

ভারতরমণী "নূরজাহান" শেষে রাজরাণী! প্রথমে শের আফগানের মনমোহিনী ছিলেন। আশ্চর্য্য পতিভক্তি। অনায়াসে স্বামীঘাতককে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজরাণী হইয়া আরও যশস্বিনী হইলেন। অকাতরে পতিঘাতকের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন। ইহাতেও কি বলিব নূরজাহান রমণীরত্ন? রাজদৌরাত্ম্য ভয় অবশ্য ছিল, স্বীকার করি, কিন্তু স্বামী উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কি সে সময় কোন উপায় ছিল না? যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি সৈনিক সীমন্তিনীর রূপ গুণের প্রশংসা সহস্র মুখে করুন কিন্তু উদাসীন পথিক যাহা ভাবিবার ভাবিয়া চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইল।

তৃতীয় চিত্র—কবিবর বঙ্কীম যে চক্ষে আয়সার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে "পজিসনে" তিলত্তমার 'ফটো' তুলিয়াছেন। যে তুলীতে কুন্দ নন্দিনীর শরীর আঁকিয়াছেন। এবং গুণাকর যে রুচি ও প্রবৃত্তিতে কুস্বভাবসম্পন্না মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পথিক সে চক্ষু, সে পজিসনে, সে তুলী, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতন্‌নেসার রূপ গুণ বর্ণনা করিতে

অক্ষম। কাজেই শেষ কথা দৌলতন্‌নেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী। সে পবিত্র পদই পথিকের মুক্তি পদ, পূজনীয় পদ। স্বর্গ হইতেও গরিয়সী। ইহা অপেক্ষা পথিক আর কি বর্ণনা করিবে। তুলনা করিয়াই বা আর কি দেখাইবে? কাজেই নীরব। কাজেই সেকালের কথা একালের কথা আপাততঃ এইখানেই শেষ। মনোযোগ করিয়া এখন মনের কথা শুনুন।

মীর সাহেব পৈতৃক বসতবাড়ী বিষয় সম্পত্তি হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের লিখায় বঞ্চিত হইয়াছে। পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দেলতন্‌নেসা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত স্বযত্নে রাখিয়াছেন। পিতার সঞ্চিত সমুদায় অর্থ স্বামী হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামী পদসেবায় সর্ব্বদা রত রহিয়াছেন। কোন কারণে তাঁহার মনে কোনরূপ কষ্টের কারণ না হয় তদ্‌প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দৌলতন্‌নেসার পিতা রঙ্গপুর জেলায় মীর মুনসীর কার্য্য করিতেন। কথায় কথায় টাকা আসিত। তাঁহার বংশের প্রদীপ, উজ্জ্বল রত্ন, মহামূল্য মণি যাহা বল, সকলই ঐ একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যার আদরে জামাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। বিবাহের তিন বৎসর পর মুন্সী জিনাতুল্যা পরলোক গমন করিলে সংসারের সমুদায় ভার মীর সাহেব শিরেই পড়িল। ভাগী নাই, অংশী নই, অন্য দাবী নাই, কোন বিষয়ে অভাব নাই। পাঠক! দয়াময় জগদীশ মীর সাহেবকে বাহ্যিক সুখে এক প্রকার সে সময় ভালই রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বদা হাসিখুসী, রঙ্গ, তামাসাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বসীরদ্দীন আবার আসিয়া জুটিয়াছে। গান, বাজনা, রগড়, আমোদ, বেদম চলিতে লাগিল।

দৌলতন্‌নেসা নিজগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে। মীর সাহেব আমোদ আহ্লাদেই আছেন। দৌলতন্‌নেসার কর্ণে গানের সুর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামা কণ্ঠের মধুর ধ্বনিও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নুপুরের ঝনঝনীও কানে লাগিতেছে—বাজিতেছে। যত রাত্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখা হইলে, সেই বিশুদ্ধ ভাব, সেই বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, সেই হাসিমুখে সেই মধুমাখা হাসি কথা।

পাড়া প্রতিবাসীরা সময় সময় অনেক অনেক কথা বলিত। তোমারই বাড়ী, তোমারই ঘর, তোমারই বিষয়, তোমারই সকল। তুমি এক ঘরের একটী মেয়ে, তোমার আদরের সীমা নাই। আর তোমার স্বামী সর্ব্বদা রঙ্গরসে আমোদে মত্ত। আমোদ চুলোয় যাক্, মাঝে যে আবার কি ঘটনা। মীর সাহেবের এ নিতান্তই অন্যায়। তুমি কিছুই বলিতেছ না, কিন্তু ভাল হইতেছে না। শেষে বড় পস্তাইবে।

দৌলতন্‌নেসা হাসিয়া বলিতেন। বাড়ী, ঘর, টাকা কাহার? বলত বোন্। আপন জীবনই যখন আপনার নয়, এজগতই যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন গৌরব কিসের? তার পরে তাঁহার সকলি ছিল। আমার সম্পত্তির চতুর্গুণ সম্পত্তি তিনি কিনিতে পারিতেন এত টাকা তাঁহার ছিল। না ছিল কি? সন্তান সন্ততি পরিবার সকলই ছিল। সংসারে লোকের যাহা চাই, সকলি অতি পরিপাটীরূপে তাঁহার ছিল। সে সকল এখন নাই। আশ্চর্য্য কথা—তিনি সে সকল

কথা লইয়া কোন দিন কোন কথা মুখে আনেন্ না। কিন্তু তাঁহার মনে যে কিছু না বলে এরূপ নহে। এখন ভাব দেখি বন্। তাঁহার মনে দুঃখ কত? ও গান বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোন কুভাবের কারণ নাই। আর কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই, আর ইহাই ঈশ্বর নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করি যে তিনি সুখে থাকুন। তাঁহার অসীম চিন্তা অন্তর হইতে দূর হউক, তাঁহার মনের দুঃখ ক্রমে উপশম হউক। তিনি যাহাতে সুখে থাকেন সেই আমার সুখ। প্রতিবাসীরা এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিত। কেহ বা রাগ করিয়া উঠিয়াই চলিয়া যাইত।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ
অপূর্ব্ব দৃশ্য

জগৎ অসীম নহে।—সমুদ্রতলও অতলস্পর্শ নহে। জগতে যাহা আছে, তাহার সীমা পরিমাণ শেষ যাহাই কেন বল না অবশ্যই আছে। সুখ, দুঃখ, বিরহ, যন্ত্রণা, উন্নতি, অবনতি সকলই ঐ সীমারেখারই মধ্যগত। জন্মই মৃত্যুর কারণ। সুস্থতাই পীড়ার পূর্বলক্ষণ, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ দুইটি কথার মধ্যে, আদি, মধ্য, অন্ত সীমা সকলই রহিয়াছে। আবার দেখুন। উদয়ই অস্তের কারণ! রজনীই প্রভাতের আদি লক্ষণ। প্রভাত আছে বলিয়াই আবার সন্ধ্যা। সুতরাং উন্নতির শেষ সীমাই অবনতির সূত্রপাত। সীমারেখা স্পর্শ করিলেই পরিবর্তন। কেনীর দৌরাত্ম্যে অগ্নি রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া একেবারে সীমারেখা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। কার সাধ্য রক্ষা করে? প্রকৃতি কাহারও নিজস্ব রূপে আয়ত্তাধীন নহে। সভাবের স্ব ভাবের অভাব কখনই হইতে পারে না। জমিদার, তালুকদার, মধ্য শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেণীর লোকেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না। কি করে কোথায় গেলে রক্ষা পায়! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু মনের গতি অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে।

অন্যদিকে হরিশের হৃদয়ভেদী বক্তৃতায়, এবং "পেট্রিয়টের" সেই জ্বলন্ত ভাবপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডায় অনেক বঙ্গভূষণের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। নীলকরের বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিত না হইয়াছে তাহাও নহে। দীনবন্ধু দীন বন্ধুর মহামূল্য দর্পণখানি অনেকের ঘরেই উঠিয়াছে। অনেকের হস্তে উঠিয়া যাহা দেখাইবার তাহাও দেখাইতেছে। ভারতবন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতি সাজে সাজাইতে গিয়া কারাবাসী হইয়াছেন। জরিমানার হাজার টাকা দাতা কালী সিংহ আনন্দ সহকারে দান করিয়া তরজমাকারককে খালাস করিয়াছেন। মাননীয় হর্সেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ জ্যোতি সহকারে, পূর্ণ কলেবরে, পূর্ণ চন্দ্ররূপে দেখা দিয়াছেন। প্রজার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। প্রজার আর্ত্তনাদে বঙ্গেশ্বরের আসন পর্যন্ত টলিয়াছে। মহামতি লাট বাহাদুর প্রজার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য

নীলকরের দৌরাত্ম্য স্বয়ং তদন্ত জন্য "সোনামুখী" আশ্রয়ে মফস্বলে বাহির হইয়াছেন।

বর্ষাকাল। কালী গঙ্গা জলে পরিপূর্ণ। "সোনামুখী" নদীয়া অঞ্চল ঘুরিয়া, কুমার নদ হইয়া কালীগঙ্গায় পড়িয়াছে। কালীগঙ্গার আজ অপার আনন্দ। বঙ্গেশ্বরের বাষ্পীয় তরী বক্ষে করিয়া প্রজার দুরবস্থা, নীলকরের অত্যাচার দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে শালঘর মধুয়ার কুঠী পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। পাঠক! যখন সৌভাগ্য গগনে সুবাতাস বহিতে থাকে, তখন তাহা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হয় না। আজ প্রজার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই শুনিয়াছে যে এই জাহাজে লাট সাহেব আসিয়াছেন। আমাদের যথার্থ রাজা এই কলের নৌকায় আসিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা—লাট সাহেবকে শুনাইব। মনের কথা মন ভরিয়া বলিব। আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতেই বঙ্গাধীপ স্বয়ং মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। প্রজার মনে এই বিশ্বাস। ঘটনাও তাহাই—ঘটিলও তাহাই।

কালীগঙ্গার দুই ধারে সহস্রাধিক প্রজা ষ্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। সুধু দৌড়িল তাহা নহে—সহস্রমুখে বলিতে লাগিল—দোহাই ধর্ম্মাবতার। আমরা মারা গেলাম। আমরা একেবারে সারা হইলাম। আপনী রাজা, আমরা প্রজা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা ধনেপ্রাণে সারা হইয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করিয়া যান। দোহাই ধর্ম্মাবতার। আমরা ধনেপ্রাণে একেবারে সারা হইয়াছি। আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া যান। যমের হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া যান। "শ্যাম চাঁদ" আঘাতে পৃষ্ঠে দাগ বসিয়াছে একবার পবিত্র চক্ষে সেই দাগগুলি দেখিয়া যান। আপনি দেশের রাজা, আমাদের পেটের দিকে মুখের দিকে একবার চাহিয়া যান। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমাদের দুরবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া যান।

সে কান্না কে শোনে? কাহার কর্ণেই বা যাইবে? ইনজিনের স্বাভাবকি বিকট্ শব্দে প্রজার আর্তনাদ লাট মহামতীর কর্ণে উঠিবে কেন? বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন, গ্রাম্য লোক ষ্টিমার কখনও দেখে নাই, তাহাই ছুটাছুটী করিয়া সোর গোল করিয়া আমোদের সহিতে দেখিতেছে। আহ্লাদে দৌড়িতেছে। ক্রমেই জন সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমেই কান্নার রোল দ্বিগুণ বৃদ্ধি। ষ্টিমার উজান মুখে যাইতেছে। স্রোত বেগ অতিক্রম করিয়া যাইতে সম্ভবতঃ একটু ধীরে চলিয়াছে। কালী গঙ্গাও বেশী প্রশস্ত নহে। এক পারের কথা অপর পারের লোকে বিনা মনযোগে বুঝিতে পারে। ষ্টিমারের সেই কর্ণ ভেদী ধর্ ধর্ ঘস্ ঘস্ শব্দ পরাজয় করিয়া সে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ গ্রান্ট মহামতীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চৈতন্য হইলেন। যেমনই মনযোগ, অমনি হৃদয়ে আঘাৎ। উভয় কূলের বহু সংখ্যক প্রজার আর্ত্তনাদে আজ বঙ্গেশ্বরের মন গলিয়া গেল। মনে মনে মনস্থ্ করিলেন যে জেলায় যাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। প্রজার দুরবস্থা নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন। মহামতীর মনের ভাব প্রজার জানিবার ক্ষমতা হইল না। আশ্বাসমূলক একটি কথা শুনিতেও তাহাদের ভাগ্য হইল না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে আমাদের এই কান্নায় লাট সাহেব ষ্টিমার থামাইতে আদেশ করিবেন, আমরা মনের দ্বার খুলিয়া দেখাইব। দুরবস্থার কাহিনী আজ মনের সাধে শুনাইব। তাহা হইল না। ষ্টিমার থামিল না। কি ভীষণ দৃশ্য। "নীলকরের দৌরাত্ম্য আগুনে আর কতকাল

জ্বলিব। রাজ গোচরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব সেও স্বীকার! তত্রাচ নীল আর বুনিব না।” এই কথা স্থির করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা নদী কূল হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে ষ্টিমার দিকে আসিতে লাগিল। প্রাণের মায়া নাই, জীবনের আশা নাই, কোন রূপ সুখের ইচ্ছাও আর নাই। কেনীর দৌরাত্মে মরিতেই হইবে। আর কেন? রাজ সম্মুখেই ডুবিয়া মরিব। এই কথা মনে করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, নদী স্রোতে অঙ্গ ভাসাইল। মহামতী লাট বাহাদুর মহা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ষ্টিমার থামাইতে আজ্ঞা করিলেন, এবং ষ্টিমারস্থ সমুদায় জালিবোট জলে নামাইয়া প্রজাদিগকে উঠাইতে আদেশ করিলেন। যাহারা সন্তরণ দিয়া ষ্টিমার ধরিল, ষ্টিমারের উপর উঠিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া দুরবস্থার বিষয় বলিতে লাগিল। ক্রমে সমুদায় প্রজা ষ্টিমারের চতুঃস্পার্শে, কেহ জলে, কেহ জালীবোটে, কেহ ডাঙ্গায় থাকিয়া আপন আপন দুঃখের কান্না কাঁদিতে লাগিল। প্রজার দুরবস্থার কথা শুনিয়া লাট বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। ১০/১২ জন প্রজাকে ষ্টিমারে লইয়া অপর অপর সকলকে আশ্বাস বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন—“তোমাদের যাহার যে নালিশ থাকে, আগামী পরশু শনিবার পাবনায় গিয়া আমাকে জানাইও। আমি তোমাদের বিচার অবশ্যই করিব। তোমরা কুঠীয়ালকে ভয় করিও না। এ দেশে তাহারাও যেমন প্রজা, তোমরাও সেই রূপ প্রজা।” এই বলিয়া ষ্টিমার ছাড়িয়া দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই সোনামুখী গৌরীর অগাধ জলে আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে গৌরী পার হইয়া পদ্মার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া পাবনা অভিমুখে চলিল।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ

সূত্রপাত

নীল বিদ্রোহীর সূত্রপাত। বাঙ্গালায় নীলকরের অধঃপতনের সূত্রপাত। প্রজার আনন্দের সীমা নাই। সকালে সকালে স্নান আহার করিয়া—ঘরে যাহা ছিল সিদ্ধ পোড়া ভাতে ভাত যাহা জুটিল আহার করিয়া গ্রামের মাথাল মাথাল প্রজা ছাতি লাঠি গামছা লইয়া লাটদরবারে যাত্রা করিল। নীলকরের দৌরাত্ম্য আগুনে যাহারা পুড়িয়া ছারখারে যাইতেছিল, তাহারাই জিলায় চলিল।

এদিকে কেনী পথে পথে লাঠিয়াল সর্দার, দেশওয়ালী, দোবে, চোবে, পাড়ে সিং মতাইন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এলাকার যে প্রজা পাবনায় যাইবে তাহার পিঠের চামড়া থাকিবার ত কথাই নাই। তাহার পর অন্য ব্যবস্থা। ফিরে গিয়ে বাস্তুভিটার মাটি আর চোখে দেখিতে হইবে না। স্ত্রী পরিবারের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।

একথা কুঠিয়াল পক্ষের মুখে জারী হইল। প্রজার কানে উঠিতেও বাকি রহিল না। কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাতাসে কথা আসিল বাতাসেই উড়িয়া গেল। প্রজার মনে সেই

উৎসাহ সেই আনন্দ! কার কথা কে শোনে? কে আজ সে কথা গ্রাহ্য করে আমীন, তাগাদগীর, পাইক, বরকন্দাজের হুকুমের চোটেই আগুন জ্বলিয়াছে, আজ খোদ কেনীর হুকুম শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল। এক কানে প্রবেশ,—অন্য কানে বাহির। হুকুম অদুলের ভয়ে প্রজার হৃদয় থরহরি কম্পে আজ কাঁপিয়া উঠিল না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া জিলায় চলিল। কি আশ্চর্য্য! খোদ যমের হুকুম আজ শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল।

হিন্দু মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষ বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহারও কোন কথা কানে করিল না। কারও বাধা মানিল না। কাল বঙ্গেশ্বরের মুখে যে কথা শুনিয়াছে সেই কথাতেই প্রজার চিরপরিশুষ্ক হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশা বারীর সঞ্চার হইয়াছে। তাহাতেই এত আনন্দ। কার সাধ্য বাধা দেয়? কার সাধ্য সে মাতওয়ারাদিগের গতি, ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক রোধ করে? কে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারে? কার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে ঐ কথা মুখে করিয়া দাঁড়ায়? পথ ঘাট ভরিয়া প্রজাগণ দলে দলে পাবনা অভিমুখে মনের আনন্দে চলিল। প্রজার বল, প্রজার সাহস, প্রজার ঐ সকল কথা কেনীর কর্ণে উঠিলে কেনী কি করিতেন, জানি না। তাঁহার কর্ণে এই মাত্র উঠিল যে,—

"অমুক অমুক গ্রামের প্রজারা হুকুম মানিল না। নিশ্চয়ই তাহারা পাবনায় যাইবে।"

আর কি কথা আছে? যেই শুনা অমনি হুকুম। প্রধান প্রধান আমলাগণ হাতি ঘোড়ায় চড়িয়া, যমদূতের ন্যায় বাছা বাছা সর্দ্দার, লাঠিয়াল, হিন্দুস্থানী, দেশওয়ালী সেপাইগণ সঙ্গে করিয়া মনিবের নিকট বাহাদুরী লইতে, গ্রামে গ্রামে প্রজা দমনে চক্ষু রাঙ্গা করিয়া চলিলেন। চলিলেন—না ছুটিলেন। যে দল যে গ্রামের প্রজার চক্ষে পড়িল, তাহাদের চক্ষের চাউনী দেখিয়াই তাঁহাদের শরীর গরম হইয়া গেল। চক্ষের কথা ত আগেই বলা হইয়াছে। কারণ যাহা কখনো দেখেন নাই, কানে শোনেন নাই তাহাই দেখিলেন এবং শুনিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিতেই একজন সোর করিয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ আসিয়াছে, ঐ আসিয়াছে, তোরা কে কোথায়?"—

হাতের মাথায় যে যাহা পাইল, সেই তাহা লইয়া ছুটিল। চক্ষের পলক ফিরাইতে না ফিরাইতে বহু লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল—'ভাল মানুষ হও তবে চলে যাও, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে ফিরে যাও। আর এক পা এদিকে আসিলেই মাথা ভাঙ্গবো। কাল লাট সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, কুঠেল সাহেবরা আমাদের রাজা নয়, হর্ত্তা কর্ত্তার মালিকও নয়। ওরে আমরা আগে বুঝিতে পারি নাই। আজ আমরা আমাদের রাজার দরবারে যাইব! এতদিন যা যা করেছ, তাই জানাব। একটি কথাও মিছে বলিব না। এখন বেশ বুঝেছি। আর হবে না।—এখন খুব বুঝেছি, আমরাও প্রজা তোমরাও প্রজা। আমরাও যা তোমরাও তাই। ভালাই চাস ফিরে যা—আর আগে বাড়িস না। আমরা যথার্থ রাজার কাছে যাচ্ছি। তোদের ও ভেল রাজার কথা কে শোনে রে'?

কুঠীর চাকর! কম পাত্র নহে সহসা হটিবার লোক নহে—হটিল না। কিন্তু প্রজার কথায় পায়ের তালু হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেল। ভাবিল না, চিন্তাও করিল

না, চিন্তা করিবার সময়ও পাইল না। হঠাৎ এরূপ কেন হইল? এরূপ পরিবর্তন কেন ঘটিল? উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাবাও কঠিন কথা। চিন্তা করাও শক্ত কথা। তাহাতে কুঠীর চাকর, পূর্ণ মাত্রায় সর্ব্বদাই রাগে চড়া। ঐ সকল মর্ম্মভেদী কথায় রেগে ভূত হইলেন। স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদা, কুঠীর ক্ষমতা, নিজ এলাকা। কাল যাকে চাবুক সই করেছি, সাহেবের শ্যামচাঁদের ঘা আজ পর্য্যন্ত পিঠে বিরাজ কর্চ্ছে। উঠতে কানমলা, বসতে কানমলা, লাথী, কীল, চড়চাপড়ের সীমা কে করে? মেয়ে মানুষ ধরে নীল কাটাইয়াছি। যে ব্যাটা হাত নেড়ে বেশী কথা বলছে, কালও এই কালিগঙ্গায় ঐ ব্যাটার ঘাড়ে গুণবাড়ী দিয়া নীলের নৌকায় গুণ টানাইয়াছি। আজ এত বড় কথা, কি কাণ্ড! এই সকল কথা মনে মনে তুলিয়া শেষ করিতে করিতেই উত্তেজিতভাবে তেরী মেরী করিয়া মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিল—

মার !!! দের! মার !!! দের! এক মুখ হইতে কথা ছুটিতেই অধীনস্থদিগের ৫০ মুখে ঐ কথা—

ঐ পীট্ পীট্ প্রায় ৫০০ শত মুখে আন্তরিক ক্রোধের সহিত ঐ কথা—বেশীর ভাগ প্রজার মনের অন্তঃস্থান হইতে বাহির হইল আর কি? কর খুন্! মার !!! দের! ভাঙ্গ মাথা, মার লাঠী—

যাহা ঘটিবার ঘটিল—শেষে যাহা ঘটিল, সে কথা প্রকাশ করিতে যথার্থ বলিতেছি পথিকের মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল! চক্ষে জল আসিল। পাঠক! যথার্থ বলিতেছি মনে সেই এক প্রকার ভাবের উদয় হইল। যে, হা! কাল কি আজ কি ভগবান! তোমার যে অপার মহিমা, তোমার যে অপার লীলা! তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজিকার এই ঘটনা। নীলকর এবং প্রজার ঘটনা। সাধারণ চোখে দেখিতে গেলে কিছুই নহে। হয়ত কাহারও চক্ষে নাও পড়িতে পারে। কিন্তু স্থিরভাবে একবার ভাবিয়া দেখিলে আজিকার এই ঘটনায় ভগবানের একটি মহৎ মহিমার সপ্রমাণ হইল।

পাঠক! অনেকেই গান গায়, অনেকেই গানে গলিয়া যায়। কেনীর কার্য্যকারক, লাঠীয়ালদিগের অবস্থা দেখিয়া মাননীয় ভ্রাতার একটি গান পথিকের মনে পড়িল। গানটি শুনুন—উপস্থিত ঘটনার ভাব এই গানেই পাইবেন—বিস্তারিত বর্ণনায় আর শক্তি হইল না গানেই বুঝিবেন। শুনুন!

গান

দেখ ভাই জলের বুদ্ বুদ্, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ বাদ্সা হয়ে দোস্ত ল'য়ে রংমহলে করছে খেলা—
কাল আবার সব হারায়ে ফকির হয়ে সার করেছে গাছের তলা
আজ যে ধন গরিমায়, লোকের মাথায় মারছে জুতা এড়িতোলা—
কাল আবার কপনী পরে টুকনী করে, কান্ধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা॥

আজি যেখানে সহর কতই নহর বসিয়াছে বাজার মেলা—
কাল আবার তথা নদী নিরবধী করছেরে তরঙ্গ খেলা।।

পাঠক! কুঠীর লোক প্রজাশাসনে দল বান্ধিয়া দলে দলে কুঠীর নিকটবর্তী যে যে গ্রামে বাহাদুরী লইতে আসিয়াছিল,—যে দল যে গ্রামে ঢুকিল, সেই গ্রামেই ঐ এক কথা। একরূপ অভ্যর্থনা। একরূপ ভাব। শেষ ফল সকল স্থানেই সমান। গ্রাম বিশেষ কিছু ইতর বিশেষ যে না ঘটিল তাহাও নহে। কোন দলই দল বাঁধিয়া আর কুঠীমুখ হইতে পারিল না। নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আকারে, যে যে প্রকারে সুবিধা সুযোগ পাইল, প্রাণ লইয়া কুঠীমুখে ছুটিল। ছুটিল কি? পালাইল। কাহাকে বাধ্য হইয়া ঘোড়াটি ছাড়িয়া যাইতে হইল। কেহ কেহ পরিধেয় বসন ফেলিয়া বাধ্য হইয়া দিগম্বর বেশে মাঠে মাঠে দৌড়িয়া পালাইল। ঢাল, তরবার, লাঠী ঠেঙ্গা কালিগঙ্গার স্রোতে যাহা ভাসিবার ভাসিয়া চলিল, যাহা ডুবিবার ঐখানেই ডুবিয়া পড়িল। জলে ফেলিল কে? অমোঘ অস্ত্র সকল আজ জলে বিসর্জ্জন করিল কে? সকলি সেই দয়াময়ের মহিমা। কুঠীর লোক প্রাণ লইয়া পার। কেনীর অস্ত্র প্রজা হস্তে আজ প্রথম জলে ভাসিল, এই প্রথম জলে ডুবিল। যাহারা দরবারে যাইতে একটু বাধা পাইয়াছিল, তাহারা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মনের আনন্দে সম্পূর্ণ উৎসাহে জিলায় লাট দরবারে চলিল। পূর্ব্বে যাহাদের যাইবার কোন কথাই ছিল না, উপস্থিত ঘটনায় তাহারাও অনেকে তাহাদের সঙ্গি হইল। কি জানি আবার কোন দুষমন কোন পথে কি ঘটনা ঘটায়। হিন্দু মুসলমান একত্রে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নাম করিয়া সার বাঁধিয়া পথে বাহির হইল। কালিগঙ্গায় গৌরী গর্ভে নৌকায় পদ্মার ঘাটে এবং চলতি রাস্তায়, পথব্রজে কত লোক যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সকলের মুখেই আনন্দের আভা। সকলেই যেন কি একটা মহৎ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবে আশয়েই মহাখুশী। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত। সকলেই যেন জেল হইতে খালাস পাইয়াছে। অবিচারে অত্যাচারে এতদিন জেলখানায় পচিতেছিল। দৈববলে বালিয়ান হইয়া জেল ভাঙ্গিয়া যেন কোন যথার্থ আশ্রয়দাতার পদাশ্রয় লইতে বেগে ছুটিয়াছে। পদ্মা গৌরী সংযোগ স্থল বড়ই ভয়ানক। পদ্মা পাড়ী না দিলে জিলায় যাইবার উপায় নাই। নৌকাতে পদ্মা পার হইতে হয়। সুখ পথে বান্দা রাস্তা বহিয়া গেলেও কাঁচা দিয়াড়ের ঘাটে পাটনীর নৌকায় খেয়া পার হইতে হয়। পাঠক। চলুন আমরাও পদ্মাপারে যাই।

উনত্রিংশ তরঙ্গ
দরবার

আজ শনিবার। বঙ্গেশ্বর প্রকাশ্য দরবারে প্রজার দুরবস্থা শুনিবেন। প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করিবেন। এই ঘোষণা। জিলাময় লোক। মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, ইছামতী নদীর পূর্ব্ব পশ্চিম,

উভয় তীরে, দালানে, কোঠায়, ঘরে, বোটে, বজরায়, নানাবিধ স্থানে লোক আর ধরে না। লাট দেখিতে, দরবার দেখিতে, মনের বেদনা জানাইতে নীলকরের দৌরাত্ম্য বিষয়, বঙ্গেশ্বরের গোচর করিতে হিন্দু, মুসলমান, কৃষকশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী, তালুকদার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী নানা শ্রেণীর লোক উপস্থিত। নীলকর পক্ষীয়, নীলকর সংশ্রবী, হিতৈষী, ভালবাসার লোকও যে ঐ সকল দলের মধ্যে কেহ কেহ না আছে এরূপও নহে। তাহারা নানা বেশে, নানাভাবে দল মধ্যে গোপনে, প্রকাশ্যে বেড়াইতেছে—সন্ধান লইতেছে। উপস্থিত লোকসমুদ্র মধ্যে কুঠিয়াল পক্ষীয় লোক বিন্দু সদৃশ। হঠাৎ কাহারও নজরে পড়িতেছে, আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার আর সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এত লোকের মধ্যে সে দুষমন চেহারা যেন মার্কা মারা। মুখের দিক নজর পড়িতেই যেন মুখভাবেই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, আমরাই কুঠীয়াল পক্ষীয়। আমরাই নীলকরের গুপ্তচর ও সন্ধানী। বড় বড় জমিদার বড় বড় বজরায়, বড় বড় নিশান উড়াইয়া, ঘাট অঘাট আলো করিয়া ইছামতীর বক্ষে ভাসিতেছেন। বায়ু প্রতিঘাতে জল নাচিতেছে। বোট বজরাও নাচিতেছে। অনেকেই নানা দোলায় দুলিতেছেন। কে কোন পক্ষে থাকিবেন, প্রজার হইয়া দুইটি কথা বলিবেন কি নীলকরের পক্ষ সমর্থন করিবেন। লাট সাহেব আজ আছেন কালই চলিয়া যাইবেন, শেষে—ধরিবে কে? কুঠীর নাএব পেস্কার দেওয়ানজীবাবুকে কত ডালা, কত ফল ফুল, কত চব্য চষ্য লেহ্য পেয় দিয়া একটু অনুগ্রহ পাইয়াছেন। লোকে বলে ভালবাসা হইয়াছেন। তাহার পরেও কত রুধির কত তৈল উপহার দিয়াছেন। কত আলাপী লোকের নিকট হইতে গ্রিসীয়ান সিলিপর কেহ ঠনঠনের জোগাড় করিয়া আমলাদিগের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। তাহাতেই রক্ষা! তাহাতেই আজ বজরার মাস্তুলে বড় বড় নিশান। কুঠীয়ালকে দিয়ে থুয়ে যা আছে তাহাতেই কষ্টে সৃষ্টে কোন গতিকে মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া এত দিন কাটাইয়াছেন। মনের কথা মনেই আছে। মুখ ফুটে প্রকাশ করা জমীদার শ্রেণীর বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছে। পরিণাম ফল প্রতি তাঁহাদের অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে। প্রজার দিকে থাকিলেই বা কি হয়। নীলকরের পক্ষেত যে প্রকারেই হউক, প্রকাশ্যেই হউক, মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে গোপনেই হউক, এক ভাবে আছেনই। আর প্রজার পক্ষে যে না আছেন তাহাও নহে। গোপনে গোপনে তাহাদের সহিত বিশেষ যোগ রাখিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত, কোন পক্ষের নিকটই মনে মুখে, পরিচিত হন নাই যে তিনি কাহার? রামের, না রাবণের? নীলকরের না প্রজার—বড়ই কঠিন সমস্যা উপস্থিত! আর পা দিয়া সাপ খেলান চলিল না। দুই মন যোগাইয়া নিরাপদে থাকা আর ভাগ্যে ঘটিল না। মহা সঙ্কটকাল উপস্থিত! এই শ্রেণী মধ্যে মীর সাহেবও আছেন, সাগোলামও আছেন। কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র নৌকায়। কে কোন পক্ষে আছেন তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে এটা নিশ্চয় কথা, এক প্রকার জানা কথা। মীর সাহেব যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সাগোলাম তাহার বিপরীত দিকে—বিপক্ষে নিশ্চয়ই থাকিবেন। মনে সুখ কাহারও নাই। অন্য অন্য জমীদারগণেরও ঐ কথা! মনে নানা কথা। স্বার্থ, লোভ, স্বদেশ, প্রজা, নীলকর

গুদাম, শ্যামচাঁদ, নীলহউজ, নীলের নৌকা, গুণ টানা ইত্যাদি। অন্য দিকে লাট দরবার! যা থাকে কপালে ইত্যাদি নানা কথায় নানা চিন্তায় সকলেই চিন্তিত। মনে সুখ কাহারও নাই। প্রজার মনেও সুখ নাই, নীলকরের মনেও সুখ নাই।

সোনামুখী ইছামতীগর্ভে নানা সাজে সজ্জিত হইয়া উচ্চ মাস্তুলে ব্রিটীস নিশান সদর্পে উড়াইয়া—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জয়! ঘোষণা, ইছামতীর স্রোতের সহিত একত্র মিশিয়া করিতেছে।

বর্ষাকাল। শহরের প্রায় তিন দিকেই ইছামতী পরীখা রূপে স্বাভাবিক বক্রগতিতে পদ্মায় মিশিয়াছে। পরিসর বেশী নহে। এপার ওপার, কথা যাওয়া আসা করিতে পারে। কালগতিকে জল স্থল প্রায় সমান হইয়াছে। নদী কিনারের দালান, কোঠা বড় রাস্তা, বড় বড় গাছ, তাহার পরেই বোট, বজরা, ডিঙ্গিনৌকা, জল, মাস্তুলে নিশান। একটু দূরেই সোনামুখীর সেই মহামাস্তুলের মস্তকোপরী রাজ নিশান অতি গম্ভীরভাবে দুলিয়া দুলিয়া বঙ্গেশ্বরের শুভাগমন চিহ্ন বায়ুকে দেখাইয়া সর্ব্বত্র ঐ আগমন সংবাদ প্রচার জন্য নম্রতার সহিত অনুরোধ করিতেছে। সোনামুখীর পশ্চিম দিয়া চলতি নৌকা, স্রোত সহায়ে মহাবেগে ছুটিয়াছে। ইছামতীর পশ্চিম তীরে লোকের অবধি নাই। কত আসিতেছে, কত সারি বান্দিয়া, দাঁড়াইয়া, জাহাজ, নৌকা, বজরা, বোট, নিশান দেখিতেছে। খেয়া নৌকা ডোব ডোব হইয়া মানুষ পার করিতেছে।

মফস্বলের দরবার! বিশেষ বর্ষাকাল। দরবারে সাজ-সজ্জা, বাহার, জাঁকজমক কিছুই নাই। বৃহৎ সামিয়ানার তলে শতাধিক আসন। তিন খানি বড় চৌকি একত্র করিয়া তাহার উপরে এক খানি গদীবসান ভাল চ্যায়ার। তদুপরি—জড়াও চাঁদওয়া। জিলার হাকিমান, থানাদার, জামাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদার সকলেই হাজির। দুই প্রহর হইয়া বেলা কিছু গড়িতেই জিলার মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণের দরবারে বার আরম্ভ হইল। চতুর্দিক হইতে সাধারণ প্রজার হরিবোল এবং আল্লা ধ্বনিতে জলস্থল কাঁপিতে লাগিল। সময় বুঝিয়াই বঙ্গেশ্বর পারিষদগণসহ দরবারে পদার্পণ করিলেন। সে সময় প্রজাগণ উৎসাহের সহিত দ্বিগুণ রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। জলস্থল কাঁপাইয়া, বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া, সে অনন্ত জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনন্ত আকাশে হইতে লাগিল। চারদিক হইতে চুপ্ চুপ্ কথা উঠিয়া, অতি অল্প সময় ঐরূপ গোলযোগেই কাটিয়া গেল। শেষে সকলেই নিরব। বঙ্গেশ্বরের পারিষদগণ মধ্য হইতে একজন বাঙ্গালা ভাষায় প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বঙ্গাধীপের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমাদের প্রার্থনাপত্র দাখিল কর, আর মুখে যদি বলিবার থাকে তাহা বল"—

মুখের কথা মুখ হইতে না ফুরাইতেই অতি কম হইলে দশ হাজার মুখে একযোগে বলিয়া উঠিল—

"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা মরিলাম। নীলের জুলুমে আমরা মারা গেলাম। আমাদের

পেটে ভাত নাই। ধানের জমীতে জবরাণে নীল বুনিয়া লয়। আমরা কি খাইয়া বাঁচি।"

কথা শেষ হইতে না হইতে প্রার্থনাপত্র সকল হাতে হাতে বঙ্গেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। এক পারিষদে দরখাস্ত লইয়া কুলাইতে পারিলেন না। শেষ সমুদায় পারিষদ স্বয়ং বঙ্গাধীপ, স্থানীয় হাকিমান প্রভৃতি প্রজার প্রার্থনাপত্র হাতে লইয়া লাট সাহেবের দক্ষিণ বামে রাখিতে লাগিলেন। পাঠক! একেবারে উপকথা মনে করিবেন না। এত প্রার্থনাপত্র দাখিল হইল যে লাট বাহাদুরের দুই পার্শ্বে দুইটি কাগজের স্তূপ খাড়া হইল। একটি মানুষ সেই স্তূপের পার্শ্বে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তথাচ ইতি নাই, ক্রমেই হাতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে প্রজার আর্ত্তনাদ। নীলকরের দৌরাত্ম্য কথা, অত্যাচারের কথা, লাট বাহাদুরের কানে আসিতেছে। মুখে যে কথা প্রার্থনাপত্রেও সেই কথা। তবে বিস্তারিতরূপে লিখা। কিন্তু মূল একই। প্রজার মনের ভাব, প্রার্থনাপত্রের চুম্বকভাব বুঝিতে লাট বাহাদুর কেন? দরবারস্থ যাবতীয় লোকেরই বুঝিতে বাকী রহিল না। নীলকরের অত্যাচার যে প্রজাগণের অসহনীয় তাহাও বেশ বোঝা গেল। নীলকর পক্ষীয় লোকের এবং দারগা, জমাদার ও স্থানীয় হাকিমান, জমিদার সকলের সম্মুখে প্রজাগণ কাতরস্বরে দুঃখের অবস্থা কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিল। মনের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিল। হাকিমান লজ্জিত, দারগা, জমাদারের মাথা হেট্, নীলকরের মুখে চুনকালী, প্রজার চক্ষে জল। আর বুঝিতে বাকি কি? সকলেই বুঝিলেন, হাকিমান বুঝিলেন, বঙ্গাধীপও বিশেষ করিয়া বুঝিলেন যে যথার্থই নীলকরগণ অত্যাচারী। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়াই এত উতলা এত উত্তেজিত। এত একগুঁয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপাততঃ মিষ্ট কথায় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গাধীপের আদেশে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পারিষদ মহোদয় উচ্চৈঃস্বরে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন।—

"প্রজাগণ! তোমরা স্থির হও, এত উতলা হইও না। স্থির হইয়া শুন! গোল করিলে তোমাদের কার্য্যেই বিঘ্ন ঘটিবে। স্থির হইয়া কথা শুন।"—

প্রজাগণ! তোমরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা তোমাদের প্রতি সবলেরা কোন প্রকার অত্যাচার না করে, চোর ডাকাতে তোমাদের টাকা কড়ি লুটপাট করিয়া না লয়। জমীদার, নীলকর তোমাদিগকে অন্যায়রূপে কোন প্রকারে কষ্ট না দেয়, জোর জবরাণ না করিতে পারে তাহার জন্যই অর্থাৎ তোমাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্যই স্থানে স্থানে থানা, মহকুমা জিলা বসান হইয়াছে। তোমরা সর্ব্বপ্রকারে সুখে থাক ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। নীলকরের অত্যাচারে তোমরা যে কষ্টে আছ তাহা বেশ বোঝা গিয়াছে।

প্রজাগণ মধ্য হইতে একজন বলিতে দশ জন বলিয়া উঠিল—দোহাই ধর্ম্ম অবতার! আমরা একেবারে সারা হইয়াছি। আমাদের জাত, কুল, মান, প্রাণ সকলি গিয়াছে। পেটে ভাত নাই। তাহার উপর আমীন খালাসীর বেতের ঘা, কপালগুণে কোন কোন দিন শ্যামচাঁদের সঙ্গেও আলাপ। দেখুন! পেটের পীঠের অবস্থা দেখুন! আর কি বলিব।"—

পারিষদ সাহেব বলিলেন—আর দেখাইতে হইবে না। তোমাদের দুর্দশার বিষয় সকলেই ভালমত বুঝিয়াছেন। শুন—স্থির হইয়া কথা শুন। যাতে তোমাদের ভাল হইবে, তোমরা সুখে থাকিবে তাহাই শুন।

তোমরা জমিদারকে দস্তুরমত জমির খাজানা বিনা ওজরে দিবে। নীলকর কি জমিদার তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে প্রথম থানায় জানাইবে। পরে তাহারা যাহা বলিয়া দেয় অর্থাৎ মাজিষ্টার সাহেব নিকট জানাইতে বলিলে তাঁহার নিকট জানাইবে। তিনি তোমাদের নালিস শুনিবেন—তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা যাহাতে সুখে থাক তাহার উপায় করিবেন। তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি নীলের আবাদ না কর তবে তোমাদিগকে জোর করিয়া কেহই নীল বুনানী করাইতে পারিবে না। যে জোর জবরাণ করিবে সেই শাস্তি পাইবে। বড়, ছোট, গরীব, ধনী, কৃষিপ্রজা, জমিদার কী নীলকর বলিয়া বিচারে কোন ইতর বিশেষ নাই। বিচারাদালতে সকলেই সমান। এমন বিচারে আর তোমাদের ভয়ের কারণ কি? মন্দ কাজ করিলে তোমরাও যেমন শাস্তি পাইবে, নীলকর সাহেবও তেমনি শাস্তি পাইবেন। যে অপরাধে তোমরা ফাটক খাটিবে, সেই অপরাধে নীলকর সাহেবও জেলে যাইবেন। বিচারাদালতে কোন প্রভেদ নাই। কোনরূপ খাতির নাই। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজ করাইতে পারে না। তোমাদের ইচ্ছা হয় তোমরা নীল বুনিয়া তাহার মজুরী লও। ইচ্ছা না হয় নীল বুনিও না, মজুরী পাইবে না।

শত মুখে বলিয়া উঠিল—ধর্ম্মাবতার! আমরা মজুরী চাই না। ভিক্ষা করিয়া খাইব তবু নীলের বীজ আর হাতে করিব না। মজুরী আমাদের মাথায়। আমরা কিছুতেই আর নীল বুনিব না।—

পারিষদ সাহেব। "শুন! আরও শুন! সে তোমাদের ইচ্ছা। অনিচ্ছায় তোমাদিগের দ্বারা কেহই কিছু করাইতে পারিবে না। আর তোমাদের এই সকল দরখাস্তের বিচার কলিকাতায় গিয়া হইবে। তোমরা ইহার খবর সত্বরেই জিলার হাকিমান সাহেবগণের মুখে শুনিতে পাইবে। আর তোমাদিগকে আভাষ বলিতেছি, সালঘর মধুয়ার কুঠীর নিকটে শীঘ্রই এক নূতন মহকুমা খোলা হইবে। পদ্মাপারের প্রজাকে পদ্মাপার হইয়া আর পাবনায় আসিতে হইবে না।

প্রজাগণ অন্তরের অন্তঃস্থান হইতে মহারাণীর জয়! জয় মা ভারতেশ্বরীর জয়! ঘোষণা করিতে করিতে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দুই হাত তুলিয়া লাট বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এত দুঃখের পর, এত যন্ত্রণা এত ক্লেশের পর প্রধান রাজপুরুষের মুখে এইরূপ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল প্রায় হইল। দারগা, জমাদার, প্রহরী, সাস্ত্রী কেহই আর সে গোলযোগ নিবারণ করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ জয় ঘোষণা, পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ—হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে আশীর্ব্বাদ। অতি কম হইলেও ২০ হাজার কণ্ঠ হইতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—সেপাই, সাস্ত্রী, প্রহরী, দারগা, জমাদার স্বয়ং মাজিষ্টার সে গোলযোগ নিবারণ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহই কিছু

করিতে পারিলেন না। প্রজার আনন্দ যেন আর ধরে না। জবরাণে কেহ নীল বুনানী করিতে পারিবে না। এই মহামূল্য কথায় প্রজার আনন্দ আজ হৃদয়ে ধরে না। দুহাত তুলিয়া নাচিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সে জয়ঘোষণা—সে আশীর্ব্বাদে বাধা দেয় কার সাধ্য! ঘোর উন্মত্ত। কে কাহার কথা শুনে, কে আজ কাহাকে মান্য করে! কার কথায়, কার নিবারণে সে মত্ততা হইতে ক্ষান্ত হয়? মনে অন্য কোন কথা নাই, ভবিষ্যত ভাবনার দিকে কাহারও মন নাই, গ্রামে ফিরিয়া গেলে নীলকরের হাতে জাতি মান প্রাণ বজায় থাকিবে কিনা? যেটুকু আছে—যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা থাকিবে কিনা? বাড়ী গিয়া স্ত্রী পরিবার সন্তান সন্ততি ভাই বন্ধু পরিজনের মুখ দেখিতে পাইবে কিনা? আজিকার এ ঘটনার পরিণাম ফল কি? ইহার সীমা কোথায়। সে সকল কথার দিকে কাহারও মন নাই। জয়রবে উন্মত্ত। আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কণ্ঠ শুষ্ক। স্থানীয় হাকিমান, শান্তিরক্ষক মহোদয়গণ, এই উত্তপ্ত সুবর্ণ মাখা, রাজ রচনাবলি তাঁহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইবে কি না? তাঁহারা রক্ষা করিবেন কি না? রক্ষা করিতে পারিবেন কি না? নিরীহ প্রজার প্রাণ, নীলকর রাক্ষসের বিষময় বিল দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না? অসীম সুখ সাগরে ভাসিয়া আবার বিষাদ তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইয়া একেবারে ডুবিতে হইবে কি না? ক্রমে নব জীবন স্থায়িত্ব হইবে কিনা? হইবার আশা আছে কি না? সে বিষয় কাহার মনে নাই। আনন্দে বিভোর, জয়রবে বিহ্বল, জয়রবে মত্ত, কার কথা, কে শুনে? সুতরাং সভাভঙ্গ—বঙ্গেশ্বর পারিষদসহ সোনামুখীতে উঠিলেন। স্থানীয় জমিদার নীলকর, মহাজন সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের আহ্বান হইল। ক্রমে সকলেই সোনামুখীতে যাইয়া লাট বাহাদুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইতে লাগিলেন।

চলুন আমরা প্রজাগণের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা পার হই। আর তাহারা আজ যে মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়া চলিল, চলুন তাহাদের মনের ভাবটা ভাল করিয়া শুনিয়া লই। বড় কঠিন স্থানে আসা হইয়াছে। মানব জীবনে—নবজীবন। বড়ই কঠিন ব্যাপার! কি যে ঘটিবে, প্রজার ভাগ্যে কি ঘটিবে! তাহা সেই অন্তঃর্যামী ভগবানই জানেন।

বঙ্গেশ্বর অদ্যই পাবনা ছাড়িবেন। পাবনার বর্ত্তমান শ্রী সোনামুখীর ধুম উদ্‌গিরণ সহিত একেবারে বিশ্রী হইয়া যাইবে। আর কেন? আগমনে যোগ আনন্দকর—বিদায়ে যোগ বড়ই দুঃখকর—চলুন আর এখানে থাকা নয়।

ত্রিংশ তরঙ্গ

মনের কথা

পাঠক! আমিও বলিতেছি মনের কথা—আপনারাও শুনিতেছেন উদাসীন পথিকের মনের কথা। এখন প্রাণ ভরিয়া একবার প্রজার কথা শুনুন। এ কয়েক দিন তাহারা কি বুঝিল,

কি পাইল ঐ শুনুন অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন। অধমও সঙ্গেই আছে।—

১ম প্রজা। ভালই হল! পদ্মা পাড়ী দেওয়ার দায় হইতে রক্ষা পেলেম। বাঁচা গেল। কুঠীর নিকটেই মহকুমা হবে। হাকিম থাক্‌বে। যখন যাহা হবে তখনি হাকিমকে জানাইতে পারিব। প্রাণটী হাতে করে পদ্মা পাড়ী দেওয়ার দায় হইতে ত বাঁচা যাবে।

২য় প্রজা। হলেত ভালই হয়! ভায়া! না হলে আর বিশ্বাস নাই।

১ম। ভায়া! তাকি আর না হয়ে যায়? একি তোমার আমার কথা না—বড়লোকের কথা? ভায়া! এ সাহেব সুবার কথা। একথার মার নাই।

২য়। তাত বটে। তোমার আমার কথাটা যেন ভাল করে না বুঝেই বল্‌লেন যে বুঝেছি। আর ভায়া কষ্টের জীবনে, অনাটনের সংসারে, স্বার্থের প্রয়োজনে, বিশেষ কন্যাদায়ে এবং অন্নচিন্তায় আমাদের কথা ঠিক থাকে না।—থাকিতে পারে না, আমারও কথা ঠিক রাখিতে পারি না।—তা ঠিক! কিন্তু বড়লোকের কথাটা কি রকম?

১ম। ভায়া হে! রকম আর কিছু নয়। বড়লোকের সকলই বড়, দান বড়, কৃপণতা বড়, মান বড়, অপমান বড়, গলাও বড়, কথাও বড়। যেখানে বড় কথা, সেইখানেই গোলের কথা। ওকথাও বড়লোকেরই কথা। কিন্তু সে মুখ ভিন্ন—সে কথাও ভিন্ন। সে কথার মূল্য অনেক। ভায়া! ইংরেজের যে কথা সেই কাজ।

২য়। আচ্ছা আর একটা কথা। আমরা এত দিন না বুঝে কত বোঝাই যে মাথায় বয়েছি, কত ভূতেরই যে বেগার খেটেছি, কত জনেরই যে বিনামা সোজা করেছি। না বুঝে কার না পায় ধরেছি। কত কষ্টই ভোগ করেছি। তার আর ইতি নাই।

১ম। ভায়া। যা হবার হয়েছে। এখন দেখে, শুনে, ভুগে পাকা না হয়ে থাকি, একটুকু যেন শক্ত হয়েছি। আর এ কয়েক দিনে দেখলেম অনেক শুনলেমও অনেক। ধাঁদা কেটে গিয়েছে। নীলকর সাহেবরা যে আমাদের রাজা নয় সে জ্ঞানটা ভালই জন্মেছে। ভায়া! রাজার ভাবই ভিন্ন। দেখলে না লাট সাহেবের কাছে জজ ম্যাজিষ্টার যেন কিছুই নহে। চুপ্‌ চাপ্‌, কথাটী মুখে নাই। মাছিটী পর্য্যন্ত নড়ে না। সকলেই যেন ভয়ে ভয়ে পা ফেলে, ভয়ে ভয়ে তাকায়, ভয়ে ভয়ে কথা কয়। নীলকর সাহেবরা কে কোথায় পড়ে রৈল, ভায়া! দেখেছ ত? লাট সাহেব তাদিগকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা কল্লে না। খাতির তওয়াজার নামও কল্লে না। যেমন আমরা তেমন তাহারা। মফস্বলে দারগা; জমাদারদের লাফানি ঝাঁপানী দেখে কে? বাপ্‌রে! বরকন্দাজের তেরী মেরী কথাই বা কত! আজ কেমন দুরস্ত? লাট সাহেবের কাছে কেমন সোজা জোড় হাত—এক হাত দু হাত নয়, ভায়া! একেবারে ৫০ হাত তফাৎ। খাড়া পাহারা। বাপ্‌রে বাপ্‌। বড় বড় হাকিম, বড় বড় জ্যান্ত বাঘ! আজ লাটের সম্মুখে যেন বিড়াল। চুঁ শব্দটী মুখে নাই।

২য়। ভায়া। সত্তি সত্তি কি আর নীল হবে না?

১ম। ভায়া! শুন্‌লে কি নীল আর হবেই না। আমরা যদি ইচ্ছা করে বুনী তবে হবে।

নীলকর সাহেবরা জবরাণ করে আর বুনিতে পারিবেন না। আমাদের ধানের জমীতে আর জবরাণে মার্কা দিয়া নীল জমীর সামিল করিতে পারিবে না। যে জবরাণ কর্ত্তে খাড়া হবে সেই মারা যাবে। ভায়া! সে কি যে সে মুখের কথা নিশ্চয় যেন যে অত্যাচার করবে সেই জেলে যাবে।

২য়। জেলে ত যাবে! ধরে নিয়ে গিয়ে যদি আগেই কাজ ঠাণ্ডা করে দিলে তখন জেলে গেলেই কি, আর ফাঁসীতে ঝুলালেই আমাদের লাভ কি? আমরাত সারা হলেম!

১ম। নাহে—না। ঈশ্বর আছেন। আর সারা হতে হবে না! আমরাত আর স্বইচ্ছায় নীল বুনিব না। আর কার সাধ্য আমাদের জমিতে জবরাণে নীল বোনে। সকলে এক যোট থাক্‌লে আর ভয় কি ভায়া? যে ব্যাটা আমাদের জমীতে নীল বুনতে কি চাষ দিতে আসবে, সে ব্যাটার মাথা আগে ভাঙ্গবো। প্রাণ দিব তবু নীল বুনিব না। নীল বুনিতে জমিও দিব না।—চল, শীঘ্র শীঘ্র চল। পদ্মা পাড়ী দিয়া ওপারে যেতে পাল্লে বাঁচি। লাট সাহেবের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আর যেন আমাদিগকে পদ্মা পাড়ে না আসিতে হয়।

নানা পথে, নানা কথা তুলিয়া প্রজাগণ হাঁসি খুশিতে যাইতেছে। কেহ নীলকরের পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিতেছে। কেহ মাজায় কাপড় বান্দিয়া বাহাদুরী জানাইয়া 'নীল আর হবে না নীল আর হবে না' এই কথা চিৎকার করিয়া কহিতে কহিতে যাইতেছে। কথায় কথায় লাট সাহেবের খোসনাম গান গাইতেছে। সোনামুখীরই বা কত সুখ্যাতি করিতেছে।

একত্রিংশ তরঙ্গ
বৈঠক

প্রজাগণ মনের আনন্দে হাসিখুশী করিতে করিতে গ্রামে আসিল। যাহারা বাড়ীতে ছিল তাহারা এই সুখবর শুনিয়া মৃত শরীরে যেন জীবন সঞ্চার হইল। দুইহাত তুলিয়া লাট বাহাদুরের দীর্ঘজীবন ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মঙ্গল কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল। মেয়ে মহলেও হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উলু উলু ধ্বনিতে গ্রাম, পল্লী, পাড়া জাগিয়া উঠিল। "নীল আর হইবে না" এই কথা শুনিতেই বৃদ্ধা, যুবতী, এমনকি বালিকার প্রাণ পর্য্যন্ত আহ্লাদে আটখানা হইয়া গলিয়া পড়িল। আমীন, তাগাদগীর, পাইক প্যাদার ভয়, স্ত্রীলোকদিগের মন হইতে অনেক তফাৎ হইল। কেনীর নামে প্রাণ কাঁপিত—শরীর রোমাঞ্চিত হইত, আজ যেন আর সেরূপ হইল না। কুঠীর নামে মুখ বুক শুকাইয়া হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যাইত, প্রাণ ধর ফড় করিত, তাহাও যেন আর হইল না। লাট বাহাদুরের হুকুম, নীল আর হইবে না। মুখে মুখে কথা সংক্ষেপ—ক্রমেই সংক্ষেপ—শেষে এই পর্যন্ত দাঁড়াইল যে লাট বাহাদুরের হুকুম, "নীল আর হবে না।"

নূতন কথা, নূতন ঘটনা, মানুষের মুখে নূতন নূতন খুব চর্চ্চা হয়। বিশেষ মহাস্বার্থের আভাস থাকিলে দিন রাত্রে সহস্রবার মুখে আওড়াইলেও মনে সুখ জন্মে না। প্রজামহলে দিবা রাত্রি ঐ কথা। কুঠীর কথা—কেনীর কথা, সর্দ্দার লাঠিয়ালের কথা, আমীন, তাগাদগিরের কথা,—জুলুম, বদিয়তের কথা সর্ব্বদা তোলা পাড়া হইতে লাগিল। কিন্তু আগে যেমন নামেই আতঙ্ক নামেই হৃৎকম্প, নামেই অজ্ঞান, তাহা যেন আর এখন নাই। সকলে এক জোট, এক পরামর্শ থাকিলে একা কেনী কি করিবে? নীলকর আমাদের রাজা নহে। তাহারাও প্রজা, আমরাও প্রজা,—রাজার চক্ষে সকলেই সমান তখন আর ভয় কি? এই কথা কয়েকটী প্রজার অন্তরের অন্তঃস্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করাতেই ভাবের ভিন্ন, সাহসের সঞ্চার, সুদিনের লক্ষণ—তাহাতেই পথিক বলিতেছে প্রজার নবজীবন লাভ। অথবা চিরবন্দীর—হঠাৎ মুক্তি লাভ।

কএক দিন এইরূপ মনের আনন্দেই কাটিয়া গেল। গ্রামের মাথাল মাথাল, পরামাণিক (প্রধান) দুই চারজন একত্র হইয়া মাঝে মাঝে অতি চুপে পরামর্শ করে। কি পরামর্শ তাহারাই জানে। একদিন শুনা গেল যে একজন কাড়াদার গ্রামে গ্রামে কাড়ামারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া যাইতেছে, "ভাই সকল, কাল বেলা দুই প্রহরের সময় সা গোলাম সাহেবের বাটীতে এই অঞ্চলের সমুদয় প্রজার এক বৈঠক হইবে। এইদেশ হইতে যাতে নীল একেবারে উঠিয়া যায় সেই জন্য বৈঠক হইবে। সকলেই বৈঠকে যাইও। দেশের ভালর জন্যই বৈঠক, সকলেরই যাওয়া দরকার।"

দশজনে একত্র হইয়া কার্য করিলে যে লাভ আছে, তাহা প্রজাগণ তখন বেশ বুঝিয়াছিল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, ছেলেয়-বুড়য়, হিন্দু মুসলমানে একত্রে সা গোলামের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। দেশহিতকর বৈঠকে যোগ দিল। চার দিক হইতে প্রজাগণ আসিতে আরম্ভ করিল। উপরে আঙ্গিনা জোড়া সামিয়ানা নিচে সতরন্‌জীর বিছানা। অতি অল্প সময় মধ্যে বৈঠক প্রাঙ্গণ পুরিয়া আঙ্গিনার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে সামিয়ানার বাহিরে উলঙ্গ শীরে মনের আনন্দে দাঁড়াইয়া গেল। বর্ষাকালের সেই উত্তপ্ত সূর্য্যতাপ, ভ্রূক্ষেপ নাই, অনায়াসে সহিয়া বৈঠকে যোগ দিল। এবং মনঃসংযোগে কথা সকল শুনিতে লাগিল।

বৈঠকের প্রধান কর্ত্তা দুইটী জমিদার। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। বলা বাহুল্য মুসলমানটী সা গোলাম। হিন্দু জমিদারটীর এই মাত্র পরিচয় যে তিনি দেশের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ নিকটে মহামাননীয়। সকলেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে, সকলেই তাঁহার কথা শুনে।

সেই সর্ব্বজন পূজীত মহামহিম মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুস্বরে অতিমিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন—

সভাস্থ হিন্দু মুসলমান মহোদয়গণ! নীলকরের অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির হইয়াছি। জমীদার, তালুকদার, মহাজন, জোতদার, কৃষক, মধ্যশ্রেণী, ধর্ম্মযাজক, গুরুদেব, গোঁসাই, পীর, ফকির, এমন কি মুটেমজুর পর্যন্ত কেনীর অত্যাচারে অস্থির। তাহা কাহারও

অবিদিত নাই। এই উপস্থিত বৈঠকে অনুমান পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত আছেন। বোধ হয় এই পাঁচ হাজার লোকের মনেই কেনীর অত্যাচার কাহিনী সর্ব্বদা জাগ্রতভাবে, জ্বলন্ত আকারে গাঁথা রহিয়াছে। সে সকল কথা, সে সকল অত্যাচারের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেনা ভুগিতেছে, কেনা জ্বলিতেছে, কেনা কেনীর অত্যাচার আগুনে পুড়িতেছে। এতদিন আমরা জানিতে পারি নাই। আমাদের মূর্খতাহেতু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের প্রতিপালক এবং সর্ব্বরক্ষক রাজা নীলকর নহে। নীলকর আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা নহে। ভ্রমেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ভ্রমেই আমাদের এতো কষ্ট উপভোগ করাইয়াছে। পাবনার দরবারে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের রাজার দয়ার পার নাই। গুণের সীমা নাই। নীলকরই হউন, আর বিলাতবাসী অন্য কেহই হউন, অত্যাচারী হইলে, আমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার অবিচার করিলে রাজ হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই। রাজ বিচার হইতে কিছুতেই অত্যাচারীর অব্যাহতি নাই। রাজ চক্ষে তাহারা এবং আমরা উভয়ই সমান। এই কথার প্রমাণও ঐ দরবারেই পাওয়া গিয়াছে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? কেনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? সে কি সহজে ছাড়িবে? সে নর ব্যাঘ্র এতদিন যে রসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়াছে, উদর পরিপোষণ করিয়াছে, তাহার স্বাদ কি সে হঠাৎ ভুলিয়া যাইবে, না—ভুলিতে পারিবে? তাহার অনায়াস লাভের আশা হইতে সে কি সহজেই হস্ত সঙ্কোচিত করিবে? না মন ফিরাইবে কখনই নহে। অতি কম হইলেও বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের পথ সে কি লড়িয়া ভিড়িয়া না দেখিয়া অমনি বন্ধ করিবে? কখনই নহে। পূর্ব্ব হইতে আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক, পূর্ব্ব হইতেই রক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ভাই সকল! মনযোগ করিয়া শুনিতে থাক! লাট সাহেব বাহাদুর আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের করা কর্ত্তব্য ও সকলেরই তাহা শিরোধার্য! কেনী জবরাণ করিয়া নীল না বুনী করিতে পারিবে না—রাজার আজ্ঞা, কিন্তু ভাবি অত্যাচার নিবারণের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় রাজ আজ্ঞায় নাই। ঘটনা হইলে, প্রমাণ গ্রহণ—পরে বিচার। আমরা নীল বুনিতে কি নীল জমীর চাষ করিতে, অথবা নীলকরের সঙ্গে কোন রূপ সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিব না। সেও ছাড়িবে না। কেনী যথাসাধ্য বল প্রকাশে আমাদিগকে নির্য্যাতন করিয়া তাহার জেদ বজায় রাখিতে, প্রচলিত প্রথা রক্ষা করিতে, নীলের আয় হইতে বঞ্চিত না হইতে, তাহার গোচর্ম্ম নির্ম্মিত শ্যামচাঁদ সকলের মাথার উপর ঘুরাইতে বিশেষ চেষ্টা করিবে—প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। জোর জবরদস্তি, মার ধর, লুট্ পাট্ এখন যাহা আছে, তাহার চেয়ে দশগুণ বেশী করিবে। মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া, মিথ্যা প্রমাণ জোটাইয়া ফাটকে আটক করিবার জন্যও বিশেষ যত্ন করিবে। যাতে হয়, যে উপায়ে আমরা তাহার পদানত হই, তাহা করিতে আর এদিক ওদিক তাকাইবে না। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায় এসকল প্রতি লক্ষ্য থাকিবার ত কথাই নাই। আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিব না। তবে এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? পশুরাও নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ—রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা নিজেকে নিজে রক্ষা করা দূরের

কথা, একদল, একজাতী, একগ্রাম, একদেশ, একত্র হইলেও রক্ষা করিতে পারে কি না সন্দেহ। নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে, তখন রাজার আশ্রয় লইব, দেশের হাকিমের নিকট জানাইব,—রক্ষা কর বলিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব।

নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কেনীর দুর্দ্দান্ত প্রবল প্রতাপ এবং বিষম আক্রমণ হইতে নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কিন্তু সকলে একজোট একমন একমত হইয়া থাকিলে বোধ হয় কোন কোন বিষয় রক্ষা করিতে পারিব। যাহা না পারিব, পারিলাম না দেখিলাম—নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলাম না, শেষ পক্ষে সর্ব্বরক্ষক হর্ত্তাকর্ত্তা বিচারকর্ত্তা, রাজপ্রতিনিধি, রাজসংশ্রবী যাহাকে যেখানে পাইব, রক্ষা হেতু সবিনয়ে প্রার্থনা করিব।

আমি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি—২০/২৫ জন কুঠীর সর্দ্দার লাঠিয়াল গ্রামের কোন প্রজাকে ধরিয়া লইতে আসিল। সে ২০/২৫ জন সর্দ্দারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একা একজনের সাধ্য নহে। আত্মীয়স্বজন, ভাই বেরাদর কতই আছে যে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া সে দুরন্ত ডাকাতদিগের হস্ত হইতে বাড়ীর কর্ত্তাকে রক্ষা করে। পাড়া প্রতিবাসী, আবশ্যক বোধ করিলে—গ্রামের লোক চেষ্টা করিলে, কথার কথা—রামনাথ মণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু রামনাথ একা কিছুই করিতে পারে না। খুব বিবেচনা কর, দেখ নীলকর কসাইয়ের হস্ত হইতে বাঙলার গরুগুলা রক্ষা করিতে হইলে একা একজনে কিছুতেই আটিয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতেই বলিতেছি আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে অক্ষম। কাজেই সকলকে, সকলের আপদবিপদে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। একজনের প্রতি নীলবানরে লঙ্কা পোড়াইবার উপক্রম করিলে—আর কিছু নয় শুধু থুথু দিয়া সে আগুন নিবাইয়া দেওয়া সকলের উচিত। যে বিপদই কেন হউক না, একের মাথায় ষোল আনা ভর পড়িলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না। মাজা দমিয়া যাইবে, হয়ত একেবারে সারা হইতে পারে। আর সেই বিপদভার আমরা সকলে যদি তিল তিল করিয়া বাঁটীয়া লই তাহা হইলে কি হয়? ভাই সকল! বল দেখি তাহাতে কি আমরা মারা পড়ি? আমাদের কিছুই হয় না। বিপদ বলিয়া একটি কথা ঘুণাক্ষরেও মনে ধারণা হয় না। শত্রুর মুখেও ছাই পড়ে। কারণ যত বিপদ চাপাইবে ঈশ্বর ইচ্ছায় তিল তিল হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে, কোন পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়া কোথায় সংযোগ হইবে, তাহার সন্ধানই থাকিবে না। পরাস্তই বল ক্ষয়। এইরূপ ক্রমে বল ক্ষয় হইলে কেনী কয়দিন নীল কার্য্য চালাইবে, কয়দিন সালঘর মধুয়ায় বসিয়া রাজত্ব করিতে পারিবে? লজ্জায়, অপমানে, দায়ে শেষ আমাদের সহিত আপস মীমাংসা করিয়া যাহাতে উভয় কুল রক্ষা পায় তাহার কোন উপায় অবশ্যই করিবে, আমরাও তাহাতে সম্মত হইব। আমি এক্ষণে আমার মনের কথা বলিতেছি যে, ঐ উচ্চ বেদীর উপরে পৃথক পৃথক স্থানে তামা, তুলসী, এবং কোরাণ রাখা হইয়াছে, যাহাতে যাঁহার ভক্তি তিনি আপন আপন বিশ্বাস ও ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অকপটচিত্তে একথা বলুন যে, আমরা আপদে বিপদে সকলকে সকলে সাহায্য করিব। একের বিপদ অন্যে আপন বিপদ জ্ঞান করিয়া মাথায় করিয়া লইব।

নিজ বিপদ জ্ঞানে যথাসাধ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব। অপারগ হইলে সকলে একত্রে রাজদ্বারে প্রার্থনা করিব।"

মুহূর্ত্ত পরে বৈঠকের প্রায় বার আনা কণ্ঠ হইতে "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি উত্থিত হইয়া বায়ু বিমান ও সামান্য আবরণ চন্দ্রতাপ ভেদ করিয়া অনন্তক্ষেত্রে অনন্ত নামের সহিত মিশাইয়া গেল। মিশাইতে মিশাইতে অবশিষ্ট কণ্ঠ হইতে "আল্লাহ আল্লাহ" রবে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। সে রবের প্রতিধ্বনি সহস্র চপলায় চালিত হইতে হইতে স্থির বায়ু ভেদ করিয়া—ঈশ্বরের আসন স্থান "তাহ্তাস্ সারা" চিন্তার অগম্য স্থান পর্যন্ত প্রবেশ করিল। ঈশ্বরে সাক্ষী করিয়া, পবিত্র জিনিষ সম্মুখে রাখিয়া মনের বেগে অনেকেই স্পষ্ট করিয়া প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইল। সকলের মনেই নতুন ভাব, এ যে কি ভাব তাহা সেই অনন্ত ভাবময় ভূতভাবন ভিন্ন মহাভাবুক, ও ভবভাবনা সংযুক্ত সহস্র সহস্র মহানুভবেরও বুঝিবার সাধ্য হইল না। সকলে পরস্পর বুকে বুক মিশাইয়া আলিঙ্গন আরম্ভ করিল। সে পবিত্র ভাবময় আলিঙ্গন, ভাবের মনমত তুলি ধরিয়া যথা যথা আঁকিয়া দেখাইতে পথিক অক্ষম। তবে সে সময়ের হাবভাবে যে ভাবটুকু সামান্য ভাবে অনুভব হইয়াছে, আকারে, ইঙ্গিতে, আভাষে, আলিঙ্গনের ভাবাভাবে বোঝা গেল যে সকলেই সকলকে কি যেন দিল। সকলেই যেন তাহা মনের আনন্দে গ্রহণ করিল। অথচ কাহারও কোন বিষয়ে অভাব হইল না। দাতা গৃহীতায় সমান আনন্দ, সমান ভাব, সমান প্রণয়। প্রতিদানের যথার্থ প্রমাণই মন খুলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন। বুকে বুক মিশাইয়া পরস্পরের মিলন। সে অপূর্ব্ব পবিত্র ভাব চন্দ্রাতপতলে কতক্ষণ বিরাজ করিয়া সূর্য্যতাপে তাপিত, দগ্ধিভূত হৃদয় শীতল করিতে চন্দ্রাতপ বাহিরে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে সা গোলাম ধীর এবং গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রতি গ্রামেই এই বৈঠকের একটি শাখা বৈঠক হউক। শাখা বৈঠকে গ্রামের হিত অহিত, ভাল মন্দ বিষয় প্রতি সন্ধ্যায় আলোচিত হউক। কোন কথার মীমাংসা আবশ্যক হইলে সেই স্থানেই উপস্থিত বৈঠকে মীমাংসা হউক। এক বৈঠকে না মিটে পরদিন বৈঠকে আবার সে বিষয়ে আলোচনা হউক। তাহাতে যদি মীমাংসা না নয়, সন্দেহ থাকে, আমাদের সাপ্তাহিক বৈঠকের সময় গ্রামে গ্রামে বৈঠকের প্রধানের মধ্যে যিনি আসিয়া যোগ দেবেন, শাখা বৈঠকে মীমাংসা না হওয়া প্রস্তাব সদর বৈঠকে তিনিই মীমাংসা জন্য প্রস্তাব করিবেন। সকলের বিবেচনায় যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই বলবত থাকিবে।

কেনীর টাকা কমি নাই। দশ বৎসর প্রজার সহিত লড়িলেও সে পিছু পাও হইবে না। টাকার অভাবে বিবাদে খান্ত হইবে না। নীলের কারবার সহজে ছাড়িয়া দিবে না। আমাদের দশজনের কাজ—সে দশ জনও দশ জায়গায়। সময় অসময় টাকার দরকার হইবে। উপস্থিত সময়ে দশ জনকে এক করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে করিতে তদবির বিলম্ব হেতু কার্য্যে বহু বিঘ্ন যে না হইতে পারে এমন কথা নহে। টাকার অনটনে ভাল কার্য্য না হয়, তাহাও নহে। বাঘের সঙ্গে ছাগলের বিবাদ। নানা প্রকার বলের আবশ্যক। রক্ষা পাওয়াই কঠিন! তাহাতে টাকা অভাবে মারা গেলে বড়ই বিষম কথা। তাহাতেই আমি বলি—গ্রামে গ্রামে যে শাখা

বৈঠক হইবে, সেই বৈঠকের প্রতি টাকা সংগ্রহ করার ভার দেওয়া আবশ্যক। সপ্তাহ অন্তে তহবিলের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা সদর বৈঠকের তহবিলে দাখিল করিতে হইবে। থানায়, মহকুমায়, জিলায় আমাদের পক্ষের ভাল ভাল লোক, বিশেষ জিলায় মহকুমায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান উকীল মোক্তার রাখিতে হইবে। কেনী সহজে কখনই ছাড়িবে না। নানা প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাল জালিয়ত মকদ্দমা সাজাইয়া আমাদিগকে ফাটকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। ভাল লোক না রাখিলে, ভাল বুদ্ধি, ভাল পরামর্শ, ভাল উপদেশ না পাইলে রক্ষা পাওয়া ভার হইবে।

আপন আপন গ্রামে আপন আপন বাড়ী, আপন আপন পরিবার রক্ষা করিতে সর্ব্বদা সকলে প্রস্তুত থাকিবে। কোন্ সময়, কোন্ পথে, কোন্ সুযোগে কেনী কাহার কপালে কি ঘটায়, তাহা কে বলিতে পারে?

আমাদের দেশের লোক যাহারা কেনীর পক্ষে থাকিবে, কেনীর সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে আমাদের দলভুক্ত করিতে অনুনয় বিনয় যাহাতে হয় তাহা করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে শাখা বৈঠকের অধীন এক একটি ডঙ্কা থাকিবে। সকলের মত হইলে ভিন্ন গ্রামের লোক ডাকিতে হইলে ডঙ্কাধ্বনি করিতে হইবে। যিনি যে অবস্থায় থাকিবেন, তাহাকে সেই অবস্থায় ডঙ্কাধ্বনি স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে।

যে উপায়ে হউক, শত্রুকে জব্দ করাই আমার মত। যাহাতে শত্রুর ক্ষতি হয় সে পথ অগ্রে অন্বেষণ করাই আমার ইচ্ছা। তাহাতেই বলিতেছি, কেনীর নিজ আবাদে কি প্রজার আবাদে যে গ্রামে যত নীল আছে, তাহা সমুদায় কাটিয়া পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিন নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া যাউক। আমরা বুনিয়াছি, আমরাই কাটিব, আমরাই জলে ভাসাইব। এত দিন আমরা চক্ষের জলে ভাসিয়াছি। কেনীর চক্ষের জল পড়িবে কি না জানি না। পাকানীল জলে ভাসাইয়া অতি অল্প সময়ের জন্য আমরা গাত্রের জ্বালাটুকু একটু ঠাণ্ডা করি।

প্রায় দশ হাজার মুখে উচ্চারিত হইল, ভাল কথা বেশ বলিয়াছেন, গায়ের জ্বালা একটু ঠাণ্ডা করি।

প্রজাগণ তখনি উঠিল। ছাতী, লাঠি, গামছা লইয়া একে বলিতে দশ জনে খাড়া হইল। দলে দলে সভাস্থল হইতে বাহির হইতে লাগিল—সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ

বিপরীত যুদ্ধ

মরণকালে বিপরীত যুদ্ধ। কেনীর সুখসূর্য্য অবসান হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তার সৌভাগ্যশশীর চতুর্দ্দশীর ভোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিপদে, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের ভোগ

উপস্থিত হইয়াছে। বিপরীত বুদ্ধিতে বিপরীত বুঝিয়া মহাবিপদে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সায়ংকাল। কুঠীর সম্মুখস্থ কালীগঙ্গা তীরস্থ ফুলবাগান মধ্যে কেনী, গঙ্গা সম্মুখে করিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। হরনাথ, শম্ভু এবং অন্য অন্য প্রধান আমলা, নীল কুঠীর প্রধান প্রধান দেওয়ান, প্রধান প্রধান আমীন, প্রধান প্রধান খালাসী, তাগাদগীর সকলেই উপস্থিত। এখন কি হইবে? কি উপায়ে নীলকার্য্য চলিবে, কুঠী চলিবে,—কি সুধু জমীদারিই চলিবে, তাহারই মন্ত্রণা। পাবনার ঘটনা, জোট, তাহার পর সাঁওতার বৈঠক। সকল সময়েই তাঁহারা সাবধান সতর্কে থাকিয়া সন্ধান লইয়াছেন। বিশেষ করিয়া বোধহয় কিছু বাড়াইয়াই মনিব সাহেবের নিকট দেশের অবস্থা, প্রজার ভাব জানাইয়াছেন। পাবনা গমনে প্রজাদিগকে বাধা দিতে গিয়া যাহা ঘটিয়াছিল, কার্য্যকারকগণ তাহার অনেকাংশ গোপন করিলেও কেনীর কানে সম্পূর্ণ যাইতে বাকি ছিল না। গুপ্ত সন্ধানীরা সমুদায় কথা গোপনে কেনীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

কেনী বলিতে লাগিলেন—প্রজা ইচ্ছা করিয়া নীল বুনানী না করিলে জবরাণে বুনাইতে পারিবে না। এ কথায় আর নূতন কি আছে। কোন্ নীলকর প্রজার দ্বারা নীল বুনানী করে। দাদন লইয়া, চুক্তিপত্র দিয়া প্রজা নীল বুনিতে বাধ্য, নীলকরও আপন মাল বুঝিয়া লইতে বাধ্য। এই কথা লইয়া প্রথমতঃ কিছু গোলযোগ হইবে বুঝিতেছি। বিচার আদালতে যখন আমরা প্রজাদত্ত চুক্তিপত্র দাখিল করিব, তখন আর ওকথা থাকিবে না। তোমরা আগেই সাবধান হইবে। যখন সে চুক্তিপরের দরকার হয়, তাহা যেন পাওয়া যায়। তবে প্রজারা যে জোটবদ্ধ হইয়াছে আমি বাঙ্গালা দেশে অনেক দিন কাটাইলাম। বাঙ্গালার খবর জানিতে আমার বাকি নাই। তোমাদের কথা তোমাদের প্রতিজ্ঞা, তোমাদের দশ জনের এক হওয়া আমি সকলি জানি। আপন দেশের প্রতি তোমাদের যত মায়া, তাহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সকলে এক পরামর্শ, এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করার ক্ষমতা তোমাদের যত আছে তাহা কেনীর জানিতে বাকি নাই। দিন দুই হৈ হৈ। তাহার পর যে সেই। হয়ত দুহাত নীচেই নামিতে হইবে। ও সকল জোট ও সকল বৈঠক অনেক দেখিয়াছি—আমার কিছুই হইবে না। তাহাদের কিছু না হইলেও মাঝখানে কতকগুলি লোকের এই সুযোগে বেশ দশ টাকা লাভ হইবে। তোমরা দেখ ঐ সকল টাকাকড়ি লইয়াই উহাদের আপসে আপসে ঝগড়া, মারামারি নিশ্চয়ই হইবে। শেষ ফল আদালত পর্যন্ত গড়াইবে। গায়ে পড়িয়া এক দল আমার আশ্রয় লইবে। দাদনের টাকা না লইয়া চুক্তিপত্র লিখিয়া দিবে।

আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমরা নিজেরা নিজকে যতদিন বিশ্বাস না করিবে ততদিন তোমরা কিছুই করিতে পারিবে না। তোমরা কার্য্যের শেষ চিন্তা করিতে অবসর পাও না। পরিণাম ফলের দিকে দৃষ্টি করিতে নিতান্তই নারাজ। সকল কাজেই ব্যস্ততা, হৃদয়েও বল বেশি নাই। নিজের ঘর সামাল না করিয়া পরের ঘরে আগুন দিতে খুব পটু। ধরিতে গেলে কোন শক্তিই তোমাদের নাই। কিন্তু লম্ফে ঝম্ফে খুব মজবুত। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া নীল উঠাইয়া দেয়, আমাঁর দুঃখ নাই। এদেশে ইংরেজদিগেরই যে নীল

কুঠী আছে, দেশীয় লোকের নাই ইহাও নহে! আমার নীল যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে রতন বাবুর কুঠীও মারা যাইবে। ঠাকুর বাবুর কুঠীই কি থাকিবে? মীর মহাম্মদ আলীর কুঠীই কি চলিবে? এই প্রকার যত বাঙ্গালী জমিদারের কুঠী, যেখানে যাহা আছে তাহাও থাকিবে না। আমার জমিদারী কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ও সকল কথা কিছুই নহে। তোমরা সাবেক বদস্তর কার্য্য চালাইতে থাক! এবারে যে পরিমাণ নীলের এষ্টিমিট পাইয়াছি তাহাতে গত সন অপেক্ষা তিনগুণ পরিমাণ বেশী নীল এই কুঠীতেই পাওয়া যাইবে। অন্য অন্য কুঠীর খবর এপর্য্যন্ত পাই নাই। এবারে বেশী পরিমাণ জমীতে নীল বুনানী করা আমার ইচ্ছা।

কোন আমলা কেনীর কথার প্রতিবাদে কোন কথা কহিতে সাহসী হইল না।

হরনাথ মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল হুজুর! প্রজায় যদি আমাদের নীল জমী আবাদ না করে তাহা হইলে নীজ আবাদে কুঠীর নিদৃষ্ট জমী আবাদ করাই কঠিন হইয়া উঠিবে।

কেনী রক্ত আঁখি তিনবার হরনাথের দিকে ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন—কোন্ প্রজায় নীল বুনিবে না? নীল না বুনিয়া আমার এলাকায় বাস করিবে? একটু সামলাইয়া কেনী মনে মনে কি ভাবিয়া হঠাৎ রাগ—একটু সামলাইয়া বলিলেন—

"আচ্ছা—প্রজারা আমার নীল বুনিবে না, আমিও তাহাদের সাহায্য লইব না। অথচ নীলের আবাদ বেশী করিয়া করিব। আমার দেশ, তোমার দেশের মত নয়। এক প্রকার মূর্খের দেশ নয়। বিনা গরুতে আমার দেশে জমী আবাদ হয়। তুমি দেখ আমি বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিয়া জমি আবাদ করিব। আর কি চাও।"

হরনাথ মৃদু মৃদু হাসিয়া নতশিরে বলিলেন "হজুর! তাহা হইলে আর আমাদের চিন্তা কি।"

কেনী চেয়ার হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন চিন্তার মধ্যে একটি কথাই বেশী চিন্তার—আমি দেখিতেছি সেইটিই শক্ত কথা—কুঠীর নিকট মহকুমা হওয়া না হওয়ার পক্ষে যতদূর পারি চেষ্টা করিব। পারিব এমন ভরসা নাই। এই বলিয়া ক্রমে নদী তীরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আমলাগণও মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃদুমন্দ গতিতে কালীগঙ্গার দিকে চলিলেন। জলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে সকলের চক্ষেই পড়িল যে বোঝা বোঝা নীল—গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কেনী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—নিরব! স্থির দৃষ্টিতে চক্ষু জল স্রোতে,—আমলাগণ মহাব্যস্ত। ব্যস্ততার সহিত কথা, কি সর্ব্বনাশ! একি কাণ্ড! এত নীল কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল? কে ভাসাইল? এক, দুই, তিন, চার, করিয়া গণনা করিয়া শেষে আর গণনায় কুলাইল না। নদীর জল ঢাকিয়া খণ্ড খণ্ড নীল ক্ষেত সকল যেন জলে ভাসিয়া আসিতেছে। কে জানে কতক্ষণ হইতে ভাসিয়া যাইতেছে? কে জানে গৌরী জলে ভাসিতেছে কি না? পদ্মার খরতর স্রোতে পদ্মার প্রশস্ত চরের অপর্য্যাপ্ত নীল, পর্ব্বতাকারে ভাসিয়া যাইতেছে কি না তাহা কে জানে? কুঠীময় সোর পড়িয়া গেল যে, নীল ভাসিয়া যাইতেছে। কতলোক বড় বড় বাঁশ, বড় বড় লগী হাতে করিয়া বিনা উদ্দেশ্যে

নদীর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশ ফেলিল, লগী জলে ভাসাইল, ভাসমান নীল বোঝা আটকাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিল, একটিও আটকাইতে পারিল না। কেন আটকায়? দুই এক বোঝা আটকাইলে কি হইবে? আর সমুদায় আটকাইয়া কি বা হইবে? ইহাতে কোন রূপ সার অংশ নাই, সমুদায় জলে ধুইয়া গিয়াছে। বিশেষ এত নীল এক দিনে জাঁত দিয়া মাল বাহির করিবার সাধ্যও কাহার নাই। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানি নৌকা দেখা দিল। স্রোতগতিতে নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে। ডিহীর আমীন, তাগাদগীর, সাহেবের চাকরগণ চিৎকার করিয়া বলিতেছে—হুজুর! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিন নদী হইয়া এই প্রকার নীল ভাসিয়া যাইতেছে। প্রজাগণ রাতারাতী নীল কাটিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। যাহা বাকি আছে, তাহাও আজ রাত্রে আর রাখিবে না আমাদিগকে সাসাইয়া, ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে যে, "কুঠীতে খবর দিতে যাইতেছ ফিরিয়া আসিয়া আর বাড়ী, ঘর, দোর পরিবারের মুখ দেখিতে হইবে না। যাও জন্মের মত নীলের পাছে পাছে ভাসিয়া যাও।"

কেনী স্বচক্ষে নীলের এই দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। দশ বছর নীল না হইলে কি কেনী মারা যাইবে আর এই সকল নীল, যাহারা কাটিয়া গাঙ্গে ভাসাইয়াছে তাহারা কি অমনি বাঁচিয়া যাইবে? এখনই রওয়ানা হও। এক এক দলে ৫০/৬০ জন লাঠিয়াল সর্দ্দার লইয়া রওয়ানা হও। যে গ্রামে নীল আছে সে গ্রামের লোককে কিছু বলিও না। যে গ্রামে দেখিবে নীল নাই, সে গ্রাম আর রাখিবে না। বাড়ী, ঘরদোর, গাছ, পালা ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া ঐ প্রকার জলে ভাসাইবে। আমি কাল এই সময় ঐ সকল প্রজার ভাঙ্গা ঘর, কাটা গাছ, গরু বাছুর, এই জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিতে চাই। যত টাকা লাগে ব্যয় কর। লাঠিয়াল, সর্দ্দার যে যত সংগ্রহ করিতে পার সংগ্রহ করিয়া আন। আর যাহারা এই সকল কার্য্যের গোড়া—তাহাদিগকে ধর, তাহাদিগের বাড়ী ঘর আগুনে পোড়াও। আর ছেলে মেয়ে বুড় বুড়ী যাকে পাও ধরিয়া আমার গারদে পোর। পাবনায় মোক্তার নিকট চিঠি লিখিয়া দেও যে, ডিহীর আমীন তাগাদগীর যাহার দ্বারা সুবিধা হয়, ফৌজদারিতে নীল খুনী বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া দেয়। আসামী করিতে কাহাকেও বাকি রাখিবে না। এদিকে তোমাদের কার্য্য তোমরা করিতে থাক। আর যত সত্বরে হয় নীল কাজ আরম্ভ করিয়া দেও। প্রতি কুঠীতে ডবল—তিন ডবল কুলি, চাকর রাখিয়া নীল কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও। খুব সাহসে, খুব বল বিক্রমে—নির্ভয়ে কার্য্য করিতে থাক। মীর সাহেবকে আনিবার জন্য এখনই লোক পাঠাও। চা'র জন দেশওয়ালী যেন সঙ্গে যায়।"

কেনীর হুকুমে আমলাগণ মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন। দুইহাতে টাকা লুটিবেন, লাঠিয়াল সর্দ্দারের বেতনে, অন্যপ্রকার খোঁসর্খুসি, ঘুসঘাসে খুব এক হাত মারিবেন, সকলের মনেই এই আশা। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। কেনী কিছুক্ষণ নদী তীরে ফিরিয়া ঘুরিয়া হাওয়া খাইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রে নিদ্রাদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন কি না,—তিনিই জানেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ

ঘরের কথা

মীর সাহেব পুনরায় সংসারী হইয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। শ্বশুরের অতুল ঐশ্বর্য্যে মহা সুখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমেই বয়স বেশী হইতেছে, পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, দেহ কান্তি, গঠন, শরীরের অবস্থা দিন দিন পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু আমোদ আহ্লাদ সর্ব্বদা হাসি খুসী, রং তামাসা, গান বাজনা ইত্যাদি যেমন তেমনি রহিয়াছে। মনে কি আছে ঈশ্বর জানেন। প্রকাশ্য ভাব, মনের ভাব যেমন পূর্ব্বে ছিল, হাব ভাব বোধ হয় যেন ঠিক সেইরূপই আছে, সাধারণ চক্ষে, দশ বছর পূর্ব্বেও যাহা, এখনও তাহা। পূর্ব্বে স্ত্রী পুত্র বিয়োগের পরে যে ভাব, জামাই কর্ত্তৃক পৈত্রিক সম্পত্তি, দালান, কোঠা, জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াও সেই ভাব, বর্ত্তমান সুখ সময়েও সেই একই ভাব। মীর সাহেবের মনের ভাব সুখে দুঃখে সকল সময়েই সমান। অতি দুঃখের সময় তাঁহার মুখে হাসীর আভা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সাধারণ লোক সে কথা লইয়াও কত সময় কত আন্দোলন করিয়াছে। মীর সাহেব কি ধাতুর লোক সহজে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কারণ সুখে দুঃখে সমান ভাব। অন্তরের অন্তঃস্থানের ভাব অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন অন্যের জানিবার সাধ্য ছিল না। বসিরদ্দীন সাঁওতা ছাড়িয়া মীর সাহেবের শ্বশুর বাড়ীর অতি নিকটেই সপরিবারে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বমত মীর সাহেবের অনুগ্রহ দৃষ্টিতেই চির আমোদের সহিত সংসারযাত্রা নিশ্চিন্তভাবে নির্ব্বাহ করিতেছেন। খানসামা বিনদ বিদ্রোহী দলে সেই যে মিশিয়াছে, এখনও মিশিয়াই আছে। কিন্তু পূর্ব্বমত আদর, ভালবাসা আর নাই। সা গোলাম এক্ষণ স্বয়ং মালিক।

মীর সাহেবও স্বয়ং মালিক। মুন্সী জিনাতুল্লার মৃত্যুর পর সমুদায় সম্পত্তি দৌলতন্‌নেসা ও তাঁহার মাতায় বর্ত্তিয়াছে বটে, কিন্তু মীর সাহেবই মালিক। মীর সাহেবের হস্তেই সম্পত্তি। নাম মাত্র তাঁহাদের।

সা গোলাম এবং মীর সাহেব উভয়ে নিকটেই বাস করেন। সাঁওতা লাহিনীপাড়া এপাড়া ওপাড়া। কিন্তু পরস্পর দেখাশুনা হয় না। দৈবাধীন দেখা হইলেও কথাবার্তা হয় না। উভয়ের চাকরে চাকরে, প্রজায় প্রজায়, অনুগত লোকজনের সহিত অনুগত লোকের প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ, বচশা হইয়া তাকে। কখনও লঘু কখনও গুরুতর গোছের হইয়া দাঁড়ায়। আদালত পর্য্যন্ত খবর হয়। উভয় পক্ষের লোকের, জরিমানা ফাটক হইতেছে, যাইতেছে, মিটিতেছে, আবার বাধিতেছে। কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তি মীর সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে থাকিলে তদ্বিপরীত পক্ষ বাধ্য হইয়া সা গোলামের আশ্রয়

লইতেছে। সা গোলামও যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এখন মীর সাহেব কেনীর পক্ষে। দেশের লোকের বিপক্ষে।

মনের কথার মধ্যে ঘরের কথা। প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয় এ কথা এতদিন চাপা ছিল। আবশ্যক না হইলে, ঘরের কথা পরের কানে দেওয়ার ইচ্ছা পথিকের ছিল না। এখন বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইল। ঘটনা স্রোতে বাধা দিতে কাহারও সাধ্য নাই। মানবীয় কার্য্যের আদি অন্ত মধ্যে মানুষেরই প্রয়োজন। কিন্তু সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার মূলীভূত কারণ কে? তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সকলেই বুদ্ধিমান, সকলেই জ্ঞানবান। জ্ঞানবুদ্ধি পরাস্ত করিয়া ঘটনা স্রোতঃ অবলীলাক্রমে কত জীবন ডুবাইয়া কত জীবন ভাসাইয়া কোথা হইতে কোথায় লইয়া যাইতেছে। কোন্ বিষাদ সমুদ্রে ফেলিতেছে তাহা ভাবিতেও আশঙ্কা হয়।

মীর সাহেব জ্ঞানবান। পরিষদগণও অজ্ঞান নহেন। মাতার মজ্জা, শরীরের রক্ত, কাহারও তরল নহে। কেহই পাতলা লোক নহেন। নূতন সংসারী নহেন, নানা বিষয়ে পরিপক্ক। সকল বিষয়েই পাকা। এত পাকাপাকির মধ্যে এমন একটি কাঁচা কার্য্য হইতেছে যে, তাহার আভাষে ইঙ্গিতে, আকারে প্রকারে প্রকাশ করা ভিন্ন বিস্তারিত প্রকাশ করিতে পথিকের সাহস হইতেছে না। সেই বোমা কণ্ঠই ঘটনার মূল। সেই নূপুরধ্বনী সময়ে সময়ে যে দৌলতন্নেসার কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই ধ্বনীই ঘটনার মর্ম্মগত আন্তরিক ভাব ও আভাষ। দৌলতন্নেসা স্বামীসোহাগিনী। বিশেষ সন্তান সন্ততি হইয়া সে সোহাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধি হওয়ার কথা। স্ত্রী ধনে ধনবান, স্ত্রী কল্যাণে অপরিমিত সুখ ভোগ হইলে, সে স্ত্রীর আদর কোথায় না আছে? স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে বলিয়া স্ত্রীধনে অধিকার। রূপসীর সহ্য হইল না। রূপসীর চেষ্টা স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটাইয়া নিজে সুখী হয়। বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। মীর সাহেব রূপসীকে ভালবাসেন, যত্ন করেন, আদর করিয়া কাছে বসান, গান শুনেন। এ সকল কথা দৌলতন্নেসার কানে তুলিয়া দিয়াও তাহার মন, স্বামীপদ হইতে টলাইতে পারিল না। তখন অন্য চাল আরম্ভ করিল। অর্থ সহায়ে সাহায্যকারীও জুটিয়া গেল!

দৌলতন্নেসা রূপসীর কথা অনেকের মুখেই শুনিতেন। তাঁহার সেই পূর্ব্বভাব, পূর্ব্ব কথা। রূপসীর মনে এই কথা যে, মীর সাহেব দৌলতন্নেসায় যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় ভাব বর্তমান তাহা ভঙ্গ করা। সাধ্য কি—রূপসীর সাধ্য কি—সে দাম্পত্য প্রণয় বন্ধন শিথিল করে। সে পবিত্র প্রণয়ভাবের পরমাণু পরিমাণ অংশ বিনষ্ট করাও রূপসীর সাধ্য নহে। তবে একমাত্র উপায় দৌলতন্নেসাকে কোন কৌশলে জগৎ সংসার হইতে সরাইতে পারিলে আশাবৃক্ষে সুফল ফলিবার কথঞ্চিত পরিমাণ আশা জন্মে। তাহা না পারিলে আর আশা নাই। এতদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে প্রণয় বন্ধন সমূলে বিচ্ছিন্ন করা দূরে থাকুক, সামান্যভাবে বিচ্ছিন্ন করিতেও সাধ্য হয় নাই, তখন ঐ সোজা পথই রূপসীর মনোরথ সিদ্ধির সহজ উপায়। এই সিদ্ধান্তই মনে মনে আঁটিয়া আসরে

নামিয়াছেন। সাহায্য জুটিয়াছে। অর্থের অসাধ্য কি আছে, অনুগত এবং ভালবাসার লোকই যে গোপনে গোপনে এই সাংঘাতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা মীর সাহেব স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন নাই। কোনদিন কোন কারণে ওকথা ভাবিবারও কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। দৌলতন্নেসারও জানিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত স্বামীর পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছেন। মীর সাহেব মনের সঙ্গে ভালবাসিয়া, মনে মনে মহাসৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছেন।

মানুষের ভাল, মানুষের উন্নতি, মানুষের প্রেম, মানুষের চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রণয়ভাব,—বিশুদ্ধ প্রেমভাব, পবিত্র লক্ষণ প্রায় লোকেরই চক্ষুশূল। রূপসীরই যে না হইবে আশ্চর্য্য কি? তাহাতে রূপসী শিক্ষিতা নহে, ধর্ম্মভাবে আকুলা নহে। মহাপাপে ভীতা নহে—ইহকালই সার। ইহকালই সকল। পরকাল পরের কথা। মরিলেই ফুরাইল। হিসাব-নিকাশের ধার কে ধারে। কেহ বা অদেখা ঈশ্বরকে ভয় করে। এইত রূপসীর মত, ইহাতে আর আশা কি!

বসীরদ্দীন সহচরীর খুব অনুগত। চাকরের মধ্যেও দুই একটি সহচরীর আজ্ঞাবহ। অথচ তাহারা দৌলতন্নেসার বেতনভোগী, দৌলতন্নেসার অন্নে প্রতিপালিত। বসীরদ্দীনের অন্নের সংস্থানও দৌলতন্নেসার অর্থে—তবে মীর সাহেবের হস্তে হইতেছে, এই মাত্র প্রভেদ। দৌলতন্নেসার খাস দাসী, চারজন। তাহার এক জনের নাম দুর্গতী, দুর্গতীর মাতার নাম সব্জা। দুর্গতী, হুরণ, নুরণ, চাম্পা, এই চারজন সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তাঁহার সম্মুখে থাকিত। ফয়ফরমাস ইত্যাদি কার্য্য করিত। দৌলতন্নেসা ইহাদিগকে অন্য অন্য দাসী অপেক্ষা ভালবাসিতেন। বিশ্বাসও করিতেন। ইহারা চারজন বাড়ীর বাহির হইত না। সব্জা বৃদ্ধা, বাহিরে বাটির মধ্যে সকল সময় সর্ব্বস্থানে সমানভাবে যাওয়া আসা করিত। সব্জার সহিত রূপসীর খুব আলাপ। রূপসীর সহিত সব্জার অনেক সময় দেখা হয়, গোপনে গোপনে কথাবার্ত্তাও হইয়া থাকে। এই সব্জাই সহচরীর সাহায্যকারিণী! উপস্থিত এই কথা যে—

টি. আই. কেনী হস্তী পাঠাইয়া মীর সাহেবকে কুঠীতে লইয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ নীল কাটিয়া জলে ভাসাইয়াছেন। নীল আর বুনিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই সকল উপস্থিত ঘটনার সুপামর্শ জন্যই কেনী মীর সাহেবকে লইয়া গিয়াছেন। মীর সাহেব নীলকরের পক্ষ, সা গোলাম প্রজার পক্ষ।

মীর সাহেব শালঘর কুঠীতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিবার কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল আসিলেন না। বৈঠক খানায় নিয়মিতভাবে আলো জ্বলিল। বিছানা, বালিশ পরিষ্কার হইল—প্রতিদিন যে যে নিয়মে বৈঠকখানার কার্য্য চাকরেরা করে তাহা করিল। রূপসী ও বসীরদ্দীন নিয়মিত চাকুরী বাজাইতে বৈঠক খানায় আসিয়া জুটিল। মীর সাহেব অবশ্যই আসিবেন। যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ কি করা? গান বাজনা করিতে সাহস হইল না। উভয়ে তাস খেলা করিতে বসিলেন। খেলার মধ্যে পান তামাক, হাসি তামাসা, খোসগল্প

চলিতে লাগিল। খেলাটা হইতেছে—রঙ্গ মার—দুই জনে খেলা—সেকালে দুইজনে তাসের ঐ খেলাই সর্ব্বত্র চলিত। তিন জন হলে ঐ খেলাই তিন হাতে—চার জন জুটিলে বিবি ধরা। বেশী লোক হইলে পাঁচ ইয়ারে গোলাম চোর—কিন্তু বিবি ধরাটাই সে সময় জাঁকাল খেলা। রগড়েরও বটে—তিন জনে অভাব পক্ষে দুই জনে রঙ্গমার—বসীরদ্দীন হরতনের টেক্কা ফেলিয়া বলিলেন—"তোমার চিন্তা কি?"

রূপসী অতি নম্রভাবে হরতনের দুরী ফেলিয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—

"আমার চিন্তার কথা তুমি কি বুঝিবে, দুবেলা পেট্‌পূজাত এখানেই হয়। আবশ্যক হইলেই কিছু পাও। কাপড় চোপড়ের ভাবনাও বড় নাই। প্রায়ই ব্যারিংপোষ্টে কাটিয়া যায়। হাত বুলাইয়া যাহা বাহির কর, ঘরের গিন্নির জন্য যা কেনবার দরকার হয় তাই কেন, আর চাই কি? তোমার মত সুখী কে?"

বসীরদ্দীন পীঠ উঠাইয়া হরতনের সাহেব ফেলিয়াই বলিলেন—"আচ্ছা এস দেখি।"

রূপসীর হাতে হরতনের বিবি ব্যতীত আর হরতন ছিল না। বাধ্য হইয়া বিবিটী ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—

"দেখ দেখি ঘাড়টী ধরিয়া বিবিটী আদায় করিলে, হিসাব থাকিলে এই রূপই হয়। হিসাব মত যদি সাহেব রোখ করে দাঁড়ায়, তবে সাধ্য কি বিবি না পড়িয়া যায়। বেহিসাবী হইলেই বিবি অন্যের সহিত বাহির হইয়া যায়। তা গোলামেই কি, আর বদপাসের দুরী তিরীইবা কি? সকল কাজেই হিসাব আছে—হিসাবের মার বড় শক্ত মার"—

বসীরদ্দীন তাড়াতাড়ি পীঠ উঠাইয়া হরতনের গোলাম ফেলিয়া বলিলেন, "এবার কি দেবে দেও দেখি।"

রূপসী গোলাম প্রতি নজর করিয়াই বলিলেন—

"এ গোলাম এখন সাহেবের বাবা—রঙ্গে বঞ্চিৎ—করি কি! আর দিবই বা কি আছেই বা কি? সকলি তোমাদিগকে দিয়াছি। কিন্তু আমিই কিছু পাই নাই।"

"কি পাও নাই—সকলি ত পাইয়াছ আর চাই কি?"

আর চাই কি—"তোমার কি চক্ষু নাই? আমার হাত একেবারে খালি। হাতে কি কিছু আছে যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে। এবারে পারিব না। ফিরে বাঁটা যাক!"

তাস রাখিয়া দিলেন, হাতের কাগজ পীঠের কাগজ একত্র করিয়া মিশাইয়া দিলেন। খেলা ভঙ্গ হইল। অন্য অন্য কথা চলিল।

মীর সাহেবের আজ এত বিলম্ব হইল কেন?

বসীরদ্দীন বলিলেন—"সাহেব সুবার ঘর, বড় মানসের চালচলন স্বতন্ত্র কথা। আমাদের মত উঠ বল্লেই কান্দে বোচকা তাত নয়? আবার আজকাল প্রজার যে জোট, চার দিক গোলযোগ। সেই সকল কথাতেই বিলম্ব হয়েছে। হয়ত নাও আসিতে পারেন।"

"না আসিতে পারেন, না আসিবেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। শুধু বসে থাকাওত মহাদায়! তুমি একটী গান গাও আমি আস্তে আস্তে সঙ্গত করি।"

"বাবা সে আমার দ্বারা এখন হবে না। মীর সাহেব না আসলে বৈঠকখানায় গান বাজনা করে কার সাধ্য এতেই সকলে চটা। বাড়ী শুদ্ধ লোক আমাকে দেখতে পারে না, কেবল বিবি সাহেবের জন্যই রক্ষা। এমন মেয়ে হয় নাই। একালে কেউ এমন দেখে নাই। বাপরে বাপ! তারই সকল, তারই বাড়ী, তারই বৈঠকখানা, ভাব দেখি সে কেমন মেয়ে?"

ঠিক বলেছ। এমন নিরাগী কখনও দেখি নাই। শুনিও নাই। আর স্বামীর প্রতি এত ভক্তি, এত ভালবাসা যে তা আর মুখে প্রকাশ করা যায় না। এমন ভাব কখনও দেখি নাই।

"সে কি আর বলতে। আচ্ছা তুমি বস, আমি বাড়ী হতে একবার ঘুরে আসি—"

রূপসী আর বাধা দিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা যেন তিনি একা একাই বৈঠকখানায় থাকেন। বসীরদ্দীন চলিয়া গেলে, রূপসী তাসগুলি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া গোছাইয়া রাখিলেন। পরিষ্কার বিছানা। সে সময় কেরসীন তৈলের ব্যবহার, ল্যাম্প ইত্যাদি বিলাতী আলোর চলন, বাঙ্গালীর ঘরে হয় নাই। সেজ, মোমবাতী, বৈঠকী, নারিকেল তৈলের বাতীই চল্‌তী। তাহাই জ্বলিতেছে। বড় একটী বালিশ (গের্দ্দা) ফরাসের উপর পড়িয়া আছে। রূপসী কতক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া বালিশে ঠেস দিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন। কিন্তু কোন প্রকার শব্দ হইলেই সেই দিকে লক্ষ্য করেন। কান পাতিয়া কি যেন শুনিতে থাকেন। ভাবে বোধ হইতেছে যেন কাহার প্রতীক্ষায় আছেন।

কথা মিথ্যা নহে—প্রতীক্ষায় আছেন। ঐ শুনুন মুখে কি বলিতেছেন। ক্ষণকাল গম্ভীর ভাব, মধ্যে মধ্যে চকিত ভাব, কাহারও আগমন প্রতীক্ষা ভাব। কি বলিতেছেন শুনুন।

কৈ এত কথা—এত কিরে—এত মাথা ছোঁয়া, কৈ সকলি মিছে? এমন নির্জ্জন, এমন সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। আর কি করিব। এমন সুযোগ সময়েও যখন আসিল না তখন আর কি করিব। সময়, সুযোগ, অবসর, স্থান, এই চারটীই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের মূল! রক্ষার মূল! এই কথা কহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পা ছড়াইয়া বালিশে একটু বেশী পরিমাণ ঠেস দিয়া বৈঠকখানা ঘরের, পাশের একটী দ্বারে এক ধ্যান এক মনে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরেই তাঁহার ভাব বদল হইল। আন্তরিক চিন্তার ভারে মুখে যে মলিনতাটুকু দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন হঠাৎ সরিয়া গেল। মন সুখী না হইলে চক্ষু হাসিবে কেন? মুখে হাসির আভা দেখা দিবে কেন? পাংশুবর্ণ মুখে, রক্তের আভা খেলা করিবে কেন? অবশ্যই কারণ আছে। বোধ হয় আশা পূর্ণ। যাহার আসিবার কথা—যাহার জন্য এত ব্যস্ত, এত চিন্তা, বোধ হয় তাহারই আগমন? উঠিয়া বসিয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে ডাকিতে লাগিলেন। সে যেন ঘরে মধ্যে আসিতে নারাজ। তাহাতেই স্বর্ণরজত জড়িত দক্ষিণ হস্ত উত্তলন ও করসঞ্চালন—শেষে শয্যাত্যাগ। শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতেই—উঠিলেন না।

বালিশ ছাড়িয়া একটু আগে সরিয়া বসিলেন। কারণ যে ঘরে আসিতে নারাজ ছিল, সে রাজি হইয়া আসিতেছে। পার্শ্বের দ্বারে উপস্থিত। স্ত্রী মূর্ত্তি দুই এক পায়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রূপসী তাড়াতাড়ি যাইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন! ফিরিয়া আসিতেই স্ত্রী মূর্ত্তির অঞ্চল ধরিয়া ফরাসের নিকট টানিয়া আনিলেন। স্ত্রী মূর্ত্তিটী বাড়ীর লোক, বয়সও বেশী—দৌলতন্‌নেসার

পরিচালিকা দুর্গতীর মাতা, নাম সব্জা! মুন্সী জেনাতুল্লার খরিদা। সব্জা যে সময় খরিদ হইয়াছিল, সে সময় উত্তর অঞ্চলে দাসী বিকিকিনিতে দোষ ছিল না। বাড়ীর দাসী মাত্রেই ঐরূপ খরিদা। তাহাদের পেটে সন্তান সন্ততি হইয়াছে—সব্জার পেটের মেয়ে দুর্গতী। দৌলতন্নেসার চারিজন খাস পরিচারিকার মধ্যে একজন দুর্গতী।

সব্জার বড়ই চুরি করিয়া খাওয়ার অভ্যাস। টাকা পয়সায় তত লোভ নাই। যত লোভ ইলিশ মাছে। বাড়ী হইতেও পায়, সময় সময় নিজেও কিনে। আবার মেয়েকে দৌলতন্নেসার রান্ধা ব্যন্জনও চুরি করিতে সময় সময় বলে! দুর্গতী কিছুতেই স্বীকার হয় নাই। সে জন্য দুর্গতীর উপর ভারি চটা। সব্জার বয়সী আরও ৪/৫ জন দাসী ঐ বাড়ীতে আছে। তাহাদের পেটের কোন মেয়ে দৌলতন্নেসার পরিচারিকার মধ্যে নাই। সব্জার কন্যা দুর্গতীই একজন খাস বান্দী।—তাহাতে সব্জার একটু আদরও আছে। মেয়ে মহলে সকলে একটু ভয় করে।

ফরাসের নিকট আনিয়াই রূপসী বলিলেন, "বস, এইখানে বস"—

সব্জা বলিল। "—না, না আমি ওখানে বসিব না। আপনার পায় ধরি, আমি ওখানে বসিব না।"—

"তাতে দোষ কি? আমিত আর তোমার বিবি নয়? যে এক বিছানায় বসিলে দোষ আছে। আমি জানি মানুষ সকলেই সমান। সকলেই খোদার তৈয়ারী।"

"তা হোক্ আপনি বসুন, আমি বস্‌বো না। বেশী দেরিও করিতে পারিব না। সে দিন কিরে করে মাথায় হাত দিয়ে বলে গিয়েছিলাম, তাহাতেই আসিয়াছি।"

"এসেছ ভালই করেছ! তোমার কথা তুমি রেখেছ, আমার কথাও আমি রাখি। অঞ্চল হইলে খুলিয়া ৫্ টী টাকা আর রূপার এক ছড়া গোট রূপসী সব্জার হাতে দিয়ে পুনরায় বলিলেন—

"আমার করার আমি পূর্ণ করিলাম, এখন তোমার ধর্ম্ম, রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছা।"

সব্জার সঙ্গে আগেই গড়া পেটা পরামর্শ ছিল। সব্জা টাকা ৫টা ও গলার জিঞ্জির ছড়া কাপড়ে বাঁধিয়া যাই বলিয়া বিদায় হইতেই, রূপসী সব্জার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তুমি যাহা যাহা চাহিয়াছিলে, আমি তাহা তাহা দিয়াছি! আরও বলি—যদি পার, যে কাজের জন্য দেওয়া, তা যদি করে উঠ্‌তে পার, তবে এর উপরে বকশিশ বলে অবশ্যই আরও কিছু আছে। কি কৌশলে, কি উপায়ে খাওয়াইতে হইবে তাহাত মনে আছে?"

"তা বেশ মনে আছে। শিকড়টীও একএক দিনে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে। গুঁড়ো করতে আর বেশী মেহনত লাগ্‌বে না। দেখ ঐ শিকড়ের গুঁড়ো খাওয়ান ছাড়া আর কিছু পারবো না। আর যা দিয়েছ—তা আমি কখনই খাওয়াতে পারবো না—আমার প্রাণ থাক্‌তে পারবো না।"

"আচ্ছা, শিকড়ীটীত গুঁড়ো করে কোন খাদ্য সামগ্রী মধ্যে মিশিয়ে খাওয়াতে পারবে?"

"হাঁ—তা পারবো। —আর যা বলিলে তা কিন্তু দিবে।"

'কি বলিলাম?"

"ঐ যে বলিলে, আরও কিছু"—

'তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলিতেছি—যেদিন শুনিব, বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, পেট্ চলিয়াছে, সেই দিন তোমাকে মনের মত খুশি করবো। বকশিশ ত ধরা রইল!"

"সে তুমি যা দেও—আমি একখানি ভাল কাপড় চাই।"

"আচ্ছা—একখানি কেন, এক জোড়া দিব।"

কথা হইতেছে, ইহার মধ্যে বেহারাদিগের চলতি বোল রূপসীর কাণে পড়িল। রূপসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সব্‌জাকে বলিলেন যে, "মীর সাহেব আসিতেছেন, তুমি যাও।"

সব্‌জা উঠিতে পড়িতে সাত পাক খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহির হইল। রূপসী সব্‌জার পিছনে পিছনে আসিয়া পাশের দ্বার বন্দ করিয়া দিলেন। এবং সম্মুখের একটী দ্বারে খাড়া হইয়া পাল্‌কি দেখিতে লাগিলেন।

বেহারার চলতি বোল বসীরদ্দীনের কাণেও গিয়াছিল। বৈঠকখানার সম্মুখেই পুষ্করিণী—পুষ্করিণীর দক্ষিণ পারেই বসীরদ্দীনের শ্বশুরালয়। সেইখানেই অবস্থিতি! বসীরদ্দীন তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন।

মীর সাহেবের পাল্কী রাস্তা ছাড়িয়া প্রবেশ দ্বার হইয়া বৈঠকখানার আঙ্গিনায় আসিল। মীর সাহেব পাল্‌কী হইতে নামিয়া বেহারাদিগকে বলিলেন যে, "আবার কাল এক প্রহর পর যাইতে হইবে।"

এই কথা কএকটী কহিয়াই বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। বসীরদ্দীন আদাব বাজাইয়া সম্মুখে খাড়া হইয়াছিলেন, কিন্তু মীর সাহেব সহিত একটী কথাও হইল না। বৈঠকখানার দ্বার অর্দ্ধোদ্ঘাটন হইয়া আলোর সাহায্যে—যাহা দেখাইতেছিল, তাহা মীর সাহেবের নজরে না পড়িয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু তিনি বাটীর মধ্যেই চলিয়া গেলেন, ফিরিয়াও তাকাইলেন না। ভাবে বোধ হইল খুব জরুরী কাজ। কাগজপত্রও কতকগুলি হাতে—

বসীরদ্দীন মাথার চাদর খুলিয়া পুনরায় জড়াইতে জড়াইতে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া রূপসীকে বলিলেন—"এর মানেত কিছু বুঝিতে পাল্লেম না, কাহারও সহিত কোন কথাবার্ত্তা নাই অন্দরে দাখিল!

রূপসী বলিলেন—"তাইত—এর মানে কি?"

"বোধ হয় শরীর অসুখ, না হয় কুঠীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রয়োজন।"

'শরীর অসুখ! একথা হতে পারে—কুঠী সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ীর মধ্যে প্রয়োজন কি?"

"আছে—বিষয়াদী সংক্রান্ত কথা হলেই বাড়ীর মধ্যেই দরকার—টাকাকড়ির আবশ্যক হইলেই বাড়ীর মধ্যে দরকার। তবে আজিকার মত বিদায় হই। কাল শুনিতেই পারিব। কতকগুলি কাগজ যখন হাতে দেখলেম, কোন লিখাপড়া করার মতলব। হাঁ হাঁ মনে হয়েছে, সাহেব কএকখানি গ্রাম ইজারা চাহিয়াছিল—কুঠীর নিকটের গ্রাম—বোধ হয় তাহাই

হইবে।—তাতেই কি হইবে। —প্রজার যে জোট—সাহেবকে আসিতেই দিবে না। যাক্ সে সকল কথায় আমার দরকার কি, চল্লেম।"

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ

গোলযোগ

কয়েক দিন পর্য্যন্ত কেনীর পাকানীল পদ্মা, গৌরী কালীগঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দিবারাত্রি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এক শালঘর মধুয়াতেই যে নীল আবাদ, নীলের কারবার তাহা নহে। যে কুঠীর অধীন যত নীল ক্ষেতে ছিল, সমুদায় জলে ভাসিয়া যাইতেছে। যাঁহারা প্রজা দমনে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রামের ত্রিসীমায় যাইতে সাহসী হইলেন না। যাহারা পাকা নীল কাটিয়া জলে ভাসাইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া কুঠীতে আনিবেন, সমুচিত শাস্তি দিবেন, মনিবের আদেশ মত কার্য্য করিবেন আশা করিয়াই সেলাম ঠুকিয়া দলবল সহকারে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু বড়ই গোলযোগ—কিছুই করিতে পারিলেন না। কুঠীতে যাইয়া সাহেবকে অবস্থা জানাইতেও সাহসী হইলেন না। কারণ কুঠীর দেওয়ান, আমীন, খালাসী, সর্দ্দার, লাঠীয়াল, সকলি দেশের লোক, বাড়ী, ঘর, জমীর কারবার সকলি দেশে। আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, সকলি ঐ অঞ্চলে। পুত্র লাঠীয়ালের চাকর, পিতা প্রজার পক্ষে ; কনিষ্ঠ কেনীর বেতন ভোগী, জ্যেষ্ঠ প্রজার দলে। ইহার পর প্রজার মৌখিক ঘোষণা—এই যে, "যে নীলকরের চাকুরী করিবে, যে ব্যক্তি নীলকরের সাহায্য করিবে তাহার ভালাই নাই।"

স্বার্থের লোভে, অর্থ লাভে যিনি প্রজার বিপক্ষে হস্ত প্রসারণ করিলেন, দুই একপদ অরসর হইতে না হইতে অমনি সোজা হইয়া প্রজার দলে মিশিলেন। সাধ্য নাই যে নীলকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মান মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া দেশে বাস করেন। যিনি কুঠী হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার আর প্রবেশের সাধ্য থাকিল না। সপ্তাহ মধ্যে সর্দ্দার, নেগাহ্ বান,আমীন, কালাসী, গোমস্তা, প্রভৃতি কুঠী পরিত্যাগ করিল। নীলকরের সংশ্রব ত্যাগ করিল। চোবে, সীং ব্যতীত বাঙ্গালী একটী প্রাণীও প্রকাশ্যভাবে নীলকরের চাকরী করা দূরে থাকুক—বাধ্য হইয়া বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইল। দেওয়ান, মুচ্ছদি বড় বড় আমলা মহাশয়েরা কিছু দিন নিমকের স্বত্ব রক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। বাড়ীর সংবাদ বড়ই শোচনীয়! দিনে দুপুরে অত্যাচারে, লুটপাট, পরিজনের দুর্দ্দশার একশেষ, কার সাধ্য নীলকরের চাকুরী করে? ক্রমে কুঠীতে লোক শূন্য হইয়া উঠিল। খানসামা বাবুর্চি পর্য্যন্ত কার্য্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কষ্টের একশেষ। পক্ষকাল অতীত হইতে না হইতে কেনীর সমুদায় জমীদারীতে, অন্যান্য কুঠীয়ালের জমীদারীতে প্রজাবিদ্রোহ আগুন সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। বড়ই গোলযোগ বাধিল। কেনী ত ছাড়িবার পাত্র নহেন—সহজে দমিবার লোক নহেন। তিনিও পুরাদমে বুদ্ধিবল, অর্থবল, প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানী চাকরের

সংখ্যা বিশগুণ বৃদ্ধি করিলেন। কলিকাতা হইতে খানসামা খিদমতগার, বাবুর্চি আনাইয়া নূতনভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দোকানী পসারী এক জোট, কুঠীর লোকের নিকট কেহ কোন জিনিস বিক্রি করিবে না। হাটে ঘাটে, বাজারে কুঠীর লোক পাইলে বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অশান্তির বাতাস বহিয়া দেশে মহা হুলুস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। একটী মুরগীর জন কেনী লালাইত। খাদ্য সামগ্রী জন্য কেনী লালাইত। খাদ্য সামগ্রী জন্য রন্ধনশালা বন্ধ। টাকা থাকিলে কি হইবে? ক্রোড়পতি হইলে কি হইবে? লোকের অভাব—খাদ্য সামগ্রীর অভাব অন্যদিকে প্রাণের আশঙ্কা। চারিদিকেই শঙ্কা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আতঙ্ক ও ভয়! মহাবিপদ! যে কুঠীতে দিবারাত্র লোকজনের গতিবিধি, কাজকর্ম্মের গোলযোগে সর্ব্বদা গুলজার! সর্ব্বদাই হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড, আজ সে কুঠীতে জনমানবশূন্য নিস্তব্ধ! অলক্ষীর বাতাস বহিয়া চারিদিকেই যেন হাহাকার!! আঙ্গিনা, রাস্তা ঘাট, ঘাসজঙ্গলে একাকার! কেনীর সংবাদ লইতে এক মীর সাহেব ভিন্ন লোক নাই। কিন্তু মীর সাহেবও সর্ব্বদা শশঙ্কিত, সর্ব্বদা ভীত। সা গোলাম সুযোগ পাইয়া আপন অভিষ্ট নানা প্রকারে সিদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। অনেকের অভীপ্রায় এই যে, মীর সাহেবকে কৌশলে আপন দলভুক্ত করা। একেবারে নির্ম্মূল করা কি কোন প্রকারে অত্যাচার করা, ইচ্ছা নহে। প্রকাশ্যভাবে কেনীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ মীর সাহেবের আর সাধ্য নাই। প্রকাশ্য চিঠিপত্র চালাইতেও আর ক্ষমতা নাই। বিশেষ বিশ্বাসী ২/১টী লোককে ফকীর সাজাইয়া জোলার মধ্যে চিঠি দিয়া নিশীথ সময়ে অতি সাবধানে খবর আনা-নেওয়া করেন। নিজের লোকজন দ্বারা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া, অতি গোপনে শালঘর মধুয়ায় অপথে পাঠাইয়া দেন। কেনীর খাদ্য সামগ্রী সমুদায় কলিকাতা হইতে বিশেষ সাবধানে দোবে চোবেদিগের সাহায্যে আসিতে আরম্ভ হইল। টাকার অসাধ্য কি আছে? অনেক ভিন্ন দেশীয় লোক ক্রমে কুঠীতে আমদানী হইতে লাগিল। আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যেই কেনী অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আপাততঃ আত্মরক্ষাই এক মাত্র কার্য্য মনে করিয়া তাহারই উপায় করিতে লাগিলেন।

মীর সাহেব যে কষ্টে না পড়িয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রতি তাঁহার পরিবার পরিজন প্রতি বিদ্রোহী দল কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, এ কথা প্রধান বৈঠকে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কৌশলে তাঁহাকে কষ্টে ফেলিয়া আপন দলে আনিবে, ইহার চেষ্টা বিশেষ রূপে হইয়াছে, এবং হইতেছে। মীর সাহেবের ধোপা, নাপিত, বেহারা সমুদায় বন্ধ হইয়াছে, চলাচল প্রতিবন্ধক হেতু নৌকা বন্ধ হইয়াছে। অনেক চাকর চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কঠিন সময়ে দৌলতন্‌নেসা হঠাৎ পীড়িতা হইয়াছেন, কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, অনিয়ম নাই, হঠাৎ একদিন তাঁহার মুখে দুগ্ধ বিস্বাদ বোধ হইয়াছিল, তাহার পর দিবস হইতেই পেটের পীড়া।

এদিকে কেনী অর্থ বলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের সাহায্যে আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া প্রজা বিদ্রোহী বিষয়ে ভারত অধীপ পর্য্যন্ত বোধ হয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। শান্তি রক্ষার জন্য

সৈন্য সামন্ত সহ শান্তিরক্ষক কমিসনর বাহাদুর, শালঘর মধুয়ার কুঠীতে আসিয়া ছাউনী করিয়াছেন। রাজস্ব বন্ধ! প্রজারা নীল ত বুনিবেই না। খাজনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। কথাই আছে যে—'যদি পায় সহল, ত যায় রাজমহল।" নীলও বুনিবে না—খাজনাও দিবে না। অথচ নীলকরে আক্রমণ, নীলকরপক্ষীয় লোকের প্রতি অত্যাচার! ক্রমেই অশান্তি, ক্রমেই বিদ্রোহিতার বৃদ্ধি! সুতরাং রাজার শান্তির আবশ্যক!

কমিসনর বাহাদুর খাজানা আদায় করিবেন। শান্তি রক্ষা করিবেন, এই কথাই রটিয়া গেল। দেশেও শান্তির সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। অন্যায় অত্যাচার কমিতে লাগিল। কিন্তু প্রজার জোট যেমন তেমনি রহিয়া গেল। কুঠীর নামে আগুন, নীলের নামে মহা আগুন।

কেনীর মাথার শক্তিও কম নহে, হৃদয়ের বলও বাঙ্গালীর সমান নহে। সমুদায় এলাকার প্রজা এক জোট। নীলের নাম ত শুনিতেই পারে না। নেহ্য খাজনা দিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য; তাহাও দেয় না। বল প্রয়োগে খাজানা আদায়, প্রজা বশ করার ক্ষমতা একেবারেই রহিত। বাধ্য হইয়া মজুদ অর্থে হাত পড়িয়াছে। নূতন নূতন লোক রাখিতে হইয়াছে। পুরাতন চাকর ক্রমেই দিনের মধ্যে দুই একটী করিয়া দেখা দিতেছে। তাহাদের পূর্ব্ব ভয় অনেক পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এক গ্রামে ডঙ্কার ধ্বনী হইলে শত শত গ্রামের লোক যে যে অবস্থায় থাকিবে সেই অবস্থায় একত্র হইয়া কুঠীর পক্ষীয় লোক, যাহারা কথায় বাধ্য না হইত, জোর জবরানে বাধ্য করিয়া চাকুরি ছাড়াইত, কুঠীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিত। এখন আর তাহা নাই। এখন সমুদায় আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর। রাজশক্তিতে অন্যায় অত্যাচারে বাধা। ইচ্ছার অনুগামী অর্থলোভী বাঙ্গালী দুই একজন ক্রমে পুনরায় কুঠীতে জুটিতে লাগিল। কিন্তু সে দিন নাই, সে আমল নাই। এখন নিরীহ ভদ্রলোক প্রতি অত্যাচার, জবরান করার কোন পক্ষেরই আর ক্ষমতা নাই।

কেনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সাহায্য লইবেন না। বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্য করাইবেন না। খাজনা আদায় ও নীল কর্য্যেও ক্ষান্ত দিবেন না। বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিবার জন্য চেষ্টায় আছেন! নীল হউজে নীল মাড়াই করার জন্য কলের জোগাড় করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। প্রজাকে ডাকিবেন না, প্রজার নাম শুনিতে আর ইচ্ছা করেন না। রাজশক্তি দ্বারা খাজানা আদায় করিয়া লইবেন, ইহাই তাঁহার স্থির সংকল্প।

শরাসন হইতে শর ছুটিয়া গেলে তাহা নিবারণ করা মানুষের দুঃসাধ্য। ঘটনাস্রোত ঃ একবার বহিয়া গেলে তাহা নিবারণ করাও মানুষের অসাধ্য! এই সকল ঘটনার মধ্যে রাজাও রাজশক্তির বিস্তার করিলেন। কুষ্টীয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইল। কুষ্টীয়ার থানা গৌরী নদীর উত্তর পার পুরাতন কুষ্টীয়াতে ছিল, তাহা উঠিয়া মহকুমার নিকট আসিল। রেলওয়ের লাইন খুলিবার বন্দোবস্ত হইল। কেনীর প্রজার নিকট বাকি কর আদায় করিতে তিন জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া কুষ্টীয়ায় আসিলেন। নূতন ভাবে, নূতন প্রকারে, নূতন কাণ্ডে যেন কুষ্টীয়া অঞ্চলে নূতন জগতের সৃষ্টি হইল!—মহকুমা সৃষ্টির পূর্ব্বে নীল খুনি এবং কুমন্ত্রণার

মোকদ্দমা পাবনাতে কেনীর পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি প্রজা ফাটকে আটক পড়িয়াছিল, এবং সা গোলাম প্রভৃতি জোটের প্রধানগণের ছয় ছয় মাসের বিনা শ্রমে শাস্তি হইয়াছিল কিন্তু আপীলে টিকিল না। সকলেই বেকশুর খালাস হইল।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

হৃদয়ে আঘাত

দৌলতন্নেসার সেই যে পীড়িত শয্যায় পড়িয়াছেন, আর আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই! দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি! দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও বল হীন হইয়া একেবারে শয্যায় ধরা হইয়াছেন। নানা স্থান হইতে বৈদ্য মতের চিকিৎসক আসিয়া কত ঔষধ, কত প্রকরণ, কত কি করিতেছেন কিছুতেই পীড়ার শান্তি হইতেছে না। তাঁহার মাতা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কন্যার শুশ্রূষায় মন দিয়াছেন। অবসর মতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে না। মুসলমানী ধর্ম্ম মতে কত সিন্নি, কত খয়রাত, কত কোরবানী করিতেছেন, মান্নত করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। অনেকেই দৌলতন্নেসার জীবনে নিরাশ হইয়াছেন। এক ঘরের এক কন্যা,—এক বংশের একটী মাত্র কন্যা! দৌলতন্নেসা অসময়ে জগৎ ছাড়িয়া, বৃদ্ধ মাতার হৃদয়ে আঘাত করিয়া,—স্বামীর মনে ব্যথা দিয়া জনমের মতন চলিয়া যাইবেন, একথা তাঁহার মনে এক দিনের জন্যেও উঠে নাই! কিন্তু চক্ষের জলে সর্ব্বদাই ভাসিতেছেন! বাড়ীর এমন একটী লোক নাই, পাড়ায় এমন একটী প্রাণী নাই, যে দৌলতন্নেসার এই হঠাৎ পীড়ায় দুঃখিত হয় নাই। সকলের মনেই এই কথা যে, হায়! কি হইল? একটী বংশ একেবারে লোপ হইল। মুন্সী জিন্নাতুল্লার ঐ এক কন্যা! ঐ এক কন্যাই মাতার সম্বল! হৃদয়ের সার, মহামূল্য রত্ন। সে রত্ন হারাইলে কি আর ফাখেরা খাতুন জীবিত থাকিবে? মীর সাহেব পুরুষ, কিছুদিন স্ত্রী বিয়োগ দুঃখ মনে থাকিতে পারে? কিন্তু মুন্সীর বিবির আর কল্যাণ নাই। ভালাই নাই। এমন রোগ কেউ কখনও দেখে নাই। হায়! হায়! ছোট দুটি ছেলেরই বা কি দশা হইবে! হাজার বিষয় থাক, টাকা থাক, কিন্তু মায়ের সমান যত্ন, মায়ের সমান ভালবাসা কি আর হয়?

বাড়ীর চাকর চাকরাণী সকলেই দিবারাত্রি প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছে। সকলেই দুঃখিত! সকলেরই চক্ষে জল! সব্‌জার চক্ষুও জলশূন্য নহে। সামান্য অর্থলোভে, সামান্য অলঙ্কার লোভে সে, যে কুকাজ করিয়াছে, দৌলতন্নেসার উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া তাহার অনুতাপ হইয়াছে। মনে মনে মহা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। রূপসী তাহাকে লোক দ্বারা আরও কএকবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। সে আর যায় নাই। রূপসীর সঙ্গে আর দেখা করে নাই। সকলের কান্না, সকলের দুঃখ এক প্রকার, সব্‌জার কান্না, সব্‌জার দুঃখ অন্য প্রকার। তাহার কর্ত্তৃক যে একটী সোনার প্রতিমা অসময়ে সংসার সাগরের তরঙ্গে ডুবিয়া বিসর্জ্জন হইল,

তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। সে বিষাক্ত ঔষধ দুগ্ধে মিশাইয়া না দিলে যে এরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় দৌলতন্নেসা আশক্তা হইতেন না, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর রূপসীর নিকট যায় নাই। ছয় মাস যায়, পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইল না। আজ আরও বৃদ্ধি। কি ভয়ানক বিষয়! উহু! বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ শিহরিয়া যায়, অন্তরের অন্তঃস্থানে পর্য্যন্ত আঘাত লাগে! হায়রে হিংসা! হায়রে আমোদ! নর্ত্তকীসহ একত্র আমোদ! আজ দৌলতন্নেসার নাড়ী পচিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়িতেছে। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া মলিন বদনে বাহিরে আসিলেন। মীর সাহেব কবিরাজদিগের হাবভাব দেখিয়া বুঝিয়া, অবস্থা শুনিয়া সজল নয়নে স্ত্রীর পীড়িত শয্যার এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন সে জ্বলন্ত জ্যোতিঃপূর্ণ সুকোমল মুখমণ্ডলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া, গতকল্য যাহা ছিল, তাহাও আজ নাই। সে বিস্ফারিত লোচনে খরতর জ্যোতির অভাব যে পরিমাণ কাল দেখিয়াছিলেন, আজ তাহার কিছুই নাই। সরল নাসিকা বামে কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে, চক্ষের জলে চিবুকদ্বয় ভাসিয়া যাইতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মায়ের পদতলে মাথা রাখিয়া মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতেছে। মধ্যম পুত্রের বয়স ১০/১১ বৎসর সেও যে কিছু না বুঝিতেছে তাহা নহে। মায়ের বক্ষে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। আর দুটি পুত্র তাহারা অতি শিশু, তাহারা সেখানে নাই। স্থানান্তরে দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। কিন্তু সময় সময় তাহাদের কান্নার রবও শুনা যাইতেছে।

মীর সাহেব! অনেকক্ষণ সহধর্ম্মিণীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন বোধ হয়?

দৌলতন্নেসা কোন উত্তর করিলেন না। দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ঈশ্বর উদ্দেশ্য মাত্র তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। অধিকন্তু বস্ত্র দ্বারা আপন মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদ দুখানি দুই হাতে ধরিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিলেন, তাহা অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। মীর সাহেব কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিলেন না। নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে ঘরের বাহির হইলেন। কোন দিন কোন লোকে যে চক্ষে কখনই কোন কারণে জল দেখে নাই, তাহারা আজ মীর সাহেবের চক্ষে অবিশ্রান্ত জলধারা পতন দেখিল।

ফাখেরা খাতুন অন্য ঘরে মৃত্তিকা শয্যায় অজ্ঞান। কখন সচেতন, কখন দৌড়িয়া কন্যার নিকট আসিতেছেন। কখনও কন্যার পার্শ্বে কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপরকে বলিতেছেন—হায়! তোমরা এঘর হইতে চলিয়া যাও। আমি মাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিব। দেখিব কে আমার মাকে কোথায় লইয়া যায়? আবার কোল ছাড়িয়া উঠিতেছেন। দৌহিত্রদ্বয়ের মুখপানে চাহিয়া হু হু শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে অচৈতন্য হইতেছেন।

দৌলতন্নেসা মুখের বস্ত্র সরাইয়া ইঙ্গিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিলেন। দুই হস্তে দুই পুত্রের মুখে মাথায় হস্ত দিয়া অস্ফুট স্বরে কএকটি কথা কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মায়ের মুখে চামুচে করিয়া সরবত দিতে লাগিলেন। দুই এক ঢোক গিলিয়া আর গলাধঃ হইল না। গণ্ড বাহিয়া সরবত পড়িতে লাগিল। শ্বাস বৃদ্ধি হইল, চক্ষু বিবর্ণ হইল

তারার কালীমা রেখা দেখিতে দেখিতে সরিয়া গেল।

ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। দৌলতন্নেসা মৃদুস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে পুত্রদ্বয়ের মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া জীবনের শেষ ভালবাসিয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। প্রাণবায়ু কোন্ পথে কোথায় চলিয়া গেল কেঁহই কিছু জানিতে পারিল না। সকলেই দেখিল চক্ষের পাতা বন্দ হইয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাস আর নাই। ঠোঁট দুইখানি যে নড়িতেছিল, তাহাও আর নাই। দৌলতন্নেসা নাই—স্পন্দহীন দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে। ঘরের লোক মাথা ভাঙ্গিয়া কান্দিতে কান্দিতে ঘরের বাহির হইলেন। বাড়ীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল। যে যেখানে ছিল সেই গড়াগড়ি পাড়িয়া মাথায় শত করাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিল।

পুরজনেরা তখনি সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। মীর সাহেবের অভিমতে তাঁহার পিতার সমাধিস্থানের নিকট দৌলতন্নেসার সমাধিস্থান নির্ণয় হইল। তাহাতে সা গোলাম কোন আপত্তি করিলেন না। সাঁওতার বাড়ী ঘর, জমীদারী, সে সময় সকলি সা গোলামের। মীর সাহেবের কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু দৌলতন্নেসার সমাধি সাঁওতায় হইতে সা গোলাম কোন আপত্তি করিলেন না।

এতদিনের পর রূপসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। রূপসীর প্রসঙ্গ পথিক এ কলমে আর আনবেন না—এইখানেই ইতি করিল। তবে তাহার পরিণামফল পরিণামফলের সহিত জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছা রহিল।

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ

রূপান্তর

এই পরিশূন্য ঘূর্ণায়মান জগতে রূপান্তর আশ্চর্য্য নহে। যে কাঞ্চনশৃঙ্গ নীলাকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, হয়ত কালের প্রবাহে চূর্ণ বিচূর্ণ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। মহাসিন্ধুও কালচক্রে পরিশুষ্ক হইয়া বালুকাময় মরুভূমি হইয়া মরীচিকারূপে পথিকের ভ্রম জন্মাইতে পারে। যে স্থানে অতলস্পর্শ বলিয়া প্রবাদ, হয়ত সেই স্থান হইতে ভূধরের অতি উচ্চ শিখর দেখা দিয়া জলধির জলরাশি সরাইয়া স্বীয় মস্তক উন্নত করিতে পারে। মহানগরী কলিকাতাও কালের করাল গ্রাসে পড়িয়া মহাশ্মশান ক্ষেত্ররূপে দেখা দিতে পারে। নিয়তির অসাধ্য কিছুই নাই। পরিবর্তন, রূপান্তর, জগতে আশ্চর্য নহে। যে রাজ্যে কেনীর নামে দোহাই ফিরিয়াছে, বালক মায়ের ক্রোড়ে আতঙ্কে কাঁপিয়াছে, মহাশক্তিশালী লক্ষপতির হৃদয় কেনীর নামে দূর দূর করিয়া অস্থির হইয়াছে,শ্যামচাঁদের নামে মানুষের হৃদপিণ্ড পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, আজ সেই কেনীর ভাব স্বতন্ত্র, সর্ব্বোতভাবে রূপান্তর।

রাজশক্তিতে, দেশের শান্তিবায়ু বহিয়া প্রজা নীলকরকে রক্ষা করিয়াছে। স্বেচ্ছাচার অত্যাচারের দায় হইতে সকলকেই উদ্ধার করিয়াছে। সকলেই এখন বিধির অধীন।

রাজবিধির অন্তর্গত সীমার অধীন। নিকটেই মহকুমা। শাসন, রক্ষণ সমুদায় রাজহস্তে। প্রজার পক্ষে থাকিলেও নীলকরের অত্যাচার নাই। নীলকরের পক্ষে গেলেও প্রজার অত্যাচার নাই। যাহার যে পক্ষ অবলম্বন শ্রেয় বোধ হইতেছে, প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, সুসার বোধ হইয়াছে, সে সেই পক্ষে যাইতেছে। মাঝে মাঝে পরিবর্তনও হইতেছে। প্রজায় নীল আর বুনিবে না, কেনীও নীল চাষ ছাড়িবেন না। জমীদার—জমির অভাব নাই। চাষ কারকিদের জন্যই প্রজার দরকার। বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিবেন, ইনজিনে লাঙ্গল চলিবে। কলেই আবাদ, কলেই বুনানী, কলেই কর্তন। কলেই মাই, কলেই জাঁত; দেশীয় লোকের আর সাহায্য লইবেন না। দেশীয় লোককে আর ডাকিবেন না। খাজনার জন্যও তাগাদা করিবেন না। দশ আইন করিয়া রাজ সহায়ে খাজনা আদায় করিবেন, ইহাই সংকল্প। এই যুক্তি স্থির করিয়া, আপন কর্তব্য কার্য্যে মন দিয়াছেন। কিন্তু মজুত তহবিলে হাত পড়িয়াছে। আয়ের অঙ্ক প্রায় শূন্য। মজুদ তহবিল হইতে অকাতরে ব্যয় করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়াছেন। নায়েব, মুচ্ছদি, দেওয়ান, সাহেবের পূর্ব আসখাস অনেকেই আবার আসিয়া জুটিয়াছেন। কিন্তু সকলেই রূপান্তর। পূর্ব্বভাব কাহারও নাই। এখন প্রজা শাসন আইনের মারপেঁচে বড় বড় মাথাল মাথাল প্রজার নামে সত্যমিথ্যা অনেক নালীস রুজু করিয়াছেন। উকীল মোক্তার খুব জুটিয়াছে। কথায় কথায় নালীস, কথায় কথায় আরজী দাখিল হইতেছে। থানায় এজাহার পড়িতেছে, ম্যাজিষ্ট্রীতে দরখাস্ত দাখিল হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, প্রজাগণই আসামী। মন্দ নয় এ দৃশ্য—মন্দ নয়। পাঠক! মনের কথা যদি মনোযোগ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, তবে এ দৃশ্যে চক্ষু শীতল না হউক আনন্দ জন্মিবে। কোথায় সর্দ্দার লাঠীয়ালের যমযাতনা, আর কোথায় সমন ওয়ারেণ্টে তলবের তাড়না। কোথায় নিজেই হর্ত্তাকর্ত্তা, বিধাতা, রাখা মারা আপন হাত, আর কোথায় করজোড়ে বিচার প্রার্থী হইয়া, সেই অধীনস্থ প্রজার সহিত সমশ্রেণীভাবে বাঙ্গালী বিচারকের নিকট দণ্ডায়মান। কুঠীর সীমায় পা রাখিতে যাহাদের প্রাণ কাঁপিয়াছে, এক্ষণ রাজবিচার গৃহে সেই শ্যামচাঁদ আঘাতি প্রজাগণ উচিত কথা কহিতে একটুকুও ত্রুটি করিতেছে না। তিনি জমীদার, তিনি নীলকর, তিনি ইংরেজ, একথা বলিয়া একটুকুও খাতির করিতেছে না। বিশ্বাসের পাত্র সকলেই সমান! যে কথায় সামান্য কুলী মজুরকে রাজসমক্ষে শপথ করিতে হয়, মেঃ টি. আই. কেনীকেও তাহাই করিতে হয়। রাজদ্বারে সকলেই সমান। আবার প্রজার ভাবটাও একবার ভাবিয়া দেখুন—দেখুন কি চমৎকার দৃশ্য। কি চমৎকার পরিবর্ত্তন!

বাকি খাজনার মোকদ্দমা ব্যতীত, প্রজা শাসন, প্রজা সোজা করার বাবদে যে সকল মোকদ্দমা কেনীর পক্ষ হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রায়ই ডিস্‌মিস। বিচার ভ্রমে, কি বিভ্রাট। যে যে মোকদ্দমায় প্রজাগণ শাস্তি পাইল, আপীল আদালতে পরিপক্ক বিচারকের নিরপেক্ষ বিচারে নীলকরের চক্র ছাপা রহিল না। মোকদ্দমাও টিকিল না। আসামীগণ বেকসুর খালাস পাইতে লাগিল।

এদিকে কলের লাঙ্গল বিলাত হইতে আসিয়া পড়িল। নীল মাই জন্য নীল হউজেও

বিলাতী কলকৌশল বসান হইল। নীল জমি চাষ, নীল কর্ত্তন, নীল মাই ইত্যাদি সমুদায় কলের কৌশলে, ইন্‌জিনের বলে সম্পন্ন হইবে, প্রজার সাহায্য কিছুতেই লওয়া হইবে না। ইহাই কেনীর আন্তরিক সঙ্কল্প। করিলেনও তাহাই। কিন্তু তাহাতে আর বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল। নীল বিদ্রোহীর প্রধান পাণ্ডা সা গোলাম। কলের লাঙ্গল প্রথম চালাইবার দিন কেনী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমরা জান, আমি এই লাঙ্গলের নাম সা গোলাম রাখিলাম। গায়ের জ্বালায়, মনের ক্ষোভে, যাহাই বলুন, কিন্তু কলের লাঙ্গলে ভালরূপ চাষ হইল না। সে লাঙ্গলে ২/১ বিঘা জমি চাষ করা যায় না। এক স্থানে ১০০ শত ২০০ শত বিঘা সমতল এবং সমশ্রেণীর জমি হইলে চাষ হয় বটে, কিন্তু দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জমী কাটিয়া নীল বুনানীর উপযুক্ত করিতে বড়ই নাজেহাল হইতে হইল। কলে ঢিল ভাঙ্গা হয় না, মই দেওয়া যায় না। মাত্র জমি কাটিয়া মাটি উল্টাইয়া দেয়। ঢিল ভাঙ্গিতে, মাটি বুনানীর উপযুক্ত করিতে দেশীয় লাঙ্গলের বিশেষ আবশ্যক হইল। তখন বাধ্য হইয়া গরু, মহিষ ক্রয় করিলেন। লাঙ্গল, জোয়াল, বিদে, কাস্তে, কোদালী চাষ কার্য্যের যাবতীয় সরন্‌জাম কেনীকে প্রস্তুত করিতে হইল। এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বুন, বাগদী আনাইয়া মাসিক বেতন ধার্য্যে ঐ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন।

গুদাম ঘরে এখন আর কএদী থাকে না, আমলাগণের বাসা হইয়াছে। মার ধর, ধর পাকড়—এ সকল নামও আর শুনা যায় না। যাহা কিছু সকলি আদালতে। প্রজা কর্ত্তৃক অন্যায় অত্যাচারের বিচার সমুদায়ই রাজদ্বারে। কিস্তি কিস্তি প্রজার নামে খাজনার নালীস। এক আনা দুই আনা খাজনার দাবীতেও প্রজার নামে নালীস হইয়াছে। কেনীর ইচ্ছা যে, কিস্তি কিস্তি নালীস করিয়া খরচা ইত্যাদিতে প্রজাকে নাজেহাল করা। পরে একত্রে ডিক্রীজারীর টাকা আদায় করিতে বসিবেন। প্রজা মোকদ্দমায় অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া জেরবার হইবে। সে সময় আসল ডিক্রীর টাকা দিতে অপারগ হওয়ারই কথা। দায় ঠেকিয়া বিশেষ বাধ্য হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে।

যেমন নূতন মহকুমার সৃষ্টি, তেমনি মোকদ্দমার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি। মহকুমায়, জিলায় কেনীর মোকদ্দমার অন্ত নাই। খরচেরও অন্ত নাই। কিন্তু আয়ের অঙ্ক একেবারেই শূন্য। ইতিপূর্ব্বে নীল বীজ সহিত ছোলা বুনানী হইত, ছোলা উঠিয়া যাইত নীল বাড়িতে থাকিত। বৎসর সালের ঘোড়া, গরুর দানা সেই উপরি লাভেই চলিত, এক্ষণ ঘোড়ার দানা, চাকরের মাহিয়ানা, মামলা মোকদ্দমার খরচ সমুদায় মজুদ তহবিল হইতে খরচ হইতে লাগিল। বিশেষ সত্যমিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া উপস্থিত করিতে নেহ্য ব্যয়ে কখনি পার পায় না। অনেক স্থানে অপব্যয়ে হস্ত প্রসারণ করিতে হয়। থানাদার, জমাদারকে বসে রাখিতে হইলেও ছালায় ছালায় টাকা ঢালিতে হয়। উপস্থিত পরিবর্ত্তনে কেনীর অর্থের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। কলকারখানায় জমী চাষ ইত্যাদি কার্য্যেও অনেক অর্থ জলে গিয়াছে, লাঙ্গল গরু, মহিষ করিতেও দশ বার হাজার নামিয়াছে, কিন্তু অত গরুর আহার কোথা হইতে জোগাইবেন। সহজ কথা নহে। ক্রমে অনাহারে অযত্নে গরুগুলি মারা পড়িতে আরম্ভ

করিল। কেনীর রোক কিছুতেই পড়ে না। দশ গরু মারা পড়িল, বিশ গরু খরিদ হইয়া আসিল। দেশওয়ালী, পাঁড়ে, দোবে অনেক রাখিতে হইয়াছে, আমলা, মোক্তার, উকীল, তদবিরকারক, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য চাকর, নানা স্থানে রাখিতে হইয়াছে। কেনীর সংসারে পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মিত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া দশ গুণের উপর উঠিয়াছে। ইহার পর খাজানা আদায় বন্দ। নীল কার্য্যে লাভ কিছুই নাই। ব্যয় চতুর্গুণ। অধঃপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ।

সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ

শেষ অঙ্ক

কাহার কপালে কে খায়? ঈশ্বর ললাটফলকে যাহা লিপি করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোতভাবে ফলিয়া থাকে। বিশ্বাসী মাত্রেরই এই বিশ্বাস। কিন্তু এই দৌলতন্‌নেসার অভাবে সে পুরী ক্রমে জনশূন্য হইয়া উঠিল। দাসদাসীগণ কিছুদিন থাকিয়া আপন আপন পথ দেখিতে লাগিল। খাওয়া পরা কষ্ট না হইলেও নানা কারণে বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য হইল। কারণ কু-কথা কয়দিন গোপন থাকে, কানাঘুষায় কথাটা এক প্রকার ফাখেরা খাতুনের কানে গিয়া পড়িল, যে এই সকল দাসী বাঁদীই কৌশল করিয়া কি ঔষধ খাওয়াইয়া দৌলতন্‌নেসাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। কে সেই ঔষধ খাওয়াইয়াছে, কি স্বার্থে এমন নেমকহারামী করিয়াছে তাহার কোনও সন্ধান হইল না। কিন্তু ফাখেরা খাতুনের অন্তর হইতে দাসদাসীগণ একেবারে সরিয়া গেল। মনিবের আদর, যত্ন, ভালবাসা না পাইলে কয়দিন অধীনস্থ, তাবেদার টিকিতে পারে? তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, অথচ ক্রমে অনেকে যাইতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বপ্রথম সব্‌জা তাহার কন্যা দুর্গতীকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দেখাদেখি পর পর অনেকেই যাইতে আরম্ভ করিল। তিনি কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিলেন না, বা রাখিতে যত্নও করিলেন না। যে চলিয়া গেল কোন দিন তাহার সন্ধানও লইলেন না। দৌলতন্‌নেসা ৪টি পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মীর সাহেবও স্ত্রীশূন্য শ্বশুরালয়ে সর্ব্বদা বাস করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদি বসতিস্থান পদমদী গ্রামে বাস করাই মনন করিলেন। পুত্রগণ মাতামহীর নিকটেই থাকিবে। মাঝে মাঝে এখানেও আসিবেন, সে বাড়ীতেও থাকিবেন। সংসারে সুখ নাই—জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাংসারিক কার্য্যেরও ইতি নাই। প্রধান শত্রু সা গোলাম। অধিকন্তু নীলকর পক্ষে থাকায় দেশের লোকের চক্ষেও এক প্রকার চক্ষুশূল। মনও ভাল নহে। সাংসারিক কার্য্যে এক প্রকার উদাসীন।

আর কিছুই ভাল বোধ হয় না, জীবনের অবশিষ্টকাল নির্ব্বিঘ্নে ঈশ্বরের নাম করিবেন, স্থির করিয়াই এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন মনে মনে স্থির করিয়াছেন। সেও পূর্ব্বপুরুষের

বাড়ী। যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ও আছে। কোন গোলযোগের মধ্যে না গিয়া শুধু ঈশ্বরের নাম করিয়া জীবন কাটাইতে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। ঘর সংসার এখন তাঁহার কিছুই নাই বলিলেও হয়। কিন্তু লহিনীপাড়ায় শ্বশুরালয়ে থাকিলে সর্ব্বদা শ্বাশুড়ীর ক্রন্দন শুনিয়া আরও মন চাঞ্চল্য হইবে, ঘর সংসার নাই, অথচ কেনীর পক্ষ, প্রজার বিপক্ষ থাকিয়া সংসার চক্রে ঘুরিতে হইবে, এই সকল ভাবিয়া কিছু দিনের জন্য এস্থান পরিত্যাগ করাই মনে মনে স্থির করিলেন। পুত্রগণের জন্যও কোন চিন্তা নাই, কারণ ফাখেরা খাতুন বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের কোন বিষয় তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না। একখানি বস্ত্রের জন্যও চিন্তা করিতে হইবে না, তাহা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই মীর সাহেব শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন। চির সঙ্গী বসীরদ্দীন সঙ্গেই চলিল। আর যাহার ইচ্ছা হইল, সেও মীর সাহেবের সঙ্গী হইল। মনের কথায় উদাসীন পথিক মীর সাহেবের জীবনের শেষ অঙ্ক এইখানেই ইতি করিল।

পাঠক। পথিকের মনের কথার আদি আছে, ইতি নাই। স্তরে স্তরে বিচ্ছেদ আছে কিন্তু কথার ইতি নাই। জীবন শেষ হইবে, জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে, কিন্তু কথা ফুরাইবে না। মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে। আক্ষেপ ভিন্ন এজীবনে আর আশা কি? জগতের কাণ্ডই এই প্রকার! এক আসিতেছে আর যাইতেছে। পথিকের কথায় কতজনের সংযোগ হইল, কতজনের সংশ্রব ঘটিল, ঘটনাশেষে কতজনকে পরিত্যাগ করিতে হইল। স্তরের সীমা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই সংশ্রব, সংযোগ কমিয়া আসিতেছে।

সা গোলামের কার্য্যে বাধা দিতে এখন আর কেহই রহিল না। সা গোলাম মনে মনে আর এক প্রকার চালে চলিতে এখন মহাব্যস্ত হইয়াছেন। চিরশত্রু দেশ ছাড়া হইয়াছে। মীর সাহেবের জীবনের লীলাখেলা এদেশ হইতে এক প্রকার জীবনের মত উঠিয়া গিয়াছে। আর চিন্তার কি? চারিদিকেই মঙ্গল! প্রজার পক্ষে থাকিয়া আশার অতিরিক্ত অর্থের মুখ দেখিতেছেন। দেশের লোকে সা গোলামের প্রশংসা শতমুখে করিতেছে। বুদ্ধি বিবেচনায় দুশ বাহবা দিতেছে। কেনী আপন জেদ্ বজায় রাখিতে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। যাহার ঘৃণাবোধ আছে, সে টাকার মায়া বোঝে না। যে রোগী, সেও টাকার মায়া করে না। যে লাজুক সেও টাকা রাখিতে জানে না। সংসারে যে সত্যবাদী, এবং পর দুঃখে কাতর, তাহার হাতেও টাকা থাকিতে পারে না। কেনী সত্যবাদী না হউক, লাজুক না হউক, দয়ালু না হউক, রাগ আছে, ঘৃণাও আছে। লজ্জা যে একেবারেই নাই তাহাও নহে। কাজেই মজুদ টাকা ক্রমেই হাতছাড়া হইতে লাগিল। আবার বাতাস উল্টা করিয়া বহাইবেন, আবার প্রজাকে শাসনদণ্ডে পেষণ করিবেন, এই দুশ্চিন্তাতেই সর্ব্বদা থাকিয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। দিন দিন ভাণ্ডার খালি হইতেছে। কিছুদিন পরেই কথা ছড়াইয়া পড়িল, যে কেনী ঋণী! কলিকাতা ** কোম্পানীর হৌসে অনেক টাকা ঋণী! প্রজার নামে খাজনার ডিক্রী হইয়াছে, আদায় নাই। নিজ আবাদে নীল বুনানী হইতেছে, আয়ের নামও নাই, ব্যয়ের চতুর্থাংশের একাংশও ঘরে আসিতেছে না। মনিবের ঋণদায়ের

কথা অধীনস্থ চাকরগণও জানিতে পারিলেই স্বভাবত ভক্তির হ্রাস হয়, বিশ্বাসেও বাধা জন্মে। মুখে প্রকাশ না হউক মনে মনে নানারূপ সন্দেহের কারণ হইয়া উঠে। অধীনস্থ বেতনভোগী আমলা সামান্য চাকর পর্য্যন্ত আপন আপন পাওনা কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। ঋণদায়, মহাদায়! যে সংসারে ঋণপাপ প্রবেশ করিয়াছে সে সংসারের কল্যাণ আশা আর নাই। তবে পুণ্যের জোর বেশী থাকিলে পাপ কাটিয়া যাইয়া আবার ভাল সময়ের মুখ দেখা—সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ঘরকন্না বিষয়-সম্পত্তির বিসর্জ্জনেরই সুপ্রশস্ত পথ ঋণদায়। কেনীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। লাখে লাখে টাকা কোন্ পথে কোথায় উড়িয়া যাইতে লাগিল, কেহ চক্ষেও দেখিল না। আসিবার সময় অনেকেই দেখে, কিন্তু যাইবার সময়, কোন্ পথে সরিয়া যায়, বহু অন্বেষণেও সে পথের সন্ধান হয় না। অর্থচিন্তার ন্যায় মহাচিন্তা জগতে আর কিছুই নাই। অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত সে চিন্তায় বিহ্বল—মহাজ্ঞানী হতজ্ঞান। মহাবলশালী মহাবীর ম্রিয়মাণ! বুদ্ধির বিপর্য্যয় দেখিলে আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ বুঝিলে সর্ব্বদা অন্যমনস্কের ভাব থাকিলে যাহা থাকিবার তাহাও থাকে না। কেহ রাখেও না! যে যে পথে সুবিধা পায় দু'হাতে লুটিতে থাকে। দায়ীকের হঠাৎ অধঃপতনের অর্থই অর্থচিন্তা ও দুশ্চিন্তা—

কেনী পীড়িত হইলেন। মলত্যাগ দ্বারের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে, পুরুষ শরীরের কিঞ্চিৎ নিম্নে অতি কোমল স্থানে একটী স্ফোটক হইয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। তিনি বাধ্য হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় গমন করিলেন। মিসেস্ কেনী কুঠীতেই রহিলেন। স্বামীর দুরবস্থা হইলে স্ত্রীর মনেও যে কিছু না হয় তাহা নহে। কেহ মনের কথা মনেই রাখে কেহ উদাসীন পথিকের ন্যায় মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। হায়রে জগৎ! যদিচ কেনী ঋণী, কিন্তু তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, নাই কেবল টাকা। সোনারূপার অলঙ্কার তাঁহার আলমারী পোরা। পাঠক ভুলিয়াছেন? না মনে আছে? ঐ সকল অলঙ্কার কি কেনী নিজে প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন? তাহা নহে—মনে হয় কি? ঐ সকল সেই অলঙ্কার নিরীহ কৃষক-প্রজার পরিবারের ব্যবহার্য অলঙ্কার.—লুটের মাল! মিসেস্ কেনী অনেক সরাইলেন! আমলাগণও হক না হক খরচ লিখিয়া আপন আপন জমাখরচ দুরস্ত করিলেন। সে সকল খাজানার ডিক্রী প্রজার বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন, প্রজার নিকট কিছু কিছু সেলামী লইয়া কত চাপা দিলেন, কত তামাদী করিলেন, কত—বাড়ী চুরি, বাসা চুরির ভাণ করিয়া, কেহ আচ্ছা এক হাত মারিয়া আপন জিনিসপত্র সরাইয়া বাসায় আগুন জ্বালিয়া দিলেন। ছারপোকা মশার বংশ একেবারে শেষ হইল। আব যাহা পুড়িবার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অর্দ্ধ পোড়া ২০/২৫ বস্তা বাকী খাজনার ফয়সালা সাধারণকে দেখাইয়া একবারেই শেষ করিয়া ফেলা হইল। কেনী পীড়িত, এখনও জীবিত। তাহাতেই এই দশা। আমলা নেগাহবান, কার্য্যকারক, বিষয় সম্পত্তি, দালান কোঠা সকলি আছে। শরীরের অর্দ্ধাংশ যে স্ত্রী তিনিও বাঁচিয়া আছেন, তত্রাচ এই দশা। জগতের কাণ্ডই এইরূপ।

কেনী আরোগ্য হইলেন। ভালমতে আরোগ্য হইয়া কুঠীতে আসিলেন। আবার কাজকর্ম্ম

চলিতে লাগিল। কিন্তু ঋণের ভাগ ক্রমেই বেশী হইতে চলিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় শেষ দীপ্ত দেখাইয়া চির নির্ব্বাণোন্মুখ রূপ ধারণ করিল।

স্রোতস্বতীর খরতর গতী আর ঘটনাস্রোতের অবিশ্রান্ত গতি রোধ করিতে কাহারই সাধ্য নাই। ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটাইতেও কাহারও ক্ষমতা নাই। কেনী আবার পীড়িত হইলেন। জননেন্দ্রিয়ের নিম্নে যে স্থানে স্ফোটক হইয়াছিল, কলিকাতা হইতে ভাল মত আরাম হইয়া আসিয়াছিলেন। হঠাৎ সেই স্থান হইতে রক্তপাত হইল। শেষে দেখা গেল যে সংযোগ স্থানের জোড়া খসিয়া গিয়াছে। যে স্থানে ঘা শুকাইয়া, জোড়া লাগিয়া উপরের চামড়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল, সেই স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে। কেনী তখনি কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যত শীঘ্র শীঘ্র পারিলেন কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। কুষ্টীয়া মহকুমা স্থাপন পর—রেলওয়ে লাইন খুলিয়াছে। কলিকাতা যাওয়া আসা যতদূর সহজ হইতে হয় হইয়াছে। কোনরূপ খেজালত নাই। কেনী রেলওয়ে যোগে প্রভাত হইতে না হইতে কলিকাতা পঁহুছিলেন। সঙ্গে মিসেস্ কেনী আর সোনাউল্লা খান্সামা।

কেনী গতবারে পীড়িত হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে ছিলেন, এবারেও কলিকাতার সেই প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্থান লইলেন।

কতদিন পরে কুষ্টীয়া অঞ্চলে একটী কথা প্রকাশ হইল। সকলেরই শুনা কথা, নির্দ্দিষ্ট খবর কেহই বলিতে পারে না। মুখে মুখে কথাটা এতদূর ছড়াইয়া পড়িল যে, কুষ্টীয়া অঞ্চলে সকলের মুখেই সেই কথা। "কেনী নাই।" দাতব্য চিকিৎসালয়ে কেনীর জীবনপ্রদীপ ইহজীবনের মত নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। আশা ভরসা শত্রুদমন, পুনরায় নীল কার্যের প্রচলন, প্রজাশাসন ইত্যাদির সমুদায় কার্য্য পড়িয়া রহিল। মনের আশা মনেই রাখিয়া গেল। কেনীর সংস্রবে যতপ্রকার মোকদ্দমা বিচারালয়ে উপস্থিত ছিল সমুদায় মুলতবী হইল। কয়েকদিন পরে নীট খবর পাওয়া গেল যে, "কেনী যথার্থই নাই।" মরণের কিছু পূর্বে একখানি উইলপত্র লিখিয়া সমুদায় সম্পত্তি রিসিভারের জিম্বা করিয়া গিয়াছেন। দেনা পাঁচ লক্ষ টাকা। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনাদারগণ টাকা পাইবেন। দেশের লোক যেন মহাকালের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল। মাথার উপর হইতে ভারি একটা বোঝা সরিয়া গেল। সকলের শরীরই যেন পাতলা পাতলা বোধ হইতে লাগিল। কেনীর দৌরাত্ম্য, কেনীর অত্যাচার, কেনীর কথা মনে হইলে সত্য সত্যই চঞ্চল। কিন্তু কিছুদিন কাহারও বিশ্বাসই হইল না যে কেনী ইহ সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে। হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ, মায়ামমতা, আশা ভরসা হাত হইতে ছুটিয়া শান্তিধামের অধিবাসী হইবে। খবর নিশ্চয় আদালতের ঘর পর্য্যন্ত খবর, পাকা খবর কেনীর ষ্টেটের কার্য্য কর্ম্ম সমুদায় হাইকোর্টের অর্ডার অনুসারে বন্ধ। তত্রাচ বিশ্বাস নাই। বুঝি মরে নাই। কোন্ সময় হুটপাট করিয়া আসিয়া পড়িবে। সাধারণের মনেও এই বিশ্বাস। কেনীর জীবন অন্তের পর অনেকেই কেনীর সেই দুর্দ্দান্ত চেহারা, শরীরের ভীষণ গঠন স্বপ্নাবেশে মানস চক্ষে দেখিয়া—যথার্থই দেখিয়া যেন আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন।

মিসেস কেনী কুঠীতে আসিলেন। আপন জিনিসপত্র যাহা ছিল, তাহা লইয়া পুনরায়

কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। রিসিভার কর্ত্তৃক কেনীর সমুদায় ষ্টেট নীলাম হইল। কিন্তু নিলাম ডাকিবার লোক নাই বলিলেই হয়। ৪ লক্ষ টাকা মূল্যে অন্য আর এক কোম্পানী খরিদ করিলেন। তিনিও বেশীদিন রাখিতে পারিলেন না। অন্য আর এক কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিলেন। তিনিও সম্পত্তি শাসন করিয়া কর আদায়ে সমর্থ হইলেন না। বাধ্য হইয়া দেশীয় লোকের নিকট খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের লোকেই ভাগ বণ্টন করিয়া কেনীর যাবতীয় সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইল। নীলকরের নাম দেশ হইতে একেবারে লোপ হইয়া গেল।

পরিণাম

কেনীর জমীদারী খণ্ড খণ্ড হইয়া বাঙ্গালীর দখলে আসিল। শালঘর মধুয়ার কুঠী, একজন বাঙ্গালী ক্রয় করিলেন। আঙ্গিনা, প্রাঙ্গণ, উদ্যান আর রহিল না। পাটের আবাদ, ধানের আবাদ আরম্ভ হইল। যে কুঠীর সীমায় জমীদার, তালুকদার, লক্ষপতি মহাজনের পা ধরিতে গা কাঁপিয়াছে, ঘটনাস্রোতে, নিয়তীর বিধানে, সেই সুরম্য দ্বিতল বাসগৃহের চতুষ্পার্শ্বে সাধারণ প্রজার কোষ্টার আবাদ, সিঁড়ি পর্য্যন্ত কোষ্টার আবাদ, ধানের আবাদ আরম্ভ হইল। যাঁহারা খরিদ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাসের জন্য, সময় সময় বসিবার জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য অন্য দালান কোঠা পড়িয়া রহিয়াছে। চর্ম্মচটিকা, আরশুলা, ইঁদুর, শৃগাল ইত্যাদি মনের আনন্দে দিবারাত্রা খেলা করিতেছে—ছুটাছুটি করিতেছে। এখন তাহারাই কেনীর সুরম্য বাসগৃহের অধিকারী—আপীস দালানের অধিকারী।

কিছুদিন পর গোয়ালন্দ লাইন খুলিল। গোয়ালন্দ ষ্টেশন এবং কোম্পানীর বাজার রক্ষার জন্য স্রোতস্রতী পদ্মার সহিত রেলওয়ে কোম্পানীর বিশেষ লড়াই বাধিল। তাহাদের ইচ্ছা যে, পদ্মার স্রোতের বেগ অন্য পথে ফিরাইয়া, ষ্টেশন, বাজার, ষ্টীমার ঘাট তাহার গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী চিন্তা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে; বুদ্ধিব অসাধ্য কি আছে একটি নদীর স্রোতই যদি বুদ্ধি কৌশলে দশ হাত তফাৎ দিয়া ফিরাইয়া না দেওয়া যায়, তবে বিলাতী—গৌরব কি? ষ্টেশন, বাজার, ষ্টীমার ঘাটই যদি পদ্মার স্রোতবেগ হইতে রক্ষা না করা যায়, তবে আর রেল কোম্পানীর ক্ষমতা কি? বাঙ্গালা দেশের নদীর সহিত যদি বিলাতী বিজ্ঞান পরাস্ত হয়, তবে এ লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার। পদ্মার স্রোত ফিরাইয়া দিতে হইবে। দেও আড়াআড়ী বাঁধ! ফেল ইটপাথর, দেখি পদ্মার জোর কত? দেখি পদ্মার স্রোতের তেজ, তরঙ্গের আঘাত? বাঁধ আরম্ভ হইল। তাহার নাম হইল "স্পার"। বিলাতী বুদ্ধির আশ্চর্য্য ক্ষমতা, 'স্পার' প্রস্তুত হইল। একটী পাকা রাস্তা গোয়ালন্দের ঘাট হইতে পাকা রূপে পদ্মার

বুকের উপর চড়িয়া বসিল। স্রোতের গতি ফিরিয়া গেল। শীতকাল পদ্মা নীরব। যে প্রকারে ইচ্ছা সেই প্রকারে বড় বড় বাহাদুরী পুড়িয়া স্পারের মাথা ঠিক রাখা হইল। স্পারের উপর রেল লাইন পর্যন্ত বসান হইল। আশ্চর্য দৃশ্য! নদীর সিকি ভাগ পর্য্যন্ত পাকা রাস্তার দক্ষিণ বামে স্রোত বেগ কমিয়া গিয়া স্পারের মাথা ঘেঁষিয়া স্রোত চলিতে লাগিল। ধন্য বিলাতী বুদ্ধি ষ্টেশন, ষ্টীমার ঘাট, বাজার সকলি রক্ষা হইল। কোম্পানীর আনন্দের সীমা নাই। কালস্রোতে বর্ষা স্রোত আসিয়া উপস্থিত! পদ্মার শ্রী অন্যরূপ। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি—ভীষণ কল কল রব চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। স্পার আর টেকে না, প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে বাঁধ বাঁধা হইয়াছে, তাহাই একেবারে জলে ভাসিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, ভাঙ্গিয়া যায় বড়ই লজ্জার কথা। স্পার রক্ষা করাই কোম্পানীর মত হইল। আরও দুই লাক টাকার বরাদ্দ হইল। যে উপায়ে হয় স্পার রক্ষা করিতেই হইবে। কোম্পানীর ইটপাথর যেখানে যাহা ছিল সমুদায় ট্রেনে আসিয়া স্পারে ঢালিতে লাগিল। কিছুতেই আর টেকে না। পদ্মা বিষম বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভীষণ রবে ছুটিয়াছে। কার সাধ্য বাঁধ বাঁধিয়া আটকায়? বিলাতী ক্ষমতাও কম নহে। দিবারাত্র ইটপাথর ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। যেখানে একটু দমিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত মধ্যে ইট পাথর ফেলিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ২৪ ঘণ্টা অনবরত লোক খাটিতেছে। কোম্পানীর ইটপাথর যাহা যেখানে ছিল সমুদায় স্পারের কল্যাণে পদ্মার জলে নিক্ষিপ্ত হইল। এখন আর রক্ষার উপায় নাই। ইটপাথরের জোগাড় করিতে পারিলেও বা আশা ছিল। টাকার অসাধ্য কি আছে? রেলওয়ে লাইনের নিকট পুরাতন বাড়ী, নীলের কুঠী হউজ, জাঁতঘর যেখানে যাহা ছিল দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া যত সত্বর সম্ভব হইল পদ্মার বুকে ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইল। ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে সাধ্য কার! কেনীর বাসগৃহ, কুঠী, ইমারত, সমুদায় রেল কোম্পানীর দ্বারা আনীত হইয়া পদ্মাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু স্পার টিকিল না। স্রোতে কোথায় উড়িয়া গেল তাহা ভাবিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেও ক্ষমতা রহিল না। কেনীর দালানের ইট পর্য্যন্ত জগতের চক্ষে থাকিল না, যে স্পারে প্রায় ৭/৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সে স্পার সমেত পদ্মার স্রোতে উড়িয়া গেল।

পথিকের মনের কথার প্রথম স্তর কেনীর প্রসঙ্গ পরিণাম ফলের সহিত শেষ হইয়া সমাপ্ত হইল।

সমাপ্ত

পথিকের নিবেদন

মনের কথার প্রথম স্তর মন খুলিয়া দেখাইলাম। কত স্তরে এবং কত তরঙ্গে এ কথার ইতি হইবে, তাহা পথিক অজ্ঞাত। তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি যে, পথিকের জীবনের ইতির সহিত কথার ইতি হইবে। আক্ষেপ রহিয়া যাইবে। কথা ফুরাইবে না। যত সত্বরে সম্ভব, ২য় স্তর প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন দয়াময় জগদীশ পথিকের শরীর মন সুস্থ রাখেন।

অনুগ্রহপ্রয়াশী
শ্রী উদাসীন পথিক
সাং চলন্ত পথ।